মেজর জিয়াউদ্দিন (অবঃ)

মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবনের সেই উন্মাতাল দিনগুলি

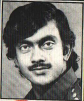

মেজর জিয়াউদ্দিন (অবঃ) নামটি শোনামাত্র আমাদের মনে কিছু চিত্রকল্প ভেসে ওঠে যাতে আছে রহস্য রোমাঞ্চে ঘেরা সুন্দরবন, মুক্তিযুদ্ধের সেই দুর্ধর্ষ দিনগুলো, একটি স্বাধীন জাতির অভ্যুদয়, ৭৫ এর বিদ্রোহ, গণবাহিনী এবং জানা অজানা এক রূপকথার নায়ক। কে এই মেজর জিয়াউদ্দিন? প্রশ্নটা অবান্তর মনে হলেও সত্যিকার অর্থে আমরা তাকে কতোটা চিনি এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব জরুরী। একজন যুবক যিনি দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করেছেন অসম সাহসে, একজন যুবক যিনি সমাজ পরিবর্তনের স্বাপ্নিক লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বেছে নিয়েছেন সশস্ত্র গোপন জীবন, একজন যুবক যিনি দেশের মানুষের সম্ভাব্য উন্নতির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন অক্লান্তভাবে, একজন যুবক যিনি অধিকাংশ সময় বিবেচিত হয়েছেন ভুলভাবে, খণ্ডিতভাবে আবার কখনো কখনো রূপকথার নায়ক অভিধায় চিহ্নিত হয়েছেন, সেই হৃদয়বান, স্বাপ্নিক যুবক সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। তেতাল্লিশ বছরের এই যুবক, মেজর জিয়াউদ্দিনের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সবুজ শ্যামল বাংলাদেশ। জড়িয়ে আছে সুন্দরবন যার রহস্য অসীম। জড়িয়ে আছে দুর্ধর্ষ জীবন গাথা, রোমান্টিক ভাবালুতা আর পরতে পরতে মিশে আছে উত্তেজনাপূর্ণ জীবনের সত্য কাহিনী যা পুরোনো কথায়, গল্পের চাইতেও অনেক অনেক রোমাঞ্চকর।

মেজর জিয়াউদ্দিনের (অবঃ) জন্ম পিরোজপুরে, ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে। ছাত্রজীবনের শেষে জিয়াউদ্দিন যোগ দেন পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতে। কৃতিত্বের সঙ্গে কমিশন প্রাপ্ত হয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাঞ্জাব রেজিমেন্টে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৯৭১ সালের ২০মে মার্চ ছুটিতে দেশে ফিরে এসেছিলেন। ২৬শে মার্চ স্বাভাবিকভাবেই জড়িয়ে পড়েন বাঙালী জাতির মুক্তির যুদ্ধে। প্রথম অবস্থায় পিরোজপুর শহর এবং পরবর্তীতে সুন্দরবন ভিত্তিক ১৪ হাজার সদস্যের এক বিশাল মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলেন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধে ৯নং সেক্টরের সুন্দরবন সাবসেক্টর কমান্ডার হিসেবে মেজর (অবঃ) জিয়াউদ্দিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রকাশক ❒ মুক্তিযোদ্ধা প্রকাশনীর পক্ষে
বেগম কানিজ মাহমুদা
২৭, বায়তুল হোসেন বিল্ডিং
স্যুটনং–৬০১
দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

প্রকাশ কাল ❒ ডিসেম্বর, ১৯৯৩

স্বত্ব ❒ সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

পরিবেশক ❒ চেতনা
৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা।

লায়ন শপিং কমপ্লেক্স (১১৬)
৭৩, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা

অক্ষরবিন্যাস ❒ হুমায়ুন কবীর
টেকনোটেন কম্পিউটার

মুদ্রণ ❒ নূর কার্ড বোর্ড এন্ড বক্স ফ্যাক্টরী
১৭৮/১, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ❒ গ্রাফিক্স প্রিন্টার্স
আরামবাগ, ঢাকা

মূল্য ❒ একশত টাকা মাত্র

Muktijuddhey Sundarbaner Shei Unmatal Dingui by Major Ziauddin (Rtd.)
Published by Muktijuddha Prokashoni. **Price : One hundred Taka Only**

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

উৎসর্গ

মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ও
মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ইন চীফ জেনারেল ওসমানীর প্রতি
শ্রদ্ধাবনত চিত্তে

Khurshid Jahan Begum
02, A.N. DAS LANE, TOOTPARA,
KHULNA-9100. PH.:041-730250

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

কেন এই বই

যদিও প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছি বাঙালী জাতির মহান মুক্তিযুদ্ধে তবু বার বার মনে হয়েছে এ সম্পর্কে লিখতে যাওয়া খুবই কঠিন। বাইশ বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ তাদের যাবতীয় অনুষঙ্গসহ বর্ণনা করা এক কথায় অসম্ভব। তবু চেষ্টা করেছি। সে চেষ্টা কতোটা সফল হয়েছে তা বিচারের ভার পাঠকের হাতে। সুন্দরবনের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের সামগ্রিক ইতিহাসে খুব কমই আলোকপাত করা হয়েছে। অথচ আমার মনে হয় আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে সুন্দরবনের মুক্তিযুদ্ধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরো নয়মাস সুন্দরবন এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়েছে। পাকিস্তানীরা একবারের জন্যও সেই পতাকা নামাতে পারেনি। এই ঘটনাটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোধহয় পাঠককে আলাদাভাবে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

এ কারণেই আমার মনে হয় সুন্দরবনের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে যথাসাধ্য জানানোর একটি পবিত্র দায়িত্ব আমার রয়েছে। এই দায়িত্ব পালনের নিরন্তর মানসিক চাপের কারণেই গ্রন্থটির উদ্ভব। দায় এড়ানোর মানসিকতা একাত্তুরেও ছিল না, এখনও নেই।

সাপ্তাহিক সংবাদচিত্রের প্রধান সম্পাদক জনাব গোলাম কিবরিয়া যখন এই ধারাবাহিকটি প্রকাশের ব্যাপারে প্রস্তাব দেন তখন কিন্তু ভাবিনি যে এটা একদিন বই হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। লেখকও আমি নই। তারপরেও গ্রন্থটি যে প্রকাশ পেল তার কৃতিত্ব মোটামুটি পুরোটাই সংবাদচিত্রের সহসম্পাদক দেলোয়ার হোসেনের। তিনি নিরন্তর আমার পেছনে লেগে থেকে যে অসাধ্য সাধন করেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবনের সেই উন্মাতাল দিনগুলিপ্রকাশের পেছনে তার ভূমিকা সর্বব্যাপী।

তবে, গ্রন্থের এই ভূমিকায় কারো কারো কাছে ক্ষমা চাইবার আছে। আমার অনেক সহযোদ্ধার নাম আমি ভুলে গেছি। স্মরণে আনতে পারিনি। অনেকের নাম স্মরণ থাকলেও হয়তো তাদেরকে যোগ্যভাবে সম্মানিত করতে পারিনি। এসবই আমার ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই বাঙালী জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে অবিসংবাদিত নেতা, মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ইন চীফ জেনারেল ওসমানীর প্রতি।

আরেকটি বিষয়ে সম্ভবত আলোকপাত করা প্রয়োজন। ইদানিং স্বাধীনতা যুদ্ধ বিষয়ে বিভিন্ন মহল বিভিন্নভাবে উচ্চকিত। কেউ কেউ নিজস্ব প্রেক্ষাপট থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্লেষণ করেছেন। ঘটনা প্রবাহকে চালিত করতে চেয়েছেন নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী। এই পদ্ধতি নিজের পায়ে কুড়াল মারার মতোই ভয়াবহ। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত মহলগুলি যদি নতুন প্রজন্মকে সঠিকভাবে স্বাধীনতার ইতিহাস জানিয়ে না যান তাহলে সেই ঘটনার দায়ভার সেইসব মহলের ওপরই চাপবে। আমাদেরকে আমাদের মধ্যকার সমস্ত ব্যবধান ভুলে, নিজস্ব সমস্ত ভুল ভ্রান্তি স্বীকার করে নিয়ে আজ ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে আমাদেরই অস্তিত্ব রক্ষার লক্ষ্যে। জামাত–শিবিরের যে আস্ফালন আজকে শুনতে হচ্ছে সেই ভূয়া আস্ফালনই বাঘের গর্জনে পরিণত হবে ঐক্যবদ্ধভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধকে মূল্যায়ন করতে না পারলে।

মেজর জিয়াউদ্দিন (অবঃ)

কে জিয়াউদ্দিন কেন জিয়াউদ্দিন

মেজর (অবঃ) জিয়াউদ্দিন নামটি শোনামাত্র আমাদের মনে কিছু চিত্রকল্প ভেসে ওঠে যাতে আছে রহস্য রোমাঞ্চে ঘেরা সুন্দরবন, মুক্তিযুদ্ধের সেই দুর্ধর্ষ দিনগুলো, একটি স্বাধীন জাতির অভ্যুদয়, ৭৫ এর নভেম্বর অভ্যুথান, গণবাহিনী এবং জানা অজানা এক রূপকথার নায়ক। কে এই মেজর জিয়াউদ্দিন? প্রশ্নটা অবান্তর মনে হলেও সত্যিকার অর্থে আমরা তাকে কতোটা চিনি এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব জরুরী। একজন যুবক যিনি দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করেছেন অসম সাহসে, একজন যুবক যিনি সমাজ পরিবর্তনের স্বাপ্নিক লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বেছে নিয়েছেন সশস্ত্র গোপন জীবন, একজন যুবক যিনি দেশের মানুষের সম্ভাব্য উন্নতির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন অক্লান্তভাবে, একজন যুবক যিনি অধিকাংশ সময় বিবেচিত হয়েছেন ভুলভাবে, খন্ডিতভাবে আবার কখনো কখনো রূপকথার নায়ক অভিধায় চিহ্নিত হয়েছেন, সেই হৃদয়বান, স্বাপ্নিক যুবক সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। বিয়াল্লিশ বছরের এই যুবককে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা অনেক অর্থেই প্রয়োজনীয়। কারণ মেজর জিয়াউদ্দিনের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সবুজ শ্যামল বাংলাদেশ। জড়িয়ে আছে সুন্দরবন যার রহস্য অসীম। জড়িয়ে আছে দুর্ধর্ষ জীবন গাথা, রোমান্টিক ভাবালুতা আর পরতে পরতে মিশে আছে উত্তেজনাপূর্ণ জীবনের সত্য কাহিনী যা পুরোনো কথায়, গল্পের চাইতেও অনেক অনেক রোমাঞ্চকর।

মেজর (অবঃ) জিয়াউদ্দিনের জন্ম ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে, পিরোজপুর জেলায়। অবশ্য পিরোজপুর তখন জেলা ছিল না। ছিল বরিশালের একটি অংশ। বাবা আফতাবউদ্দিন আহমেদ ছিলেন পেশাদার আইনজীবী। জিয়াউদ্দিন পড়াশোনা করেছেন পিরোজপুর সরকারী উচ্চবিদ্যালয় এবং পিরোজপুর সোহরাওয়ার্দী মহাবিদ্যালয়ে। ১৯৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৮ এর উত্তাল রাজনীতির ছোঁয়া তার গায়েও লেগেছিল। ক্লাশ সেভেন কি এইটে পড়ার সময়ই পড়ে ফেলেছিলেন পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত অনেক নিষিদ্ধ বই। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ওপর রচিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' বইটি নিষিদ্ধ হয়েছিল তখনকার সামরিক শাসনামলে। নিষিদ্ধ এই বইটি পড়ে জিয়াউদ্দিন আহমেদের মনে হয়েছিল মাষ্টারদা সূর্যসেনের আপাত ব্যর্থ বিদ্রোহের সফল সমাপ্তি ঘটানোর দায়িত্ব তারও রয়েছে। সেই ক্লাশ এইটের ছাত্র থাকাকালীন, ১৯৬৪ সালেই তার মনে হয়েছিল পাঞ্জাবীরা কখনোই বাঙালীকে ন্যায্য অধিকার দেবে না। অধিকার আদায় করে নিতে হবে। এইসব ভয়াবহ রোমান্টিক চিন্তাভাবনায় উদ্দীপ্ত চোদ্দবছরের কিশোর জিয়াউদ্দিন সুন্দরবনে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ঘাঁটি। সমমনা কিশোর বন্ধুদের জুটিয়ে চলতো নিয়মিত শরীর চর্চা, যোগাসন এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের কিশোরসুলভ প্রশিক্ষণ। অবিসংবাদিতভাবে এই কিশোরদের নেতা ছিলেন জিয়াউদ্দিন। তাদের সেই স্বপ্ন সফল হতে সময় লেগেছিল খুব বেশীদিন নয়, মাত্র সাত বছর। যাহোক, জিয়াউদ্দিন আহমেদ কলেজে পড়ার সময়ই প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন ছাত্ররাজনীতিতে। প্রথমে যোগদেন ছাত্রলীগে। তারপর চলে আসেন ছাত্র ইউনিয়নে। ১৯৬৮ সালে ছাত্র ইউনিয়ন পিরোজপুর শাখার সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর যোগ দেন পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতে। ৭০ সালের শেষে কমিশন পান তিনি।

১৯৭১ সালের ২০শে মার্চ ছুটি নিয়ে লাহোর থেকে দেশে ফিরে আসেন। এরপরতো অবশ্যম্ভাবী ঘটনা–মুক্তিযুদ্ধে যোগদান। ২৬শে মার্চ রাতেই তখনকার সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট জিয়াউদ্দিন স্থাপন করেন মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। এর আগে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ বিকেলে তার পরোক্ষ সহযোগিতায় পিরোজপুরের জনগণ ছিনিয়ে নেয় পিরোজপুর ট্রেজারীর অস্ত্রশস্ত্র। এসব অস্ত্র নিয়ে আসা হয় মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট জিয়াউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত সেই বাহিনীতে ছিল সেনাবাহিনীর জুনিয়র কমিশন্ড, ননকমিশন্ড অফিসার, সেপাই, উঁচু পদের পুলিশ অফিসার ও নেভীর অফিসারসহ সাধারণ অনেক যুবক। শহর থেকে মাইল দেড়েক দূরবর্তী মাছিমপুর গ্রামের এক প্রান্তে স্থাপিত হয়েছিল সেই ক্যাম্প। পরবর্তীতে পিরোজপুর শহর ভিত্তিক এবং তারও পরে সুন্দরবন ভিত্তিক ১৪ হাজার মুক্তিযোদ্ধার এক বিশালবাহিনী গড়ে তোলেন জিয়াউদ্দিন। একটি দক্ষ গেরিলা বাহিনী হিসাবে তার এই বাহিনী যথেষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে। পুরো সুন্দরবনে একশরও বেশি ক্যাম্প ছিল বাহিনীটির। প্রশিক্ষণ শিবির ছিল একটি যেখানে এক একবারে এক হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতো। অসংখ্য সফল অপারেশন পরিচালনা করেছেন জিয়াউদ্দিন। অধিকতর উল্লেখযোগ্য হিসেবে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে ১২ দিন ব্যাপী সম্মুখযুদ্ধের এবং ১৬ই আগস্ট মংলাপোর্টে পাকিস্তানীদের ১৩টা সমুদ্রগামী জাহাজ ডুবিয়ে দেয়ার ঘটনাটি। এই জাহাজ ডুবিয়ে দেয়াসহ আরো কিছু সফল অপারেশনের জন্য মেজর জিয়াউদ্দিনকে বীরোত্তম উপাধি দেয়ার সুপারিশ পাঠানো হয়েছিল যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু বাংলাদেশে যা স্বাভাবিক তাই হয়েছে। কিছু ষড়যন্ত্রকারী, ভাষার ভিন্নতায় বলা যেতে পারে, জিয়াউদ্দিনের বীরোত্তম উপাধি পাওয়ার বিরোধিতাকারীরা সুপারিশকৃত ফাইলটি বঙ্গবন্ধুর সামনে পৌঁছতেই দেয়নি।

ঘাঁটি করার জন্য সুন্দরবন যে চমৎকার একটি জায়গা এই ধারণাটি দুএকটি মহলের মনে দাগ কাটে যুদ্ধের ঠিক পরপরই। মেজর জিয়াউদ্দিন সুন্দরবন থেকে চমৎকারভাবে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, এটি তখন সারাদেশেরই জানা। সুন্দরবনভিত্তিক বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয় রাজাকার ও নকশাল বাহিনী, আলাদা আলাদা ভাবে। তারা কয়েকমাসের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সুন্দরবন সংলগ্ন অংশসমুহের ওপর ছোটখাট আকস্মিক আক্রমণ করতে থাকে। সরকার যথেষ্ঠ বিব্রত হয়ে পড়ে সেসব আক্রমণে। আওয়ামী লীগ সরকার স্বাভাবিক কারণেই এদের দমন করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। সে সময় পিরোজপুরের স্থানীয় আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা এবং অন্যান্য কিছু লোক উপরিউক্ত ঘটনাগুলোর দায়ভার রাজাকার ও নকশালদের সঙ্গে সঙ্গে মেজর জিয়াউদ্দিনের কাঁধেও চাপিয়ে দেয়। এছাড়া তার বিরুদ্ধে আরেকটি গুরুতর অভিযোগ ছিল যে, তিনি যুদ্ধের পরে অস্ত্রশস্ত্র জমা দেননি এবং তখনও তার অধীনে সশস্ত্র একটি শক্তিশালী বাহিনীর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে ১৯৭৩ সালে মেজর জিয়াউদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়। সেসময় তাকে একটি বিশিষ্ট কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। কক্ষটি বিশিষ্ট ছিল কারণ, উনসত্তুরের বিখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসেবে স্বয়ং বঙ্গবন্ধু সেই কক্ষটিতেই বন্দী ছিলেন।

পরবর্তীতে অবশ্য মেজর জিয়াউদ্দিন নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে অভিযোগ থেকে রেহাই পান। তবে তার বৈচিত্র্যময়, নাটকীয় ও ঘটনাবহুল জীবনের শেষ এখানে নয়। বলা যেতে পারে এটা হলো শুরু। ৭৫ সালের নভেম্বরে কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে সংঘটিত সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন তিনি রাজনৈতিক ভাবে জাসদের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে। জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতায় এসে গেলেন এবং নিজস্ব ভিত মজবুত করার কাজে

লিপ্ত হলেন তখন জাসদের হাই কমান্ড মেজর জিয়াউদ্দিনকে নির্দেশ দেন সুন্দরবনে গিয়ে বিদ্রোহ করার জন্য। মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিলেও বিদ্রোহ বাস্তবায়ন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রায় তিনমাস বিদ্রোহ পরিচালনার পরে একপর্যায়ে এসে গ্রেফতার হন মেজর জিয়াউদ্দিন। কর্নেল তাহের, মেজর জলিল ও আসম আব্দুর রবসহ অনেকের সঙ্গে মেজর জিয়াউদ্দিন দেশদ্রোহীতার মামলার আসামী হন। সামরিক ট্রাইবুনালের বিচারে কর্নেল তাহেরের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয় ফাঁসিতে এবং জিয়াউদ্দিন ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হন। অবশ্য পাঁচ বছরের মাথায় জিয়াউর রহমান তাকে মুক্তি দেন। এরপর এরশাদ আমলেও ভিন্নরকম শাস্তির মুখোমুখি হতে হয় মেজর জিয়াউদ্দিনকে। দেশ থেকে বের করে দেয়া হয় তাকে বারোজন মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুদন্ডের প্রতিবাদ করার জন্য। প্রায় দুবছর দেশান্তরী থাকার পর দেশে ফিরে আসেন তিনি। বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারই তাকে বিভিন্নভাবে শায়েস্তা করলেও জিয়াউদ্দিন এখনো সজীব, তরুণ, বিপুল কর্মোদ্যমে চঞ্চল। বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে এখনো অক্লান্ত উদ্যোগী।

এই রচনায় জানা যাবে অনেক অকথিত কাহিনী। সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা এক দুর্ধর্ষ বিদ্রোহীর উন্মেষ ঘটতে যাচ্ছে এই বইয়ে। এই মুহূর্তে আমাদের জাতীয় জীবনে জিয়াউদ্দিনের মতো একজন ব্যক্তিত্ব নানা কারণে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। একটি বিশেষ ক্রান্তিকাল আমরা অতিক্রম করছি অত্যন্ত ব্যর্থভাবে, পঙ্গুর মতো। প্রয়োজন সাহসী দিক নির্দেশনা, প্রয়োজন কিছু সত্যিকারের মানুষ। মেজর জিয়াউদ্দিন নিজেই স্বীকার করেছেন তার জীবনাচরণ, আদর্শিক ভাবনা একবারে নির্ভুল ছিল না। সময়ের প্রেক্ষাপটে ঘটে গেছে কিছু অবধারিত ভ্রান্তি। তবে সেটাই প্রধান বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য হলো, একজন মানুষের সার্বিক উদ্দেশ্যের সততা। মেজর জিয়াউদ্দিন তার জন্মভূমিকে ভালবেসেছিলেন প্রাণ দিয়ে, এখনো বাসেন। তিনি ভালোবেসেছিলেন সাধারণ মানুষকে, এখনো বাসেন।

এবং ভালবাসার চাইতে বড় সত্য পৃথিবীতে আর কী থাকতে পারে?

প্রস্তুতি পর্ব

মেজর জিয়াউদ্দিন (অবঃ) ভয়াবহ রকমের ব্যস্ত একজন লোক। ব্যাপক রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি ব্যবসায়িক কাজের ফাঁক ফোকর গলিয়ে সময় বের করা তার জন্য দুঃসাধ্য এক ব্যাপার। সাপ্তাহিক সংবাদচিত্রের পক্ষ থেকে যখন সিদ্ধান্ত নেয়া হল, মেজর জিয়াউদ্দিনের সুন্দরবন ভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে এবং সেই লেখা সংগ্রহ করার দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর তখন আমি ভাবতেই পারিনি কী মারাত্মক দুর্ভোগ দেড় বছরব্যাপী আমাকে পোহাতে হবে।

ধারাবাহিকটি লেখার নিয়ম দাঁড়াল, মেজর জিয়াউদ্দিন (অবঃ) ৭১ এর কাহিনী বলে যাবেন। সেটা ধারণ করা হবে টেপ রেকর্ডারে এবং পরে সেটা আমি লিখে ফেলব।

একটি ক্যাসেট রেকর্ডার বগলে নিয়ে দিনের পর দিন ঘুরতে হয়েছে আমাকে। এমনকি ছুটতে হয়েছে সুন্দরবন পর্যন্ত। মুশকিলের ব্যাপার হলো ঢাকা থেকে সুন্দরবন–সব জায়গাতেই তিনি সমান ব্যস্ত। আধঘন্টা, একঘন্টা কিংবা আরো বেশি সময়ের ফাঁক বের করা খুবই কঠিন। অথচ বাইশ বছর আগের ঘটনাগুলো প্রেক্ষাপটসহ বর্ণনা করার জন্য প্রচন্ড মনোসংযোগ প্রয়োজন যা মেজর জিয়াউদ্দিন (অবঃ) স্বাভাবিকভাবেই দিতে পারেননি। ফলে

যা ঘটার তাই ঘটেছে। ঘটনা আগু পিছু হয়েছে, কিছু বাদ পড়েছে, কিছু সহযোদ্ধার নাম স্মরণে আনতে পারেননি এবং মাঝে মাঝে কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এতো কিছুর পরেও যে বিষয়টি আমাকে অভিভূত করেছে তা হলো মেজর জিয়ার আন্তরিকতা। তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন, ভ্রান্তি যেন না ঘটে সেজন্য যথাসম্ভব সতর্ক থেকেছেন।

সুন্দরবনের মুক্তিযুদ্ধে মেজর জিয়াউদ্দিন (অবঃ) প্রত্যক্ষভাবে যে সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন তা অবিস্মরণীয়। দুঃখ লাগে একথা ভাবতে যে, এরকম একজন সাবসেক্টর কমান্ডার, এরকম একজন দেশপ্রেমিক যোদ্ধাকে সরকারী কোন খেতাব দেয়া হয়নি। তিন তিনবার খেতাব দেয়ার জন্য তার নাম রিকমেনডেশন করা হয়েছে। কিন্তু একটি বিশেষ মহলের কোটারী স্বার্থের কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি থেকে যান খেতাব বর্জিত। যা হোক খেতাবই বড় কথা নয়। সবচেয়ে বড় বিচার জনগণের হাতে।

এবারে এই গ্রন্থ প্রস্তুতির ব্যাপারে কিছু বলা যাক। গত বছরই আমি ভেবেছিলাম–মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবনের সেই উন্মাতাল দিনগুলি'কে গ্রন্থরূপ দেয়া প্রয়োজন। কারণ বিবিধ। এমনিতেই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকাশনা বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে কম। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ২৩ বছর পেরিয়ে যাওয়ায় দেশে নতুন একটি প্রজন্মেরও উদ্ভব ঘটেছে। তারা শুনেছে ৭১–এ একটি যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু দেশের সরকার এবং অন্যান্য মহলের প্রচার মাধ্যম আজও সঠিকভাবে জানাতে পারেননি কোন প্রেক্ষাপটে কারা সেই যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। নতুন প্রজন্ম শুনেছে মহান মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতার ঘোষণা, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস–এরকম বিচ্ছিন্ন কিছু বিশেষণ এবং শব্দ। তা'ও যার যার ব্যক্তিগত, দলীয় স্বার্থ এসব শব্দ এবং বিশেষণকে নিরপেক্ষ থাকতে দেয়নি। এ প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সৎ প্রকাশনা খুবই প্রয়োজন। এই চিন্তা থেকেই এই গ্রন্থের পরিকল্পনা। তবে সময়ের স্বল্পতার জন্য গত বছর বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এবারে সম্ভব হল।

যে পদ্ধতিতে বইটি লেখা হয়েছে সে পদ্ধতির দুর্বলতার কথা আগেই বলা হয়েছে। মুখে বলা এবং লিখিত ভাষায় প্রকাশ করার মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক। মুখের কথায় যা সাবলীল লেখার ভাষায় তা–ই জটিল, হয়তো ব্যাকরণ সম্মত নয়। এই জটিলতা নিরসনে কষ্ট হয়েছে প্রচুর এবং সম্পূর্ণ নিরসনও করা যায়নি। ফলে পাঠক হয়তো কোথাও কোথাও হোচট খাবেন। অস্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করতে পারেন। তবে একটা জিনিস স্বীকার করতেই হবে, যে সততা প্রতিফলিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবনের সেই উন্মাতাল দিনগুলি গ্রন্থে তা বিরল। এই সততার জন্যই মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিক মেজর জিয়াউদ্দিনকে বিশাল একটি ধন্যবাদ জানানো যায়।

দেলোয়ার হোসেন
অনুলেখক
সহ সম্পাদক, সংবাদচিত্র

৭০ সালের প্রথম দিককার ছবি। জিয়াউদ্দিন আহমেদ তখন পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীর একজনক্যাডেট।

সুন্দরবনে, কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাসহ

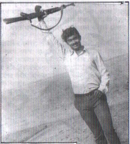

একাত্তুরে সুন্দরবনের সমুদ্র উপকূলে, মুক্ত এলাকায়

দীর্ঘদিন মায়ের সঙ্গে দেখা হয়নি। কেটেছে কষ্টের দিন, অনাহারের দিন, স্বপ্ন সফল করার অবিস্মরণীয় দিনগুলি। অবশেষে বিজয়ীর বেশে মায়ের বুকেই ফিরে আসা। তবু উদ্ধত সঙ্গীন।

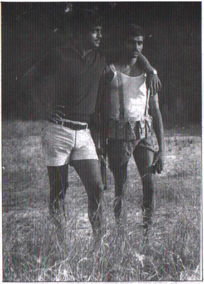

মুক্ত স্বদেশ। হানাদার পাকিস্তানী, জামাত–মুসলিম লীগের রাজাকার–আলবদর–আলশামসরা পরাজিত। সহপাঠী এবং সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রশিদের সঙ্গে আমি। ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে সুন্দরবনে তোলা ছবি।

সুন্দরবনের ম্যাপ

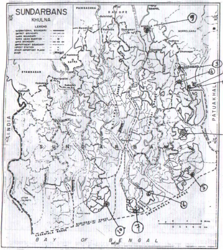
SUNDARBANS
KHULNA
LEGEND
PAIKGACHHA
DACOPE
RAMPAL
MONGLA
SYAMNAGAR
KAYRA
INDIA
PATUAKHALI
SUNDARBANS
BAY OF BENGAL
BURIGOALINI RANGE
KADAMTALE RANGE
SARANKHOLA RANGE

1. বগী; অগ্রবর্তী ঘাটি

2. শরণখোলা ; অগ্রবর্তী ঘাটি এবং সাবসেক্টর কমান্ডারের কমান্ড পোস্ট

3. শরণখোলা থানা বন্দর

4. তেতুলবুনিয়া : এই ছোট্ট নদীর দুই পাড়ে গড়ে উঠেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অপরাজেয় ঘাটি। এই জঙ্গল ঘাটিকে পশ্চাৎ ভূমি হিসেবে ব্যবহার করে শত্রুকে ঘায়েল করতে সক্ষম হয়েছে সুন্দরবনের মুক্তিযোদ্ধারা। তেতুলবুনিয়াকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের প্রায় ৪০০ বর্গ মাইল অরণ্যে মুক্তিযোদ্ধারা দুর্ভেদ্য ঘাটি গড়ে তোলে।

5.6.7. কটকা–সেলা

দুবলার চর : এসব এলাকায় ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে এক কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধার টহল ব্যবস্থা করা হয় জেলেদের নিরাপত্তার জন্য

8. মুক্তিযোদ্ধাদের বিকল্প ঘাটি এলাকা

9. মোংলা পোর্ট : মুক্তিযোদ্ধাদের নৌ কমান্ডো ইউনিট ১৬ই আগস্ট ১৯৭১ এ অভিযান চালিয়ে ১৩টি সমুদ্রগামী পাকিস্তানী জাহাজ ডুবিয়ে দেয় এখানে

10. হিরণ পয়েন্ট : নৌকমান্ডোরা এখানে হামলা চালাতে ব্যর্থ হয়

ভুল সংশোধন

গ্রন্থে সুন্দরবনের মূল ঘাঁটি এলাকা তেতুলবাড়িয়া নামে একটি মরা নদীর দুই পাড়ে গড়ে তোলা হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে নদীটির নাম তেতুলবুনিয়া। তবে স্থানীয়ভাবে নদীটি তেতুলবাড়িয়া হিসেবেই পরিচিত।

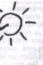

আমাদের গ্রামের বাড়ি পিরোজপুরে। সাবডিভিশনাল শহর, এক অর্থে বলা যেতে পারে গ্রামই। এখন অবশ্য পিরোজপুরের যথেষ্ঠ উন্নতি হয়েছে। স্বাধীনতার পর উন্নয়নমুলক অনেক কাজ সেখানে হয়েছে। এখন আর পিরোজপুরকে কোন অবস্থাতেই গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করা সংগত নয়। তবে আমাদের বাল্যকালে পিরোজপুকে গ্রাম ছাড়া অন্য কিছু বলার উপায় ছিল না। পিরোজপুরে খুব ভাল একটা স্কুল আছে, পিরোজপুর সরকারী উচ্চবিদ্যালয়। সেখানেই আমার পড়াশোনার পাঠ শুরু।

বাবা এ্যাডভোকেট আফতাবউদ্দিন আহমেদ ছিলেন রাজনীতিবিদ। পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনেও সক্রিয় ছিলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের সময়ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। পিরোজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছেন প্রায় তেইশ বছর। বাবার কারণেই আমাদের পারিবারিক পরিবেশে রাজনীতির হাওয়া সবসময়ই বহমান। তাঁর কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতির পাঠতো নেইনি। তবে তিনি মানুষকে নিয়ে, মানুষের সঙ্গে উঠাবসা করতে গিয়ে নিজের জীবনের মাধ্যমে যে রাজনীতির শিক্ষা দিয়ে গেছেন সেটা সহজাতভাবেই আমাদের প্রভাবিত করেছে। দেশকে নিয়ে ভাববার, মানুষকে নিয়ে ভাববার, এদের জন্যে কিছু করার আছে, কিছু করা যেতে পারে এই চেতনা সেই শিশু জিয়াউদ্দিনের মনে সরাসরি ঢুকিয়ে দেয়নি কেউ। আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাই এমন ছিল যে ছোটবেলাতেই বুঝে গেছি মানুষের জন্যে করার কিছু আছে।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টে'র সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পরবর্তীতে আইয়ুবের সামরিক শাসন–এসবের আবছা স্মৃতি মনে আছে। ১৯৬২, ৬৩ সালের দিকে এসে বাংলার মানুষ যখন বেশীমাত্রায় রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে লাগলেন তখন আমরাও মোটামুটি সচেতন হলাম। একজন রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে কিন্তু প্রথম অবস্থায় অনেকের কাছেই পাঠ নিতে হয়। বাবা মা ভাইবোনের পারিবারিক পরিবেশ ছাড়াও দেশের সামগ্রিক আর্থ সামজিক পরিস্থিতির বোধও তার চেতনাকে সমৃদ্ধ করে।

আমার কৈশোর জীবনের একটি ঘটনা এখনো আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ঘটনাটি আমাকে সাংঘাতিক উদ্দীপ্ত করেছিলো। একজন শিক্ষক যদি সচেতন ও দেশপ্রেমিক হন তাহলে তিনি তার ছাত্রদের মাঝে কী প্রচণ্ড প্রভাব ফেলতে পারেন তা পাঠকেরা অনুধাবন করতে পারবেন এর মাধ্যমে। ১৯৬৩ সালের ঘটনা সেটি। আমি তখন ক্লাশ সেভেনের ছাত্র। একুশে ফেব্রুয়ারী, খালিপায়ে হাঁটতে হবে, স্কুল কলেজগুলো বন্ধ থাকবে, ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করবে, রাস্তায় রাস্তায় মিছিল হবে–এসব ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা। তখনো অবশ্য পিরোজপুরে কোন শহীদ মিনার নির্মিত হয়নি। একুশে ফেব্রুয়ারীর

আগে অস্থায়ীভাবে শহীদ মিনার তৈরী করে সেটাতে ফুল দেয়া হতো। এসবের মূল উদ্যোক্তা ছিলো প্রধানত কলেজের ছাত্ররাই। সেবার একুশে ফেব্রুয়ারী সকালে পিরোজপুর সোহরাওয়ার্দী কলেজের ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। সকাল দশটা কি এগারোটা বাজে তখন। একুশের গানে সম্মিলিত কণ্ঠের জোয়ারে মুখরিত রাজপথ। মিছিলটি একসময় আমাদের স্কুলের সামনে এসে শ্লোগান দিতে লাগল, ছাত্র ভায়েরা, বেরিয়ে আসুন। সেই আহ্বান শুনে আমি সহ কয়েকটি ছেলে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। বেরিয়ে পড়লাম ক্লাশ থেকে। তারপর স্কুলের দেয়াল ডিঙ্গিয়ে মিছিলে শরীক হওয়া। এর পর দেখা গেল পুরো স্কুলের ছাত্ররাই ক্লাশ ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। আমাদের সাহস তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিল মনে হয়। সেদিনকার মতো ক্লাশ বন্ধ। পরদিন খুব ভয়ে ভয়ে স্কুলে গেলাম। কারণ ভাবনা হচ্ছিল স্যাররা সাংঘাতিক বকা দেবেন। যদিও পুরো স্কুলের ছাত্ররাই মিছিলে যোগ দিয়েছিল শেষ অবধি। সবাইকে চিনে রাখা বা শাস্তি দেয়া তো সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা যে কজন প্রথম দেয়াল টপকেছি তাদেরকেতো স্যাররা ঠিকই চিনে রেখেছেন। আমাদের মনে এই শংকা আমূল গেড়ে বসেছিল যে, আমাদের চার পাঁচজনের কোন রেহাই নেই।

আমাদের ক্লাশ টিচার ছিলেন রায়হান স্যার। ক্লাশ নিতে গিয়ে আমাদের আশংকার ঠিক উল্টো কাজটিই তিনি করলেন। ফেব্রুয়ারী আন্দোলনে বাঙালী জাতির প্রতিবাদী ভূমিকাকে তিনি ছাত্রদের কাছে খুব উচ্চ মূল্যায়নে তুলে ধরলেন। খুব চমৎকার একটা উদাহরণ দিয়ে পুরো ব্যাপারটা উপস্থাপন করেছিলেন রায়হান স্যার। তিনি বললেন, 'একটি প্রতিষ্ঠাকে ধ্বংস করতে হলে সেটার নাম বদলে দিতে হয়। আর একটি জাতিকে ধ্বংস করতে চাইলে বদলে দিতে হয় তার ভাষা। পাঞ্জাবীরা আমাদের ভাষা বদলে দিতে চেয়েছিল বাঙ্গালী জাতিকে ধ্বংস করার পরিকল্পনায়। এটা দূরভিসন্ধিমূলক। এটা ষড়যন্ত্র। এই অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে দেয়নি ঢাকার ছাত্রসমাজ। এটা রুখতে গিয়ে ওরা ঢাকার রাজপথে রক্ত দিয়েছে।' এভাবেই তিনি ফেব্রুয়ারী আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকাকে উজ্জ্বল ও মহীয়ান করে তুললেন আমাদের সামনে। আজ পর্যন্ত আমার মনে হয় স্যারের সেই কথাগুলোই কিশোর জিয়াউদ্দিনের মনে সবচেয়ে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। রাজনৈতিকভাবে সচেতন হওয়ার যে প্রয়োজন রয়েছে সেটা তখন থেকেই তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকলো। সম্ভবত শুধু আমার মনেই না, ক্লাশের আরো কয়েকজন ছাত্রের ভেতরেও স্যারের সেই বক্তব্য উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। এটা বলছি এই কারণে যে আমার বেশ কয়েকজন সহপাঠী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য। আমরা সবাই সেই একই বক্তব্যে উজ্জীবিত হয়েছিলাম কিনা সেটা স্পষ্ট করে বলা যাবে না। কিন্তু এটা বলতে পারি যে, পরবর্তী স্কুল জীবনে, কলেজে পড়ার সময় এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন স্যারের সেই বক্তব্যের মূল্যায়ন করেছি আমরা।

সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের পর্ব সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমার মনে হয় বাল্য ও কৈশোরের আরো কিছু ঘটনা বলে নেয়া প্রয়োজন। পড়াশোনার জীবনে আমি খুব যে ব্রাইট ছাত্র ছিলাম এমনটা বলা যাবে না। অংক ও বাংলায় বেশ ভালো ছিলাম। স্কুলের শিক্ষকরাও আমাকে ভালবাসতেন। তাদের মূল্যায়নও আমাকে বেশ গর্বিত করতো। আমার মনে আছে রায়হান স্যারের কথা। উনি একবার বলেছিলেন, বাংলায় জিয়াউদ্দিনের ভাল দখল আছে। ক্লাশ নাইন কিংবা টেনে হবে, বাংলায় সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছিলাম আমি। সবসময় সর্বোচ্চ নাম্বার না পেলেও বাংলায় সবসময়ই ভাল নাম্বার পেয়েছি। আর অংকের ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত। আমি যখন ক্লাশ ফাইভের ছাত্র তখন একবার অংকে ফেল করে বসলাম। অংকের স্যার আমাকে খুব ভালবাসতেন। ফেল করায় তিনি আমাকে খুব তিরস্কার করলেন। জেদ

চেপে গেল মনে। পরের পরীক্ষাতেই অংকে সবচে বেশি নাম্বার পেলাম ক্লাশে। তবে এ পর্যন্তই বলা যায়। কারণ পড়াশোনার ব্যাপারে ছিলাম খুব উদাসীন প্রকৃতির। ভালো রেজাল্ট করতেই হবে এমন কখনোই মনে হতো না।

যাহোক বাল্যজীবনে, বিশেষ করে বলা যায় স্কুল জীবনের একটি ঘটনাকে খুব গুরুত্ববহ এবং ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করি আমি। যখন ক্লাশ ফাইভে পড়ি তখনকারই ঘটনা। আমাদের পাঠ্য পুস্তকে ঝুমিয়া বীর নামে একটি গল্প ছিল। গল্পটি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের এক ঝুম চাষী জান মোহাম্মদকে নিয়ে। জান মোহাম্মদ বিদ্রোহ করেছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। সে অস্বীকার করছিল নিজেদের চাষ করা ফসল ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে। চাষীদের সংঘবদ্ধ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, নিজেদের ফসল নিজেরাই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে এবং যুদ্ধ করতে করতে একসময় তারা সবাই মারা যায়। এই গল্পটি বুঝিয়ে পড়াতে গিয়ে আসমত আলী স্যার জান মোহাম্মদ হিসেবে নির্বাচন করলেন আমাকেই। তিনি বললেন, 'ধরে নাও, আমাদের জিয়া হচ্ছে জান মোহাম্মদ। সে এভাবে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করল। এভাবে যুদ্ধ করল। ইত্যাদি ইত্যাদি।' আমি জানিনা কেন স্যার আমাকেই মনোনীত করেছেন জান মোহাম্মদ হিসেবে। সেই বালকের মধ্যে স্যার কী এমন দেখেছেন যে তার মনে হয়েছে আমিই জান মোহাম্মদ হয়ে উঠবো একদিন। দেশকে মুক্ত করার জন্য, নিজের অধিকার রক্ষার জন্য জীবন পণ লড়াই করবো, সেদিন বুঝতে পারেনি। তবে আমার মনে হয় ঘটনাটা বেশ ইঙ্গিতবহ।

কিছুটা পূর্বপ্রসঙ্গ থেকে শুরু করি। ১৯৬২ সালে তৎকালীন হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। তখন আমি ক্লাশ সিক্সের ছাত্র। তখনই সেই ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হই। যদিও বলাই বাহুল্য, বয়সটা একেবারেই অনুকূলে নয়। তবু ছাত্র ধর্মঘটে অংশ নিয়েছি। কিছু কিছু মিছিলেও গলা মিলিয়েছি। ক্লাশ সিক্সের একজন ছাত্র একটি আন্দোলনের সঙ্গে যতোটুকু সক্রিয় হতে পারে তার পুরোটাই হয়েছি। পরবর্তীতে, সম্ভবত ক্লাশ সেভেনের শেষ দিকে অথবা সবেমাত্র ক্লাশ এইটে উঠেছি, এমন সময় একটা নিষিদ্ধ বই পড়ে ফেলি। বইটার নাম স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম। বইটা পড়ে জানতে পারলাম মাস্টারদা সূর্যসেনের সেই কাহিনী। আয়তনে বইটা বেশ বড়। তবুও সেই বয়েসেই ওটা পড়তে গিয়ে কোন রকম ক্লান্তি অনুভব করিনি। বইটা আইয়ুব খান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন সামরিক আইন জারীর দু'এক বছর পরেই। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' অবশ্য প্রকাশিত হয়েছিল মধ্য পঞ্চাশের দিকে। যাহোক, এই বইটা পড়ার মধ্য দিয়ে আমার চেতনার রাজ্যে যেন বিপ্লব ঘটে গেল। বৃটিশ তাড়াতে যে সশস্ত্র আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনটি ঠিকভাবে বিকশিত হয়নি। আমার মনে হয়েছে পাঞ্জাবীদের এদেশ থেকে তাড়ানোর জন্যেও সশস্ত্র আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে। এবং সেই আন্দোলনে বিপ্লবীদের কষ্টকর জীবন কাহিনী পড়ে নিজেকে ঠিক তাদের মানসিকতায় নিয়ে যেতে বেশ সময় লেগেছে আমার। তারা যে রকম কষ্ট করেছে, যে অকথ্য অত্যাচার সয়েছে, যেভাবে তাদের হত্যা করা হয়েছে, মাস্টারদার ফাঁসি–সবকিছু মিলিয়ে ব্যাপারটা বেশ মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। প্রেরণাও যুগিয়েছে অবশ্যই। তখনই দৃঢ় একটি ভাবনা মনের মধ্যে গেড়ে বসেছে যে, পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে সেই ধরনের সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া আমাদের মুক্তির কোন পথ নেই। এসমস্ত চিন্তাভাবনা এবং বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষিত আলাদা করে দিয়েছে আমার এবং আমার দু'একজন বন্ধুর কৈশোরকালের শেষ প্রান্তটিকে। আমাদের যৌবনের শুরু ঠিক তখনই। আমরা সেসময় শরীর চর্চা অনুশীলন করতাম। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে শরীর চর্চা ক্লাব, তাদেরকে সুশৃংখল করা, ব্রহ্মচারীত্ব অনুশীলন করা এমনসব ভিন্নধর্মী কাজকর্ম করে

সময় ব্যয় হতো আমাদের। অন্যরকম একটা চেতনায় সাংঘাতিক উদ্দীপ্ত ছিলাম আমরা সেই কজন ছেলে। তখনই একমনা কয়েকজন বন্ধু মিলে ভাবতাম, চরিত্রবান হতে হবে। শরীরে শক্তি যোগাতে হবে। লড়াই করতে হবে। মানুষের জন্য কিছু করতে হবে। এদেশের জন্য করতে হবে। দেশকে মুক্ত করতে হবে। পাঞ্জাবীরা দেশকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। তাদেরকে তাড়াতে হবে। এইরকম ভাবনা যাদের ছিল সহপাঠী ও প্রতিবেশী বন্ধুদের মধ্যে তারা সবাই মিলে প্ল্যান করেছিলাম সুন্দরবনে ঘাঁটি করবো। অবশ্য এটা সিরিয়াস কোন পরিকল্পনা ছিল না। ভাসা ভাসা রোমান্টিক কল্পনা বলা যেতে পারে। বলা যেতে পারে কিছু স্বাপ্নিক কিশোরের একটা দুঃসাহস, দেশকে ভালবাসা, মানুষকে ভালবাসা। তখন কী পরিমাণ উদ্বেলিত হয়েছিলাম এসব ভাবনায় তার একটা উদাহরণ হাজির করা যেতে পারে পাঠকদের সামনে। যুদ্ধের পরে ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে পিরোজপুরে আমাকে গণসম্বর্ধনা দেয়া হয়। সেই অনুষ্ঠানে আমার স্কুল জীবনের এক সহপাঠী এসে হাজির। সঙ্গে তার কাছে আমার লেখা একটা চিঠি। ক্লাস টেনে পড়ার সময় লিখেছিলাম চিঠিটা। চিঠির মর্মবস্তু হচ্ছে, 'পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটা করতেই হবে আমাদের এবং যদি আর কোন উপায় না থাকে তাহলে আমাদের দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমেই করতে হবে সেই যুদ্ধ। এবং সুন্দরবনকে আমরা আমাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করবো।'

পাঞ্জাবীদের তাড়ানোর ব্যাপারে কিশোর জিয়াউদ্দিন কতোটা সিরিয়াস ছিলো তা বোঝানোর জন্যেই ঘটনাটা উল্লেখ করলাম। সেই ১৯৬৫, ৬৬ সালে যখন কিশোরকাল পেরিয়ে যৌবনের শুরু হতে যাচ্ছে তখনই একটা চিন্তা সারাক্ষণ মাথায় ঘুরপাক খেতো। ভাবতাম, রাষ্ট্রযন্ত্র ভাঙ্গে কিভাবে? রাষ্ট্রযন্ত্র ভাংতে হলে কাকে পরাজিত করতে হবে? পাঞ্জাবীদের তাড়ালেই কি হবে? কাকে ধ্বংস করতে হবে? এই সমাজ, এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোন কোন অংশে আঘাত করলে আমরা পাঞ্জাবীদের হটিয়ে দেশকে স্বাধীন করতে পারবো? এইসব প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব জানা ছিল না। প্রশ্নগুলো দুর্বোধ্য ভাবনার মধ্যে ফেলে দিলো আমাকে। বয়সটা এমন যে এসব জরুরী প্রশ্নের উত্তর জানা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। যাহোক, কিশোর জিয়াউদ্দিনের মানসিকতায় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কতোটা প্রভাব ফেলেছিল তা পাঠক নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

এতোক্ষণেও সুন্দরবন নিয়ে কিছুই বলা হয়নি। অথচ সুন্দরবন আমার বাল্য ও কৈশোরের আশ্চর্য এক আকর্ষণ। সমস্ত রোমান্টিক ভাবনার উৎপত্তিস্থল। পিরোজপুর সদর থেকে সুন্দরবন খুব কাছে। মাঝখানে দূরত্ব মাত্র পনের মাইল। তখন সুন্দরবন এলাকায় আজকালকার মত এতো লঞ্চ, ট্রলার, ম্যাকানাইজড বোট- এ সব কিছুই নেই। প্রথম সুন্দর বনে যাই বাবার সঙ্গে, যখন আমি ক্লাশ সিক্সের ছাত্র। তখন সহজেই যে কেউ সুন্দরবন যেতে

পারতো। আজকালকার মতো নানারকম বিধিনিষেধের বেড়াজাল ছিল না। ছিল না ওয়াইল্ড লাইফ রিজার্ভেশন, কনজার্ভেশন এই সব প্রতিষ্ঠান। এমনকি তখন হরিণ শিকারের লাইসেন্স বা পারমিটও পাওয়া যেতো। সুন্দরবনে গেলাম। বনের আশে পাশের এলাকায় আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন থাকতেন। বাবা কিন্তু প্রথমে আমাকে নিয়ে যেতে রাজী হননি ছোট বলে। মা তখন বাবাকে বলেছেন, 'আমার জিয়াউদ্দিনের সাহস আছে। ও যেতে পারবে। ভয় পাবে না।' একথার পর বাবা নিয়ে যেতে রাজী হন। যাহোক একটা নৌকায় করে সন্ধ্যার ঠিক পর পর বনের দিকে রওনা দিলাম আমরা। সঙ্গে পেশাদার শিকারীও রয়েছেন। তিনি আমাদের আত্মীয়ও বটে। যেখানে গিয়ে নৌকা ভিড়লো, সেখান থেকে একজন মানুষ নিয়ে গিয়েছিল বাঘে। নিয়ম হলো যেখান থেকে বাঘে মানুষ নিয়ে যায় সেখানে একটা পতাকা উড়ানো হয় যে কোন কাপড়ের। সেই জায়গাটিতেও একটা পতাকা ছিলো। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে পতাকাটা দেখতে পাইনি। শিকারীসহ আমরা কয়েকজন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম টর্চ নিয়ে। বাবা অবশ্য নৌকাতেই রয়ে গেছেন। শিকারী কিন্তু আমার উপস্থিতি পছন্দ করছেন না ছোট বলে। যাহোক আধমাইলের মতো ভেতরে ঢুকে শিকারী আমাকে একটা গাছের উপরে উঠতে বললেন। বললেন, 'হরিণ টরিন এলে এখান থেকেই শিকার করতে পারবে। শক্ত হয়ে বসে থাকো।' বলে তিনি ঢুকে গেলেন ভেতরে। আমি বসেই আছি। ঘন্টা দেড়েক পরে ফিরে এলেন তিনি। নামতে বললেন গাছ থেকে। নামার পর শিকারী তার অন্যান্য লোকদের বললেন, 'কাছে পিঠে বাঘ আছে।' বাঘের গায়ে বিশ্রি একটা গন্ধ রয়েছে। কাছাকাছি থাকলে এই গন্ধ শুকেই বাঘের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। যাহোক আমরা ফিরে এলাম নৌকায়। সুন্দরবনের একেবারে পাশ ঘেঁষে চলতে শুরু করলো নৌকা। কিছুক্ষণ পরই নদীর পাড়ে টর্চ মেরে দেখা গেল দুটো চোখ জ্বল জ্বল করছে। আমরা ভাবলাম, হয়তো হরিণ। টর্চটা সেই চোখদুটোর ওপর কিছুক্ষণ ধরে রাখার পর চোখদুটো সরে গেল। জোয়ারের দিকে আমাদের নৌকা এগোচ্ছে। আবার সেই জ্বল জ্বলে দুটো চোখ। আবার কিছুক্ষণ পর একই দৃশ্য। এখানে বলে রাখি, বাঘের চোখও রাতে জ্বলে, হরিণের চোখও জ্বলে। এভাবে অন্তত আধামাইল সেই চোখদুটো আমাদের অনুসরণ করে এগুচ্ছে। আমাদের সঙ্গী শিকারী আধামাইল পেরোনোর পর বুঝতে সক্ষম হলেন এটা হরিণ নয়, মানুষ খেকো বাঘ। তিনি বললেন, 'হরিণ না, এটা মামু।' সুন্দরবনের মানুষ বাঘকে কখনো বাঘ বলে না। বলে মামু অথবা হিয়াল। যাহোক বনের পাশ ঘেঁষে নৌকা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে টর্চ মেরে জঙ্গলের পাশে সেই জ্বলজ্বলে চোখদুটো দেখা যাচ্ছে। এরই মধ্যে দু'এক বার লক্ষ্য স্থির করে শিকারী একবার গুলি করে দিলেন টর্চের আলোয় চূড়ান্ত লক্ষ্য ঠিক করে নিয়ে। বাঘটা শরীরে শিহরণ জাগানো চিৎকারে বন কাঁপিয়ে দিল। বোঝা যাচ্ছে লক্ষ্য ঠিক মতোই ভেদ হয়েছে। যাহোক তখন আমরা আর নামিনি। এগিয়ে গেছি। শেষরাতের দিকে একটা হরিণ শিকার করি আমরা। পরে শুনেছি পরদিন শিকারীরা গিয়ে মৃত বাঘের চামড়া নিয়ে এসেছে। অবশ্য তখনকার দিনে আজকের মতো বাঘের চামড়া অতো দামী ছিল না। তবুও বাঘের চামড়া! মূল্যবানতো বটেই। এই হচ্ছে সুন্দরবনে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা।

এর পরে, স্কুল জীবনে আরো দু'একবার সুন্দরবনে গিয়েছি। কলেজ জীবনেও একবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। এই যাওয়া আসার ভেতর দিয়েই সুন্দরবনকে ঘিরে আমার নানারকম স্বপ্ন গড়ে ওঠে। চীনা ফৌজ গভীর জঙ্গলে লংমার্চ করতো। তখনতো চীনের বিপ্লবের সঙ্গে আমরা পরিচিত। তাছাড়া ফিদেল ক্যাস্ট্রোর কথাও আমরা জানতে পারি পরবর্তীতে। এইসব মিলিয়ে সুন্দরবনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে আমাদের নানারকম কল্পনার

ফানুস। তবে এটা ঠিক, সুন্দরবন প্রকৃত অর্থে মুক্তির সংগ্রামে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে সেসম্পর্কে সেসময় আমার কিংবা সঙ্গীসাথী কারোরই পরিষ্কার কোন ধারণা ছিল না।

কলেজ জীবনে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লাম। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ছয়দফা ঘোষণা করার পরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গণটা বেশ গরম হয়ে ওঠল। আমার বাবা ছিলেন আওয়ামীলীগের পিরোজপুর জেলা শাখার সভাপতি। পারিবারিকভাবেই রাজনৈতিক আবহাওয়াতে বড় হয়েছি। সুতরাং ঠিক কিভাবে যে তখন রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলাম তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারবো না। তবে তৎকালীন রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে একসময় লক্ষ্য করলাম রাজনীতিটা জীবনের একেবারে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। পিরোজপুরে ছাত্রলীগের প্রথম যে কমিটি গঠন করা হয় সেখানে আমারও যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। কিন্তু একবছরের মাথাতেই হোচট খেলাম। যদিও বঙ্গবন্ধু পাঞ্জাবী শাসকদের বিরুদ্ধে ছয়দফা দিয়েছেন তখন কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল আওয়ামীলীগ বা ছাত্রলীগের ভেতর শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ, সশস্ত্র সংগ্রামের কোন উপাদান নেই। ধারণাটা খুব গভীরভাবে মনের ভেতর গেঁথে যাওয়ায় ছাত্রলীগ ছেড়ে দেই আমি। ১৯৬৮ সালে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপে যোগ দিই। সেসময় ছাত্র ইউনিয়ন বিভক্ত হয়ে গেছে।

১৯৬৮–৬৯ সালে ছাত্রদের আন্দোলন তুঙ্গে উঠল। এগারো দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্ররা তখন তীব্রবেগে ছুটিয়ে দিয়েছে আন্দোলনের ধারা। আমি সেই আন্দোলনে খুবই সক্রিয়। বলা যেতে পারে, প্রথম সারিতেই রয়েছি। ৬৮ সালের মাঝামাঝি এই আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণেই কয়েক ঘন্টা হাজত বাসও করেছি। আন্দোলন যখন তুঙ্গে সেসময় পিরোজপুরে একটি রাজনৈতিক জনসভার আয়োজন করা হয়। পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে ভেবে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারী করল। আমি সেই সভার মাইকিং করছিলাম নির্ধারিত সভার আগের দিন। পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করল। ঘন্টা পাঁচেক আটকে রেখেছিল থানায়। এরপর ছেড়ে দেয়। অবশ্য এরই মধ্যে আমার মা আমাদের গৃহশিক্ষককে দিয়ে থানায় খবর পাঠান আমি যেন ভয় না করি। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকাটাই অনেক অভিভাবক অন্যায় মনে করতেন। তার ওপর কোন কারণে গ্রেফতার হলেতো কথাই নেই। আমার মা ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া মহিলা। আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এ সংবাদ পেয়েই থানায় খবর পাঠিয়ে দেন তিনি। নৈতিকভাবে আমি যেন দুর্বল হয়ে না পড়ি, আমি যেন মনে না করি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে মা অখুশি হয়েছেন সেটা জানানোর জন্যেই তিনি উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। তিনি স্পষ্টতই বলে দিয়েছিলেন, 'জিয়াউদ্দিন যেন কোন ভয়ভীতি না রাখে মনে। ও যা করছে কোন অন্যায় করেনি। ও যেন মাথা নত না করে।'

৬৮ সালের শেষ এবং ৬৯ এর প্রথম দিকে সারা বাংলাদেশই আন্দোলন মুখর। গণঅভ্যুথানের পূর্ব অবস্থা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে আরো অনেকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বিখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়েছিল তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় দেড় দুবছর আগে। প্রধানত এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে ৬৯ এর শুরুতে আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নিলো। আসাদের মৃত্যু, মতিউরের মৃত্যু, ছাত্র জনতার ওপর ইপিআর ও পাকসেনাদের নির্বিচার গুলিবর্ষণ, জনগণ কর্তৃক সান্ধ্য আইন ভেঙ্গে রাজপথে বিদ্রোহ ঘোষণা, এসব ঘটনা দাবানলের মতো আন্দোলনকে করে তুলেছিল চতুর্মুখী। আমাদের ইতিহাসে, বাঙালী জাতির স্বাধীনতার আন্দোলনে ৬৮–৬৯এর আন্দোলনের অবশ্যই একটি বিরাট গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে গেলে একজন বাঙালী হিসেবে ৬৯ এর গণঅভ্যুথানের সুমহান দিকটিকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। একই সাথে ছাত্রসমাজের এগার দফা আন্দোলনও তখন বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। একঅর্থে বলতে গেলে সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাত্র সমাজের হাতেই ছিল। যদিও আন্দোলনের ইস্যু ভিত্তিক চরিত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং ছাত্রসমাজের দাবী, পূর্ববাংলার স্বাধিকার ইত্যাদিই মুখ্য প্রতিপাদ্য হিসেবে এসেছে। ঢাকার ছাত্র জনতা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারকের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলো, সমগ্র ঢাকার জনগণ সান্ধ্য আইন ভেঙ্গে অধিকার করে নিলো রাজপথ, মাওলানা ভাসানী পল্টনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মুজিব আমার ছেলে। মুজিবকে আমি মুক্ত করে আনতে চাই। তোমরা ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করো।' লাখো জনতার ঢল নামল ক্যান্টনমেন্টের দিকে। সার্জেন্ট জহুরুল হক, সার্জেন্ট ফজলুল হকসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অনেক বিচারাধীন বাঙালী সৈনিকের ওপর পাকিস্তানী সৈনিকরা বর্বরভাবে হামলা চালালো তাদের সেলের ভেতর। অনেককে গুলি করে হত্যা করা হলো। মারাত্মক আহত হলো কয়েকজন। সার্জেন্ট ফজলুল হক পরবর্তীতে আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং তিনি সংসদ সদস্য হিসেবেও নির্বাচিত হয়েছেন। যাহোক সার্জেন্ট জহরুল হকের মৃত্যু, আসাদ মতিউরের মৃত্যু সমগ্র বাঙালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। পাকিস্তানীদের সমস্ত ভাওতাবাজী, সমস্ত বিভ্রান্তি কাটিয়ে বাঙালী জাতি বিদ্রোহ ঘোষণা করল যেটাকে আমরা মহান গণঅভ্যুথান ৬৯ বলে জানি। পাঞ্জাবীরা অবশ্য এই অভ্যুথানকে ভিন্নপথে পরিচালিত করবার যথেষ্ঠ চেষ্টা করেছে। বাঙালী–বিহারী দাঙ্গা লাগিয়ে সেটাকে হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা হিসেবে চিহ্নিত করে। এই প্রপাগান্ডা চালিয়ে তারা বাঙালী জাতির আন্দোলনকে নস্যাত করতে চেয়েছে। আরো অনেক কূটকৌশল পাকিস্তানীরা খেলেছে, কিন্তু কিছুই কাজে আসেনি। মাওলানা ভাসানীর হুংকার, সার্জেন্ট জহুরের আত্মাহুতি, আসাদ মতিউরসহ বহু বাঙালী তরুণের বুকের তাজা রক্ত ঢালার মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতি নতুন একজন নেতাকে সৃষ্টি করল। প্রাণের বিনিময়ে টগবগে তারুণ্যের বলিদানের মাধ্যমে পাওনা বুঝে নিলো তারা। বাঙালী জাতি রক্তের বিনিময়ে তার ঐতিহাসিক পাওনা পেল। একজন নেতা যিনি বাঙালী জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের অবিসংবাদিত পুরুষ, ছয় দফা দাবী আদায়ের মাধ্যমে বাঙালী জাতির অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে যিনি অনেক দুর্নামের ভাগীদার হয়েছেন, অনেক অত্যাচার নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, কারাগারে কাটিয়েছেন দীর্ঘদিন, মাওলানা ভাসানীর এককালীন ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী এবং একজন তরুণ নেতা শেখ মুজিব ১৯৬৯ এ এসে পুরো বাঙালী জাতির একক, অবিসংবাদী, তুলনাহীন নেতা হিসেবে নিজেকে জাতির সামনে এবং বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করতে সক্ষম হলেন। বাঙালী জাতির ভেতরে এমন একটি দৃঢ় ঐক্য সৃষ্টি হলো এই নেতাকে ঘিরে যা পাকিস্তানীদের কায়েমী স্বার্থের ভিত

কাঁপিয়ে তুলল। আইয়ুব খাঁ নাটকীয়ভাবে, কেবল ছোট্ট একটি বক্তৃতার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের মসনদ থেকে সরে দাঁড়ালেন। এলেন ইয়াহিয়া খাঁ। ইয়াহিয়া খাঁ সাহেব ক্ষমতায় এসে প্রথম ভাষণে বেশ কড়া একটা ধমক দিলেন বাঙালী জাতিকে। ধমক দিলেন আওয়ামী লীগকে। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়েছে সেই ধমক বঙ্গবন্ধুকে তাঁর জাতির স্বাধীনতার আন্দোলন থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারেনি। ইয়াহিয়া খাঁও তাঁকে সন্ত্রস্ত করতে পারেনি। যাহোক, সামরিক আইন জারি হলো। প্রথমে যেন এই সামরিক আইন জারীতে বাঙালী জাতি একটু ভড়কে গেল। যেন একটু ভয় পেল। কিন্তু এক সপ্তাহ পেরুতে না পেরুতেই সমগ্র বাঙালী জাতি আবার জেগে উঠল।

বাঙালী জাতি যেন বুঝল এ ধরনের সামরিক আইন, এ ধরনের মৌলিক গণতন্ত্র, এ ধরনের ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে শোষণের যাঁতাকল তৈরীর নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে শাসকগোষ্ঠী। এই যাঁতাকল ভাঙ্গার যে শপথ আমরা নিয়েছি সেখান থেকে বিচ্যুত হওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। সে ধরনের প্রচেষ্টা যে কোন মূল্যে প্রতিহত করা হবে। ভয় পাবার কিছু নেই। শোষক শ্রেণীর যে কোন অপচেষ্টাকে বুকে বেঁধে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। একজন আত্মঘাতী যোদ্ধা যেভাবে নিজের বুকে টাইমবোমা বেধে শত্রুনিধনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে, জীবনের মায়া ত্যাগ করে লক্ষ্য সাধনের জন্য যেভাবে তারা আত্মাহুতি দেয় ঠিক সেইভাবে যেন সমগ্র বাঙালী জাতি প্রস্তুত হচ্ছে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য।

আমাদের শিক্ষাঙ্গণে ৬৯ এর গণঅভ্যুথান প্রচন্ড প্রভাব ফেলল। ছাত্রদের ভেতরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিস্ফোরণের পালা গুনছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের আত্মাহুতি, ডঃ জোহার আত্মাহুতি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ডঃ জোহার আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে সমগ্র বুদ্ধিজীবী মহল, শিক্ষিত মানুষ, সাধারণ মানুষ সকলেই পাকিস্তানী শাসকদের বর্বর, হিংস্র, দানবীয়, হায়েনার চেহারাটা পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারল। ডঃ জোহার মৃত্যুর প্রতিবাদে মিছিল বের করলাম। আমাদের তখনকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, একজন আদর্শ শিক্ষাগুরু জনাব দরবেশ আলী সাহেব (পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেছেন) হচ্ছেন কলেজের প্রিন্সিপাল। সেসময় আমি সবেমাত্র ডিগ্রী ক্লাশে ভর্তি হয়েছি। প্রতিবাদ মিছিলসহ অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারে সক্রিয় ছাত্রদের মধ্যে আমিও অন্যতম। যাহোক আমরা কলেজের প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে ডঃ জোহা প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনা করলাম। স্যাররা উক্ত ঘটনায় সাংঘাতিক ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কলেজের সমস্ত ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী মিলে শোকসভা করে নেমে এলাম পিরোজপুরের রাস্তায়। অন্যান্য স্কুলের ছাত্র শিক্ষকরা যোগ দিল আমাদের মিছিলে। প্রথমে ছিল মৌন শোকমিছিল, ধীরে ধীরে সেটা বিক্ষোভ মিছিলে পরিণত হলো।

ঢাকার অবস্থা আরো সঙ্গীন। পরিস্থিতি তীব্র থেকে তীব্রতর হতে হতে পরিণত হলো গণঅভ্যুথানে। আইয়ুব খাঁ ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার আগেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হলো। আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতি তার বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার পর পালিয়ে গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেলেন। মুক্তি পেলেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনসহ মামলার সমস্ত আসামী। কিন্তু সার্জেন্ট জহুরকে আমরা আর আমাদের মাঝে ফিরে পেলাম না। সার্জেন্ট জহুর বাঙালী জাতির এক গর্বিত সন্তান, এক অসম সাহসী যোদ্ধা, যিনি পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর সদস্য হয়েও বাঙালী জাতির মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য ছিলেন সক্রিয়। সেই যোদ্ধাকে পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যরা তার কারাগারের সেলের মধ্যে হত্যা করেছে।

কদিন পরেই লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম এলেন পিরোজপুরে। মোয়াজ্জেম সাহেবের গ্রামের বাড়ি আমার বাড়ী থেকে মাত্র এক মাইল দূরত্বে। আমরা দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও বটে। লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম এলাকার ছেলে, তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দুই নম্বর আসামী– এই ব্যাপারটা এলাকার মানুষের মধ্যে একটা সহমর্মীতার আবরণ গড়ে তুলল। মামলা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পর তিনি যখন পিরোজপুরে এলেন তখন আমি অন্যান্য ছাত্রনেতৃবৃন্দসহ তাঁর বাড়িতে গেলাম। বললাম স্থানীয় হাইস্কুল মাঠে তাঁকে আমরা গণ সম্বর্ধনা দিতে চাই। শুনে তিনি খুশী হলেন। বাঙালী জাতি তার সাহসী সন্তানকে স্বীকৃতি দিতে চাচ্ছে সেটা খুশী হওয়ারই কথা। খুশী মনেই তিনি তাঁর সম্মতি জানালেন।

আমার তৎপরতা শুরু হলো। অন্যান্য ছাত্রনেতাসহ বিভিন্ন মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। প্রকৃত অর্থে স্থানীয় আওয়ামী লীগ তখনো ক্ষুদ্র একটি সংগঠন, ভাসানী ন্যাপ আরো ক্ষুদ্র, কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। সবার সঙ্গেই যোগাযোগ করা হলো। স্থানীয় উকিল লাইব্রেরীতেও গেলাম আমরা। বললাম 'লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম বাংলার এক গৌরবদীপ্ত সন্তান, পিরোজপুরেরও তিনি গর্ব। তাকে আমরা সম্বর্ধনা জানাব।' সবাই এলেন। জনতার ঢল নামল। হাজার হাজার মানুষ লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেমকে একনজর দেখবার জন্য একেবারে উন্মুখ হয়ে ওঠেছে। সম্বর্ধনা সভা লোকে লোকারণ্য। সভার সভাপতিত্ব করছেন আমার বাবা। আর সভাটি পরিচালনা করছি আমি। কমান্ডার মোয়াজ্জেমের বাবা এবং চাচা আমাদের আত্মীয়তো বটেই, তাছাড়া তারা আমার বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন। অবশ্য তখন মোয়াজ্জেম সাহেবের বাবা বেঁচে নেই। তাঁর চাচা অ্যাডভোকেট মকবুল আহমেদ সাহেব তখনও বেঁচে। বাবার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের মাঝে তিনি অন্যতম। এবং পিরোজপুরের প্রবীণতম আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বলতে আমার বাবা ও মকবুল আহমেদ সাহেবকেই বুঝাতো। মঞ্চে এরাসহ আরো অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আইনজীবী উপস্থিত। অন্যান্যদের বক্তব্য আজ আর আমার স্মরণ নেই। তবে লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন সেই সম্বর্ধনা সভায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাদের দফা একটা। আমরা বাংলার স্বাধীনতা চাই। আমি রাজনীতি করিনা। তবে এই বাংলার শ্যামল মাটির মানুষ হিসেবে এই স্বাধীনতা আমার প্রাপ্য। এ মাটির স্বাধীন একজন মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার আমার প্রাপ্য। পাকিস্তানীদের ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের ভাওতাবাজী ঔপনিবেশিক শাসন ছাড়া, শোষণ ছাড়া কিছুই নয়। তাই আমরা একদফায় বিশ্বাসী। আমরা বাঙলার স্বাধীনতা চাই।' তিনি খুব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। কমান্ডার মোয়াজ্জেম সম্বর্ধনা সভা থেকে যখন বিদায় নিচ্ছেন তখন আমাকে কাছে ডেকে বললেন (হয়তো বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ইতিমধ্যে তাঁর নজর আমি কেড়েছি), 'তুমি ঢাকায় আমার সাথে দেখা কোরো।' হয়তো তিনি এমন কোন পরিকল্পনা নিয়েছিলেন যে তেজোদীপ্ত তরুণদের সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। তিনি বলেলেন, 'আমাদের অনেক কাজ আছে। তুমি ঢাকায় এসো। আমার সাথে দেখা কোরো। তোমার সাথে একটু আলাপ করবো।'

আমার অবশ্য ঢাকায় যাওয়া হয়নি। কমান্ডার মোয়াজ্জেমের সঙ্গে আর দেখাও হয়নি। সেবার পিরোজপুরেই তাঁকে আমার প্রথম এবং শেষ দেখা। কমান্ডার মোয়াজ্জেম ২৬শে মার্চ রাতে পাকিস্তানীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। আমি জানিনা, আগরতলা মামলার অন্যতম প্রধান আসামী হয়েও কমান্ডার মোয়াজ্জেম কেন সেই রাতে নিজেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেননি। কেন তিনি নিজের বাসায় ঘুমিয়েছিলেন তা আজও আমার কাছে দুর্বোধ্য। তিনি কি বুঝতে পারেননি পাকিস্তানীরা কত নির্মম, কত নিষ্ঠুর?

যাহোক, আবার সামরিক আইন জারীর পর্বে ফিরে যাই। সামরিক শাসন শুরু হওয়ার পর রাজনৈতিক কর্মকান্ড প্রায় নিরব হয়ে গেলো। ইয়াহিয়া খাঁ তার প্রথম বক্তৃতায় নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন। চারদিকে নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেলো। এর কয়েকমাস পরে ৬৯ সালের শেষের দিকে হঠাৎ করেই আমি যোগ দিলাম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে।

৬৯ সালে আমাদের পরিবার কিছুটা সংকটের মধ্যে পড়ে যায়। হঠাৎ বাবার চোখ অন্ধ হয়ে গেলো। আমার বাবা ছিলেন পিরোজপুরের প্রতিষ্ঠিত এবং প্রথম সারির একজন আইনজীবী। আগেই বলেছি তিনি দীর্ঘ বাইশ বছর পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ একজন সমাজকর্মী। কোন কাজের বিনিময়ে অর্থাৎ সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের বিনিময়ে কোনরকম মুনাফা নেয়ার কথা তিনি চিন্তাই করতে পারেননি। অপরদিকে তিনি ছিলেন প্রচন্ড দানশীল ব্যক্তি। অসাম্প্রদায়িক এবং তখনকার অর্থে মোটামুটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তার মানুষ। তিনি মানুষকে এবং এ সমাজকে একটা সুষ্ঠু পরিবেশে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন সারাজীবন। সমাজকর্মী হিসেবে তাঁর অবদান আজকেও আমাদের এলাকায় সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর শত্রুমিত্র রাজনৈতিক পক্ষ বিপক্ষ নির্বিশেষে সকলেই তাঁর সামাজিক কল্যাণকামী ভূমিকা, মানবিকতা, পরোপকার ইত্যাদি গুণের মূল্যায়ন আজকেও করে থাকেন। তিনি লোভের উর্ধ্বে ছিলেন। কোন লোভ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। মানুষকে খাওয়াতে তিনি খুব ভালবাসতেন। নিজেও খুব ভোজনরসিক ছিলেন। এই স্বীকৃতিও আমাদের এলাকায় আছে। আমাদের এলাকায় শত্রুমিত্র নির্বিশেষে এমন লোক খুব কমই আছে যারা আমার বাবার সাথে বসে একবেলা খায়নি। এই নির্মোহ, জাগতিক লোভের উর্ধ্বচারী জীবন যাপনের নীট ফলাফল এবার বর্ণনা করি। তাঁর চোখ যখন দৃষ্টিহীন হয়ে গেলো তখন দেখা গেলো পুরো পরিবারটিই আর্থিক সংকটের মুখোমুখি। তিনি সম্পত্তি অর্জনের মানসিকতায় বিশ্বাস করতেন না। বিপদের দিনের জন্য টাকা পয়সা জমিয়ে রাখার স্বভাবই তাঁর ছিল না। সে কারণেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ামাত্র পুরো পরিবারই পড়লো গভীর সংকটে। আমি তখন স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র।

এ সময়, হঠাৎ করেই বলা যায়, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা টিম এলো পিরোজপুর শহরে। অফিসার র‍্যাংকে রিক্রুটমেন্টই হচ্ছে উদ্দেশ্য। তখন কিছু নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়েই পরবর্তীতে আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন অফিসার হলাম। পাকিস্তান মিলিটারী টিম এসে আমাদের কলেজে একটা আলোচনা সভার মতো করলো। সভাটা হয়েছে কলেজের হলরুমে। তারা বোঝালেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমিশন র‍্যাংকের অফিসারের চাকরি খুব মূল্যবান। এবং এটা এখন বাংলাদেশের তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করা উচিত। আসলে ৬২, ৬৩ কিম্বা ৬৮, ৬৯ সালে পূর্ববাংলার অস্থির আন্দোলনমুখর পরিস্থিতি দেখে সম্ভবত পশ্চিম

পাকিস্তানের ঠান্ডা মাথার কিছু লোক ভেবেছে, কিছু সুযোগ সুবিধা পূর্ব বাংলার জনগণকেও দেয়া উচিত। তাতে করে হয়তো এ অঞ্চলের লোকজনকে কিছুটা ঠান্ডা রাখা যাবে। সে কারণেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই অভিনব কায়দায় তাদের অফিসার র‍্যাংকে রিক্রুটমেন্ট শুরু করলো। আমি সেদিন শহরের একটা দোকানে আড্ডা দিচ্ছি। হঠাৎ কলেজগামী এক সহপাঠীর সঙ্গে দেখা। ও আমাকে দেখে বললো, 'কি ব্যাপার, কলেজে যাচ্ছো না?' আমি বললাম, 'আমারতো ফার্স্ট পিরিয়ড নেই। একটু দেরী করে যাব।' ও বললো, 'আজকেতো কলেজে আর্মির টিম আসছে। কমিশন র‍্যাংকে রিক্রুটমেন্ট হবে। তুমি যাবেনা?' আমি বললাম, 'যাওয়া যায়।'

গেলাম। গিয়ে দেখি হলরুমে মোটামুটি আলোচনা সভা শুরু হয়ে গেছে। আমি অনেকটা ইচ্ছা করেই একেবারে পেছনের বেঞ্চিতে গিয়ে চুপ করে বসে পড়লাম। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অফিসার সেনাবাহিনীর আকর্ষণ, সফল জীবনের নিশ্চয়তা, বিরাট একটা সম্মান এবং ভূমিকা এগুলো ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দেয়ার পর বললেন, 'কেউ যদি কোন প্রশ্ন করেন তো ভাল। নইলে আমরা এখন প্রিন্সিপাল সাহেবের রুমের সামনে বসে রিক্রুটমেন্টটা বাছাই করবো। আপনারা যারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছুক তারা লাইন দিয়ে দাঁড়ালে আমরা একে একে বাছাই করবো। কারো যদি কোন প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

তখন আমাদের দু'একজন বন্ধু দাঁড়িয়ে দু'তিনটা প্রশ্ন করলো। কিন্তু প্রশ্নগুলো খুব খেলো ধরনের হয়ে গেলো। খুব নিম্নমানের প্রশ্ন সেগুলো যা পাকিস্তান সেনাবাহিনী গ্রহণ করলো একটু মুচকি হাসি সহকারে এবং উত্তরটাও দিলো তারা সেভাবেই। তখন আমার সঙ্গের বন্ধুরা আমাকে খোঁচাতে শুরু করলো, 'জিয়া, তুই কিছু বলছিস না। জাতমান থাকছে না, কিসব প্রশ্ন করছে। তুই কিছু বল।' তখন আমি দাঁড়িয়ে দুটো প্রশ্ন করলাম। প্রশ্ন করার পর তারা উত্তর দিলো গুরুত্ব সহকারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তারা ইম্প্রেসড হয়েছে প্রশ্নগুলো শুনে। যাহোক, এরপর সভাটা শেষ হলো। যারা যারা আগ্রহী তারা সবাই প্রিন্সিপালের অফিসের সামনে গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়ালো। আমি আর গেলাম না। কারণ আমার মনে তখন দৃঢ় ধারণা, পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধেই আমাকে লড়াই করতে হবে। ওদের সেনাবাহিনীতে গিয়ে আমার কোন লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না। যদিও সারাজীবনের সাধ, সেনাবাহিনীর একজন দক্ষ অফিসার হওয়া। কিন্তু ৬৯ সালের রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থান পেরিয়ে এসে আমার মনে হচ্ছে, না, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়া উচিত নয়। এ কারণে আমি আর ঐ লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম না। চলে গেলাম ক্লাশে। প্রায় ঘন্টা দুই আড়াই পরে, তখন আমাদের থার্ড কি ফোর্থ পিরিয়ড চলছে, এমন সময় হঠাৎ করে প্রিন্সিপাল সাহেবের দপ্তরী এসে আমাদের ক্লাশে হাজির। আমাদের শিক্ষক তাঁর লেকচার থামালেন। 'কি ব্যাপার?'

দপ্তরী বললো, 'স্যার, জিয়া ভাইকে কর্নেল সাহেব ডাকছে।' তখনতো আমার হিমসিম খাওয়ার অবস্থা। আগত পাকিস্তান সেনাবাহিনী টিমের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন উক্ত কর্নেল সাহেব। তিনি তো আমাকে চেনেন না। তিনি আমাকে ডাকবেন কেন? তখন মনে করলাম ঐ প্রশ্ন দুটো হয়তো তার মনে দাগ কেটেছে। বোধ হয় সেজন্যেই ডেকেছেন। পরে ওদিকে যা ঘটেছে তা জেনেছি। মোট একশ পঞ্চান্নজন ছেলে ইন্টারভিউ দিয়েছে। এরমধ্যে প্রাথমিক বাছাইয়ে নির্বাচিত হয়েছে মাত্র চার পাঁচজন। তাদের মানও মোটামুটি। কিন্তু আগ্রহীদের শেষ তরুণটি পর্যন্ত উক্ত কর্নেল সাহেব মনে মনে খুঁজেছেন আমাকে। যখন দেখলেন আমি গেলামই না তখন তিনি প্রিন্সিপাল সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কলেজের ঐ ছেলেটি কই যে শেষের প্রশ্নদুটো করেছে?' প্রিন্সিপাল সাহেব তখন আমার খুব প্রশংসা

ওতো খুব ভাল ছেলে। আমি তো জানতাম ওর অ্যাম্বিশন সে সামরিক অফিসার হবে। ভাল স্পোর্টসম্যান। হি কামস ফ্রম আ রেসপেক্টেবল ফ্যামিলী। তাঁর বাবা এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। সে এলো না কেন ঠিক বুঝলাম না।' তখন প্রিন্সিপাল সাহেব দপ্তরীকে দিয়ে আমাকে ডাকিয়েছেন। আমি গিয়ে সালাম করে দাঁড়ালাম। কর্নেল আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কেন আমি লাইনে দাঁড়াইনি। ইন্টারভিউ দিতে কেন আসিনি। আমার মনে হলো যে এরা বোধ হয় আমাকে পছন্দ করে ফেলেছে। তখন একটা খোঁড়া যুক্তি দেখানোর মতো আমি বললাম, 'স্যার, আমার মনে হয়েছে যে, আমার একটা শারীরিক ত্রুটি আছে, এটা একটু সারার পর আমি ইন্টারভিউ দেবো।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ডিফেক্ট আছে?' বললাম, 'আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালে আমার দুটো হাঁটু লেগে যায়। মাঝখানে ফাঁক থাকে না। আমি শুনেছি এটা নাকি সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়ার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করে।' কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'তুমি কি নিজে ডাক্তার?' বললাম, 'জ্বি না আমি ডাক্তার নই।' উনি বললেন, 'যদি আমরা এই ডিফেক্টটাকে ডিফেক্ট মনে না করি তাহলে তুমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যাবে?' আমি বললাম 'ইয়েস স্যার।' তখন আমাকে ফর্ম দিয়ে দিলো। ফর্ম টর্ম ফিল আপ করে ক্লাশ শেষে বিকেলে খেলাধুলা করে বাসায় ফিরলাম। তখন পাঁচটার মতো বাজে। বাসায় ফিরে বুঝলাম ইতিমধ্যে কলেজের সেই ঘটনা বাবা-মা দুজনেই জেনে ফেলেছেন। আমি কিন্তু মুখ খুলছি না। নীরব। কারণ ফর্ম ফিল আপ করার পরে আমার মনের ভেতর আবার বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আমাদেরতো বাহিনী গড়ে তুলতে হবে পাঞ্জাবীদের তাড়ানোর জন্য। পাঞ্জাবী বাহিনীর সদস্য হয়ে আমি আর এই দায়িত্ব পালন করবো কিভাবে? বাসায় আসতে আসতে, এসব ভাবতে ভাবতে আবার মন পরিবর্তন হয়ে গেলো। এ কারণেই বাসায় এসে আমি আর কিছু বললাম না। কিন্তু মা-ই এসে উল্টো আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি তুই কিছু বললিনা। শুনলাম প্রিন্সিপাল সাহেব ডেকে নিয়ে আর্মিতে ভর্তির ফর্মটর্ম দিচ্ছে। তোকে নাকি আর্মি সিলেক্ট করছে?'

আমি বললাম, 'সিলেক্ট করলেও আমি যাবোনা'। 'কি বলিস এতোবড় একটা চান্স পাচ্ছিস, তুই যাবি না! কেন যাবিনা?' আমি বললাম, 'না, কারণ আছে। আমি যাব না।' মাকে আর বলিনা যে এতো বড় বড় বিপ্লবী চিন্তা ভাবনা নিয়ে তার ছেলে বড় বড় স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। শুধু এটুকুই বললাম, 'ভাল লাগছে না, তাই যাব না।' এরপরে পাঁচ ছয় দিন এই বৃদ্ধা মহিলা আমার পেছনে লেগেই থাকলেন। অনবরত বোঝাতে লাগলেন যাতে করে আমি রাজী হই আর্মিতে যাওয়ার ব্যাপারে এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি আমার সামনে পারিবারিক সমস্যাটাও তুলে ধরলেন। বাবার চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, পারিবারিক অবস্থাটা খারাপ, তুমি সুযোগ পেয়েছো। তারপর তুমি যাবে না এটা কেমন হয়। এরকম পাঁচ সাতদিন আমার পেছনে সময় ব্যয় করে তিনি অবশেষে সফল হলেন। আমি রাজী হলাম, 'ঠিক আছে, আমি যাবো।'

পনের বিশ দিন পর যশোর সি এম এইচে মেডিক্যাল টেস্ট। মেডিক্যাল টেস্ট দিতে গেলাম। গেলাম খুব আর্থিক টানাটানির মধ্য দিয়ে। যেদিন মেডিক্যাল টেস্ট তার আগের দিন আমরা কয়েক বন্ধু, একই কলেজের চার পাঁচজন গেলাম যশোর। অন্য জায়গা থেকে আরো কয়েকজন এসেছে। আমরা যশোরে ছোট্ট একটা হোটেলে উঠলাম। রাতের বেলা দেখলাম আমার বন্ধুরা আঙুর, আপেল এসব কিনে এনে খাচ্ছে। এসব খেয়ে স্বাস্থ্য ভাল করে পরীক্ষা দিলে মেডিক্যাল টেস্টে ভাল করা যাবে। এদিকে আমার ভাত খাওয়ার টানাটানি যাচ্ছে। অবস্থাটা ঠিক এইরকম। বলতেও পারছি না। হঠাৎ করে একটু অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে গেছে পরিবার। যে পরিবার পিরোজপুরের অন্যতম সচ্ছল পরিবার, সেই পরিবার হঠাৎ করে

আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছে, সুতরাং আমার লজ্জাটা ছিল একটু বেশি। কাউকে বলতেও পারছি না যে আমি ফলটল খেতে পারছিনা শরীর ভাল করার জন্য।

যাহোক সে অবস্থাতেই মেডিক্যাল টেস্ট দিলাম। তিন দিনের মাথায় ফল বেরোল। দেখা গেল, আমি শীর্ষেই আছি ফিজিক্যাল ফিটনেসের দিক থেকে। চলে এলাম। চলে আসার সময় আরেক বিপদ। পয়সা নেই। আমার বড় ভগ্নিপতি জনাব আবদুর রব বেশ ধনী। তিনি পেশায় ছিলেন কন্ট্রাকটর। খুলনা শহরে তখন তাঁর বড় ঠিকাদারী ব্যবসা চলছে। আমি যখন দেখলাম কোনক্রমে খুলনা যাওয়ার ট্রেন ভাড়াটা আছে পকেটে তখন কেটে পড়লাম। খুলনা গিয়ে টাকা না আনলে হোটেল ভাড়াটাড়া দিয়ে বাড়ি ফেরা দুষ্কর। খুলনা পৌঁছে, সৌভাগ্যই বলতে হবে, ভগ্নিপতিকে পেয়ে গেলাম। তিনি তখন খুলনার সেরা হোটেলেই থাকেন–শাহীন হোটেল। কিন্তু তখন আবার আমাকে লজ্জায় পেয়ে বসল। সরাসরি টাকার কথা বলতে পারলাম না তাকে। বললাম, 'আমি মেডিক্যাল টেস্টে অ্যালাউ হয়ে গেছি।' তিনি বেশ খুশি হলেন। তিনিও জানতেন, শ্বশুরের পরিবারের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। শ্বশুরের চোখ খারাপ। এখন কামাই নেই বললেই হয়। তাই আমাকে দেখে নিজেই বুঝে ফেললেন আমার অবস্থাটা। জিজ্ঞেস করলেন, 'টাকা পয়সা আছে?'

আমি বললাম 'না, আমার কাছে পয়সা নেই।' তখন তিনি আমাকে একশ টাকা দিলেন। একশ টাকা তখন বিরাট ব্যাপার। ধনী হয়ে গেলাম একেবারে। ঐদিনই যশোরে ফিরে এলাম। হিসেব করে পাওনা টাওনা মিটিয়ে আবার চলে এলাম পিরোজপুরে।

পিরোজপুরে ফিরে যাওয়ার পথে আবার মন পরিবর্তন হয়ে গেলো। যদি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেই তাহলেতো মুক্তিযুদ্ধে আমরা কিছু করতে পারবোনা। কতো প্ল্যান, কতো কল্পনা! পাঞ্জাবীদের তাড়ানোর জন্য সেনাবাহিনী গড়ে তুলবো বাঙালীদের নিয়ে, তিতুমীর, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন হবো আমরা–এতোসব বড় বড় কল্পনা সব মাঠে মারা যাবে! এসব ভাবতে ভাবতেই পিরোজপুর ফিরলাম এবং এরইমধ্যে আবার মন বদলে গেল।

আমার যে মন বদলে গেছে, মেডিকেল টেস্টে পাশ করার পরও আমি যে চূড়ান্ত পরীক্ষা আই এস এসবিতে অংশ নেয়ার ব্যাপারে কোনরকম প্রস্তুতি নিচ্ছিনা এসব দেখে মা পুরো ব্যাপারটাই বুঝে ফেললেন। তিনি এটাও বুঝলেন যে নিজে বুঝিয়ে আমার মন ফেরাতে পারবেন না। দেরী না করে খবর পাঠালেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আমার বড় ভাই সালাউদ্দিন আহমেদকে। বড় ভাই বাড়িতে এসে আমাকে খুব বোঝালেন টোঝালেন। পরিবারের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছু বললেন। বললেন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তো সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার কোন বিরোধ নেই। দেশ স্বাধীন হলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হবে। তখন তো আর পাকিস্তানের চাকরি করতে হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। যা হোক, বড় ভাইয়ের বোঝানোতে কাজ হলো। আমি মোটামুটি প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম মানসিকভাবে।

আমার বড় ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার বাড়ীতে থেকে। মানিক মিয়া আবার পড়াশোনা করেছেন আমাদের বাড়ীতে থেকেই। বাবার যখন চোখ খারাপ হয়ে গেল মানিক মিয়া তখন নানাভাবে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। বাবার সার্বিক চিকিৎসার খরচ, ইত্যাদি যা যা দরকার সেসব তিনি করেছেন। ৬৯–এর শেষের দিকে মানিক মিয়াতো মারাই গেলেন দুঃখজনকভাবে।

যা হোক, মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। শেষ পর্যন্ত আমি রাজী হলাম আই এস এসবি দিতে। কিছু পড়াশোনাও করলাম। তারপর চলে এলাম ঢাকায়। ঢাকায় থাকতাম আমাদেরই গ্রামের প্রতিবেশী সামাদ নামের এক লোকের ওখানে। মানিক ভাইয়ের ওখানে যেতে একটু লজ্জা

লজ্জা লাগতো। বড় ভাই সেখানে থাকেন। আমিও গিয়ে উঠবো। ব্যাপারটা কেমন হয়। এজন্যেই আমি সামাদের ওখানে গিয়ে থাকতাম। আমার জন্য খুব করতো ওরা। গোসল করানো, খাওয়ানো–সব ব্যাপারেই ওদের প্রচণ্ড আন্তরিকতা রয়েছে। আরেকজন ছিলেন সাত্তার নামে। সম্পর্কে আমাদের ভাগ্নে হন। সেই ভদ্রলোক আবার আমার মা'কে ধর্ম নানী বানিয়েছিল। আমার এই ভাগ্নে আইএসএসবিতে যাওয়ার সময় প্রচুর সহযোগিতা করেছে। আমি তো ঢাকার তখন কিছুই চিনি না। কোন্ বাস ক্যান্টনমেন্টে যায় তাও আমি জানিনা। কি করে সময় মতো গিয়ে পৌঁছাবো সেটাও একটা ঝামেলা। যেতে হবে রেলওয়ে ষ্টেশন। সেখান থেকে আইএসএসবির ট্রাক এসে আমাদের নিয়ে যাবে। আইএসএসবির ট্রান্সপোর্ট কোনটা, কাকে জিজ্ঞেস করবো, উর্দুতো জানিনা। সাত্তার সাহেব সে সময় প্রচুর সাহায্য করেছেন। তখন ফার্মগেটে ছিল বাসষ্ট্যান্ড। এখন যেখানে ওভারব্রীজটা সেটার কাছাকাছিই ছিল ষ্ট্যান্ডটা। ওখানে একটা রেষ্টুরেন্ট ছিল। সেই রেষ্টুরেন্টে আবদুস সাত্তার আমাকে খুব করে বিরিয়ানী টিরিয়ানী খাওয়ালেন। মামা যাচ্ছে পরীক্ষা দিতে, একটা ভাব আর কি। আন্তরিকতা উৎসাহ সবই যেন আমার চেয়ে তার বহু গুণে বেশী। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে ষ্টেশনে। ওখানে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। আমি তো কিছুই বুঝি না। তিনিতো ঢাকায় থাকেন। কিছু পাঞ্জাবী–টাঞ্জাবী দেখছেন। বোলতা হ্যায়–খাতা হ্যায়, চালতা হ্যায়–এরকম ভাব আছে। রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়ে যখন দেখলেন একটা ট্রাক দাঁড়ানো তো সেখানে গিয়ে বাতচিৎ আরম্ভ করে দিলেন, 'হামারা মামু আয়া। ও অপিসার বনেগা, হ্যায়সে বনেগা, ত্যায়সে বনেগা'–এই রকম ব্যাপার। তখন সেই ট্রাকের ড্রাইভার বললো, 'হামতো আয়া। উন সাবকো লিয়ে যে সাবমে আইএসএসবি যা রাহা হো।' সাত্তার মামা আমাকে ট্রাকে উঠিয়ে দিলেন। ঘটনাটি উল্লেখ করলাম এই সাত্তার–সামাদ এদের আন্তরিকতার প্রকৃতিটা বোঝানোর জন্য। এরা পারিবারিকভাবে আমাদের সমকক্ষ নয়। আমাদেরকে সব সময় সম্মান করে চলতো। তবু এদের আদর, আপ্যায়ন, আন্তরিকতা দৃষ্টান্ত হওয়ার যোগ্য। সামাদরা সে সময় টিএন্ডটি কলোনীতে থাকতেন। আর সাত্তার থাকতেন মগবাজারে। ছোটখাটো ব্যবসা করতেন। তিনি প্রতিদিন মগবাজার থেকে টিএন্ডটিতে গিয়ে আমার খোঁজ খবর করতেন। ঢাকার কোথায় কি পাওয়া যায়, কোথায় একটু ভাল খাবার পাওয়া যায়, আমাকে কোথায় খাওয়াবে এসব ছিল তার ধ্যান জ্ঞান। এদের অবদানের কথা স্বীকার করতেই হবে।

ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছেতো হয়রান। সারাদেশ থেকে মোট আড়াইশ ছেলে এসেছে পরীক্ষা দিতে। ঢাকা কলেজ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, নটরডেম কলেজ, চিটাগাং ইউনিভার্সিটি, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, এমনকি লাহোর ইউনিভার্সিটির ছেলেরাও এসেছে আই এস এসবি দিতে। এদের মধ্যে পিরোজপুরের সেই গ্রামীণ শহরের খালি পায়ে স্কুলে যাওয়া ছেলে জিয়াউদ্দিন একেবারেই বেমানান। ব্যাপার স্যাপার দেখে আমি তো একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি। ওরা যখন ইংরেজী বলে আমার বুঝতেও কষ্ট হয়। আমাদেরতো কলেজে স্যাররা ইংরেজীকে বাংলা করে না বোঝালে আমরা বুঝতাম না। আর ওরা পড়াশোনা করেছে ইংলিশ মিডিয়ামে। ভ্যাবাচ্যাকা না খাওয়াটাইতো অস্বাভাবিক। ভাবলাম পরীক্ষা দিতে আসাই বৃথা হয়েছে। এদিকে পিরোজপুরে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ লোকজন এবং পরিচিতরা তো ভেবে বসে আছে, জিয়াউদ্দিন আর্মি অফিসার হয়েই গেছে। অথচ বৈতরণী পার হওয়ার প্রথম পরীক্ষা সবে শুরু। বারবার মনে হচ্ছিল যদি প্রথম ধাপেই আটকে যাই? যদি এখান থেকেই নাকানি চুবানি খেয়ে ফিরে যেতে হয় তাহলে তো মানসম্মান নিয়েই

এতোসব ভাবনার মধ্য দিয়েই টেস্ট শুরু হয়ে গেল। প্রথম দিনের শেষে টিকলো মাত্র ৩৪/৩৫ জন। এদের মধ্যে আমিও টিকে গেলাম। এরপরে আই এস এসবির স্পেশালাইজড টেস্টগুলো শুরু হয়ে গেলো। একটা টেস্ট হলো গ্রুপ ডিসকাশন। গ্রুপ ডিসকাশনের নিয়ম হলো একটা জায়গায় গোল করে সবাইকে বসানো হবে। কর্নেল সাহেব পেছনে দাঁড়িয়ে একটা বিষয় বলে দেবেন। সেই বিষয়ের ওপর আলোচনা করতে হবে। কথা বলার সুযোগ খুঁজে নেয়া এবং ইচ্ছা শক্তি, মনোবল প্রয়োগ করার ক্ষমতা কার কতটুকু সেটা জানাই হচ্ছে এই টেস্টের লক্ষ্য। যাহোক, কর্নেল সাহেব বিষয় নির্ধারণ করলেন, কাশ্মীর ইস্যু। তিনি পুরো ইংরেজীতে বললেন, 'তোমরা জানো, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বড় সমস্যা হচ্ছে কাশ্মীর। এখন বলো, কিভাবে এই দ্বিপাক্ষিক সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।' চিটাগাং ইউনিভার্সিটির এক ছেলে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের যুগ। আজকে বিশ্ব শান্তি এবং সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছে। আজকে বিশ্ব হানাহানির পর্যায় অতিক্রম করে এসেছে। কাজেই কাশ্মীর ইস্যুকে যুদ্ধের মাধ্যমে সমাধানের চিন্তা মাথায় না রেখে এটাকে আমরা একটা আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমাধান করতে পারি। সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক রেখে ব্যাপারটার মীমাংসায় পৌঁছানো উচিত।' ওর বলা শেষ হলো। আমি তো চুপ। বলার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছিনা। ইতিমধ্যে ঢাকা কলেজ কি নটরডেম কলেজের এক ছেলে দাঁড়িয়ে গেছে কিছু বলার জন্য। সে বললো, 'চিটাগাং ইউনিভার্সিটির ছেলেটি যা বলেছে তার সঙ্গে আমি পুরো একমত। এবং সে যা বলেছে তাই সত্য।' এমনভাবে বললো যেন সেটাই মহাসত্য। ওই যে 'আগের বক্তা যা বলে গেছে সেটাই আমার বক্তব্য' – এই ধরনের কথাবার্তা আর কি। আমি দেখলাম যে আমার সুযোগ যায়। আমার সেখানে একটা 'ব্রাকেটে পদাঘাত' করার মতো অবস্থা ফিরে এসেছে। যেই মাত্র দ্বিতীয় ছেলেটি বসে পড়লো আমি ঝট করে দাঁড়িয়ে, ব্যস, শুরু করলাম। ইংরেজী তো জানিনা। তবুও ভাঙা ইংরেজী, ভুল ইংরেজী মিলিয়ে বললাম 'এইসব গণতন্ত্র টনতন্ত্র, এইসব শান্তিটান্তি সবসময় কাজ করেনা। আমরা মুসলিম। এই ভারতবর্ষ বিজয় থেকে শুরু করে আমাদের ইতিহাস হচ্ছে শৌর্য বীর্যের। আমরা যুদ্ধ করে কাশ্মীর দখল করে নেবো।' এরপর দেখা গেল উপস্থিত সবাই আবার আমার পক্ষে চলে এসেছে। আমি সর্বোচ্চ নম্বর পেলাম। পাকিস্তানী অফিসাররা আমার উপর খুবখুশি।

এরপর লীডারশীপ টেস্ট অর্থাৎ নেতৃত্বের গুণাবলী পরীক্ষা। লীডারশীপ টেস্ট হচ্ছে অনেকগুলো বাধা অতিক্রম করা, একটা গ্রুপসহ। গ্রুপে প্রাথমিকভাবে কেউই নেতা নয়। পাঁচজন কি সাতজনের একটা গ্রুপ। গ্রুপগুলোকে বলা হলো, ধরে নাও তোমরা ঢাকা থেকে যাত্রা করে ময়মনসিংহ যাচ্ছো। ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে ঢাকা ময়মনসিংহের রোডটা দেখানো হলো। রাস্তার মাঝখানে বিপদ। এখানে শত্রু আছে, এখানে নদী আছে, এখানে তোমরা যেতে পারবে না। পা ফেললেই ডিসকোয়ালীফাইড হবে–এইভাবে বিভিন্ন রকম বাধাসম্পন্ন একটা রাস্তায় একেকটা গ্রুপকে পাঠানো হলো। পাঁচ সাতজন এক সাথে যাচ্ছে। এরমধ্য থেকে তারা বের করে নেবে নেতাটা কে? আমার গ্রুপ রওনা দিলো। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, আমিসহ আর দুই তিন জন নেতৃত্বে চলে এসেছি। একটা জায়গায় গিয়ে চরম বিপদের সম্মুখীন হতে হলো। নদী পেরোনোর জন্য আমাদের যে ব্রীজ দেয়া হয়েছে সেই ব্রীজটা সম্পূর্ণ নয়। অন্য প্রান্ত স্পর্শ করছে না। যে দড়ি দেয়া হয়েছে সেই দড়িটারও একই অবস্থা। এরকম একটা কঠিন প্রতিবন্ধকতা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এটা পেরিয়ে যেতে হবে। পেছন থেকে শত্রু ধাওয়া করছে আমাদের। সময় মতো পেরোতে না পারলে শত্রুরা আমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। গ্রুপের সবাই তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমি তখন সবাইকে

আমি তখন সবাইকে ডেকে বললাম 'পাজলড হলে তো চলবে না। একটা কিছু করতে হবে। তুমি এদিকে যাও। এটা করো। তুমি ওদিকে যাও, ওটা করো।' এইভাবে আমি উপস্থিত সমস্যার একটা সমাধান করার ব্যাপারে উদ্যোগী হলাম। একজন মেজর ছিলেন আমাদের পরীক্ষক হিসেবে। তিনি আমাদের থামিয়ে দিলেন। থামিয়ে দিয়ে ইংরেজীতে বললেন 'জিয়াউদ্দিন একটা সমাধান দিয়েছে। এটা অবশ্যই বলবো যে, সমাধানটা খুব বেশি ভাল সমাধান নয়। তোমরা এর মাধ্যমে সফল হতেও পারো আবার নাও পারো। কিন্তু ব্যাপারটা খেয়াল করো। সে একটা সমাধান দিয়েছে।'

আমি তখন নেতা হয়ে গেলাম আর কি। ওরা চাচ্ছে সঠিক ব্যক্তিটিকে চিহ্নিত করতে। বিপদের মুহূর্তে সমস্যার সম্মুখীন হলে, কে সেটার সমাধানে এগিয়ে আসে সেটা দেখাই ওদের উদ্দেশ্য। কে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে, কে অন্যদের চালিত করার ক্ষমতা রাখে সেটা প্রমাণ হয় এই টেস্টের মাধ্যমে। যাহোক এই টেস্টে ভালভাবেই পার হয়ে গেলাম। এর পরবর্তী অন্য পরীক্ষাগুলোতেও ভালই করলাম। পরীক্ষা শেষে দেখা গেল প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত সেই ৩৪ জনের মধ্যে মাত্র চারজন চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছে। এবং চারজনের মধ্যে আমার নামটা সবার ওপরে। অবশ্য প্রথম, দ্বিতীয়ের কোন ব্যাপার ছিলো না। চারটি নাম ওপরে নীচে করে সাঁটা। আমার নামটা সর্বপ্রথমে এবং জানা গেল, কর্নেল সাহেব আমাকে ডেকেছেন। অন্য তিনজনকে অবশ্য তিনি ডাকেননি। যাহোক, গেলাম। কর্নেল সাহেব ইংরেজী–উর্দু মিলিয়ে বললেন, 'তোমার মধ্যে আমরা যথেষ্ঠ ভাল ভাল দিক পেয়েছি। কিন্তু তোমার ইংরেজী খুব দুর্বল। তোমাকে ইংরেজী শিখতে হবে ভালমতো। তুমি এখন বাড়ী ফিরে যাও। মাঝখানে বেশি সময় পাবে না। হয়তো এক কি দু'সপ্তাহের মধ্যে নোটিশ পেয়ে যাবে। তুমি এখন থেকে নিয়মিত ইংরেজী পত্রিকা পড়া শুরু করো।'

ওখান থেকে ফিরে এলাম মানিক ভাইয়ের বাসায়। মানিক ভাই তখন ৯০ নাম্বার কাকরাইলের বাসিন্দা। আমার বড় ভাই সে বাসাতেই থাকেন। বড় ভাইকে গিয়ে বললাম, 'আমি তো আইএসএসবিতে সিলেক্ট হয়েছি। এবং আমার নাম সবার ওপরে।' বড় ভাই আমার কথা বিশ্বাসই করতে চান না। উনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র। উনি জানেন কারা কারা আইএসএসবিতে এসেছে। আর আমি, পিরোজপুরের জিয়াউদ্দিন একেবারে সবার উপরে নাম নিয়ে সিলেক্ট হয়েছি, এটা বিশ্বাসই হচ্ছে না তার। আমাকে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে জোক করছো, না? যাক, এটা নিয়ে দুঃখ করার কি আছে। পাশ করতে পারো নাই, পরের বার আবার দেবে।' আমি বললাম, 'না, আসলেই আমি সিলেক্ট হয়ে গেছি।' এবার তাঁর বিশ্বাস হলো। তার পরে বাড়ী ফিরে গেলাম।

মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে বাড়ী ছাড়ার। কেমন অদ্ভুত লাগছে ব্যাপারটা ভাবতে। ছোটবেলা থেকে এতোগুলো বছর এই বাড়ীতে, বাবা–মা–ভাই–বোনের সঙ্গে কাটিয়েছি। কখনো খুব বেশি–দিনের জন্যে কোথাও যাইনি। কিন্তু এবারতো যেতে হবে। কেমন জানি একটা বিষণ্ন অনুভূতিতে মনটা বার বার ছেয়ে যাচ্ছে। আমি আবার ছোটবেলা থেকেই মা–বাবার প্রতি খুব দুর্বল। আমি যখন অষ্টম কি নবম শ্রেণীতে পড়ি তখনকার একটি ঘটনা। আমার বড় বোনের স্বামী ছিলেন পুলিশ অফিসার। তিনি ছিলেন যশোরের মনিরামপুর কিম্বা বাঘারপাড়া পুলিশ ষ্টেশনে। ওখানে বেড়াতে গেছি। ফিরে আসার সময় খুলনা পর্যন্ত এসে দেখি ট্রেন, বাস সব স্ট্রাইক। পিরোজপুরে ফেরার কোন উপায় নেই। অথচ আমাদের বাড়ী তখনো ৩৪ মাইল দূরে। এই পথটুকু পেরোনোর কোনরকম যানবাহন নেই। তখন সকাল দশটা এগারোটার মতো বাজে। আমি মনস্থির করে ফেললাম, বাড়ীতে ফিরে যাবোই। মনে হচ্ছিল যেন মাকে দেখতে না পেলে আমার হবেই না। হাঁটা শুরু করলাম ট্রেনের লাইন ধরে। হেঁটে হেঁটে, বাগেরহাট এসে পৌঁছালাম। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে ততোক্ষণে। ওখান থেকেও পিরোজপুর যাওয়ার কোন যান নেই। আরো তেরো মাইল। কুছ পরোয়া নেই। হেঁটেই চলে গেলাম পিরোজপুর। বাড়ীতে যেতে হলে বলেশ্বর নদী পেরোতে হয়– নদীর ঘাটে যখন পৌঁছলাম তখন রাত এগারোটার মতো বাজে। সেই পাকিস্তান আমলে জনজীবনে এমন কোন প্রাণচাঞ্চল্য বা গতি ছিল না যে রাত এগারোটাতেও মফস্বল শহরের নদীঘাটে কিছু পাওয়া যাবে। মোটামুটি নিস্তরংগই ছিল সেই আমলের জীবন। খেয়া নৌকাও নেই। ভাবলাম সাঁতার কেটেই বলেশ্বর নদী পেরিয়ে চলে যাবো বাড়ী। বাড়ী যেতেই হবে। এর মধ্যে নদীপাড়ের এক দোকানদার বললো, 'ভাই পাশে একটা খাল আছে। সেই খালে মাঝে মধ্যে ভাড়ার নৌকা থাকে। আপনি অপেক্ষা করেন। দেখি আমি পাই নাকি কাউকে।'

ভাগ্য ভাল, সে দশ পনের মিনিটের মধ্যে একটা ভাড়ার নৌকা যোগাড় করতে পারল। আমাদের দেশে এ ধরনের নৌকাকে টাপুরে নৌকা বলে। যাহোক শেষে নদী পেরিয়ে মায়ের কাছে পৌঁছলাম। মা–বাবার প্রতি টানটা ছিল এই রকম। এখন তাদের ছাড়তে হবে এই ভাবনা আমাকে যেমন কাবু করে ফেলেছে, একই রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে পুরো পরিবারের মধ্যেই। সর্বত্রই কেমন যেন একটা বিয়োগ বেদনার ভাব। আবার অন্যদিকে, বিপরীতভাবে খুশিও। কারণ বাড়ীর ছেলে বড় একটা সুযোগ পেয়েছে। সেনাবাহিনীর অফিসার হবে–এইসব।

পাঁচ সাত দিনের মাথায় টেলিগ্রাম পেয়ে গেলাম। 'ওমুক তারিখের মধ্যে যোগ দাও।' ঢাকায় চলে এলাম। ঢাকায় এক রাত ছিলাম। পরের রাতেই চলে গেলাম লাহোর। লাহোর থেকে পিন্ডি। পিন্ডি থেকে বাসযোগে যেতে হলো কাঁকুল। কাঁকুল ভিলেজ থেকে পাকিস্তান

মিলিটারী একাডেমী। পৌঁছানোর পরপরই শুরু হলো নিয়মমাফিক অত্যাচার। এই অত্যাচারটা আসলে আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। যারা এসেছে তারা সবাই বলতে গেলে জীবনে প্রথমবারের মতো বাড়িঘর ছেড়ে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই তারা হোমসিক হবে। বাড়ির জন্যে মন কেমন করবে। মায়ের চিন্তা করবে, বাবার চিন্তা করবে। প্রিয়জনদের স্মৃতিতে মনটা আন্দোলিত হবে। এই ব্যাপারগুলো সামরিক বাহিনীতে একেবারেই কাম্য নয়। এ কারণেই পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে নানারকম শাস্তির ব্যবস্থা করে মনটাকে ব্যতিব্যস্ত রাখা হয়। এক মাস, দু'মাসের সিনিয়র ক্যাডেটদের দায়িত্ব দেয়া হয় এ ব্যাপারে।

আমার চুলটা সে সময় একটু বড় ছিল। যাওয়ার আগে কমিয়েছিলাম। তবে খুব একটা কমাইনি। আর্মি ছাটটা দেইনি আর কি। ব্যস, আর যায় কোথা? এক সিনিয়র এসে শুরু করলো একেবারে চোস্ত ইংরেজীতে, 'ইউ, হিরো টাইপ, ইউ কাম টু দা মিলিটারী একাডেমী অব পাকিস্তান? ডোন্ট ইউ নো, ব্লাডি ফুল। নাউ, ক্রল ইনসাইড দা ড্রেন।' অনেক কষ্ট করে ভাল কোট, কাপড়-চোপড়, টাই লাগিয়ে বাবুর সাজে সজ্জিত আমি। আর সেই আমাকেই নামিয়ে দিলো কিনা ড্রেনের মধ্যে। অবশ্য সেই ড্রেনগুলো ঢাকা শহরের চিরপরিচিত ড্রেন নয়, পাহাড়ী এলাকার ড্রেনতো, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ধৌত হয়ে যায়। পানি বা নোংরা কিছু জমে থাকে না। যাই হোক শাস্তির একটা মাত্র উদাহরণ দিলাম। এরকম শাস্তি এমনকি এরচেয়েও ভয়াবহ শাস্তি পেতে হচ্ছে সবাইকে। নবাগত ক্যাডেটদের অবস্থাতো প্রায় পাগল হওয়ার মতো। প্রথমদিকে দিন রাতের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৪ থেকে ১৮ ঘন্টা শাস্তি উপভোগ করতে হতো। রাস্তায় হাঁটা যায় না সিনিয়রদের যন্ত্রণায়। এক সিনিয়রের সঙ্গে দেখা হলো, ব্যস, এবার শাস্তি ভোগ করো। কেউ হয়তো লাঞ্চ করে ফিরেছে। একটু বিশ্রাম যে করবে তার উপায় নেই। দশ মিনিটের মধ্যে ড্রিল ক্লাশ শুরু হয়ে গেলো। ওখানে এমন কোন নিয়ম নেই যে খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হবে। যাতে স্বাস্থ্য ভাল হয়-এসব কিছু নেই। লাঞ্চের পর হয়তো দেড় মাইল দূরে একটা ক্লাশ, ঐ দেড় মাইল তখন মার্চ করে যেতে হবে। না গিয়ে কোন উপায় নেই। এছাড়াও আরো কতরকম যন্ত্রণা। হয়তো লাঞ্চ করে বেরোলাম। এক সিনিয়র ধরলো, 'তুমি চাপাতি কয়টা খেয়েছো?' বললাম, 'স্যার, তিনটা চাপাতি খেয়েছি।' সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য, 'বোকার হদ্দ, মাত্র তিনটা চাপাতি খেয়ে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে কিভাবে?' সব কথার পেছনেই সিনিয়ররা যোগ করে দিতেন, তাহলে কিভাবে ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়বে? যেন ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটাই হচ্ছে জীবনের পরম মোক্ষ।

আমি যখন মিলিটারী একাডেমীতে যাই তখন আমার ওজন ছিল ১১০ পাউন্ড। মনে মনে ভাবনা ছিল, এই স্বল্প ওজনের কারণেই বোধহয় আর্মি থেকে শেষ মুহূর্তেও বাদ পড়ে যেতে পারি। কারণ আইন মাফিক আদর্শ ওজন ছিল ১২০ পাউন্ড। দেড় কি দুমাস পরে আমার ওজন দাঁড়ালো ১৬০ পাউন্ড। এটা পাকিস্তান সামরিক একাডেমীরই একটা রেকর্ড। যাহোক আমার পেটেতো তখন রাজ্যের ক্ষুধা। ২৪/২৫ টা তন্দুর রুটি আর দুই তিন বোউল দুম্বার মাংস ছাড়া ক্ষুধাই মেটে না। একদিন এক পাঞ্জাবী অফিসার রাতের বেলা ডাইনিং টেবিলে আমার সামনে বসে আমার খাওয়া দেখছে। সেও ক্যাডেট। আমার দুই কি তিন মাসের সিনিয়র। আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি যে সে আমার খাওয়াটা লক্ষ্য করছে। এক মনে খেয়েই যাচ্ছি। ২৪ টা কি ২৬টা তন্দুর রুটি খেয়ে ফেললাম। সঙ্গে তিন বোউল দুম্বার মাংস। খাওয়া শেষে সে আমাকে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি পুর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছো?' বললাম, 'হ্যাঁ, স্যার।'

পরের প্রশ্ন, 'তুমি কি জানো তুমি কয়টা রুটি খেয়েছে?' আমি বললাম, 'না স্যার আমার মনে নেই।' সে বলল, 'আমি শুনেছি। তুমি ২৪ কি ২৫টা রুটি খেয়েছো। এবং মাংস খেয়েছো তিন বোউল। তুমি যদি এতো খাও তাহলে ইন্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না।' আমি কিন্তু তখনও খাচ্ছি। ঐ ক্যাডেট উঠে চলে গেল। চলে গিয়ে সে আমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল ডাইনিং হলের বাইরে। উদ্দেশ্য, আমি বেরোনো মাত্র আমাকে শাস্তি দেয়া। এবং শাস্তি দেয়ার রেওয়াজও আছে। কিছু বলা যাবে না। অফিসিয়ালীই সিনিয়রদের এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমি তো ভরপেট খেয়ে বেরোলাম। রাত তখন সাড়ে আটটার মতো বাজে। বেরোনো মাত্র ধরলো। 'হ্যাঁ, এই যে, আমি তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি। এখন শুরু করো বুকে হাঁটা।' আদেশ না মেনে উপায় নেই। কিছুক্ষণ বুকে হাঁটার পর বলল, 'এবার দেখি তুমি কেমন ডিগবাজী খেতে পারো।' শুরু হলো ডিগবাজী খাওয়া। কিছুক্ষণ পর সেই পাঞ্জাবী ক্যাডেট স্বীকার করল, 'ইয়েস, ইয়েস, ইউ আর এ টাফ গাই। (হ্যাঁ, হ্যা, বুঝলাম তুমি একজন শক্ত পাল্লার পুরুষ) যাও এবার।' এইভাবে এগোলো প্রশিক্ষণ কর্মসূচী। শেষে দেখা গেল বেশ ভাল রেজাল্ট করলাম। আমাদের ব্যাচে ছিল ১৯০ জন ক্যাডেট। এদের মধ্যে ৬০ জনেরও বেশি ছিল বিভিন্ন ক্যাডেট কলেজ ও মিলিটারী কলেজের এবং বাকীরা বিভিন্ন ভাল ভাল কলেজ, ইউনিভার্সিটির ছাত্র। এই ১৯০ জনের মধ্যে প্রথম ২০ জন বিবেচিত হবে খুবই ভাল মানের প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে। এবং এই প্রথম ২০ জনের মধ্যে আমিও আছি। পিরোজপুরের মফস্বল শহর থেকে আসা একটি ছেলের জন্যে ব্যাপারটাতো আশাতীত। আমার প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন মেজর ইফতেখার আলী খান বালুচ। জিয়াউর রহমান সাহেবও তখন মিলিটারী একাডেমীতে অল্পদিন ছিলেন। তারপর অন্য জায়গায় পোস্টিং হয়ে যায়। খুব সম্ভব খালেদ মোশাররফ সাহেবও তখন মিলিটারী একাডেমীতেই। আমাদের ইন্সট্রাক্টরদের মধ্যে একজন বাঙালী মেজরও রয়েছেন। এখনও আছেন তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে–জেনারেল মুক্তাদির।

যখন পাসিং আউট হবে তার দু'একরাত আগে আমাদের প্লাটুন কমান্ডার মেজর ইফতেখার আলী খান বালুচ তার বাসায় আমাদের সৌজন্যে একটা পার্টি দিলেন। পার্টিতে দেখালেন ১৯০ জনের মধ্যে আমার রেজাল্ট সবচেয়ে ভাল। আমি কিন্তু ফার্স্ট হইনি। তারপরেও আমার রেজাল্ট সবচেয়ে ভাল হলো কিভাবে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। আমি যখন প্রশিক্ষণ শুরু করি তখন আমার স্ট্যান্ডার্ড ছিলো গড়ে ৪০–এর মতো। আর প্রশিক্ষণশেষে আমার স্ট্যান্ডার্ড দাঁড়িয়েছে ৮০তে। সুতরাং আমার উন্নতির শতকরা হিসাব একশ ভাগ। অন্য যারা আমার চেয়ে ভাল নাম্বার পেয়েছে তারা হয়তো শুরু করেছে ৭০ কিম্বা ৭৫ থেকে, পৌঁছেছে ৮৫ কিম্বা ৮২তে। সুতরাং তাদের উন্নতির শতকরা হিসাব আমার ধারে–কাছেও নয়। এই হিসাবে আমার ফলাফলটা ছিলো আশ্চর্যজনক এবং সবচাইতে ভাল। ইংরেজীতে এটাকেই বলে গ্রেডিয়েন্ট রেজাল্ট। যা হোক আমাদের ব্যাচে প্রথম স্থান অধিকার করেছে একজন বাঙালী ছেলে। আরো দুজন বাঙালী ছেলেও প্রথম দিকের স্থান অধিকার করেছে। একজন ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের ছাত্র, অন্যজন একটা মিলিটারী কলেজের। এদের পরেই বাঙালী অফিসার হিসেবে আমি। এইভাবে শেষ হলো মিলিটারী একাডেমীর পর্ব। মিলিটারী একাডেমীতে বসেই আমরা দশ–বারোজন বাঙালী ছেলে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা নিলাম।

১৯৪৭ সালের পর থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত প্রায় ২৪ বছর পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের উপর শাসন শোষণ অত্যাচারের যে স্টীমরোলার চালিয়েছে তা ছাত্র জীবনেই কিছুটা উপলব্ধিতে এসেছিল। পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতে যাওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যকার ব্যবধানটা খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছি। শোষণের চিত্রটা তখন খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে আমাদের সামনে। বাঙালী বিদ্বেষ, বাঙালীদের প্রতি ঘৃণা, বাঙালীকে নীচু জাতি হিসেবে মনে করা–পশ্চিম পাকিস্তানীদের এরকম মানসিকতা আমাদের কাছে খুবই খারাপ লাগতো। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর যে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে তার পাঁচ ভাগও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে করা হয়নি। পাকিস্তানের হাজার হাজার মাইল রাস্তা পাকা করার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। অথচ সে আমলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা থেকে অদূরবর্তী মানিকগঞ্জে যাওয়াও ছিল খুব দুরূহ ব্যাপার। সেই মুড়ির টিনের বাস আর সেই ইঁটের খোয়া বিছানো ভাঙা রাস্তা, তাও সিঙ্গেল ট্র্যাক। একটা বাস আরেকটা বাসকে সাইড দিতে গেলে কাঁচা মাটিতে নেমে পড়তে হতো। আর সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত প্রদেশগুলো বিশাল হাইওয়ে দ্বারা যুক্ত একটা আরেকটার সঙ্গে। রাস্তাঘাটের এই উন্নয়নের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় অর্থনীতির একটি সুদৃঢ় ভিত্তি তখনই তৈরী হয়ে গেছে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে কিছুই করেনি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী। করার ইচ্ছাও তাদের ছিলো না। ক্রমাগত প্রবঞ্চিত হতে হতে বাঙালী মানস স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক শোষক এবং শোষিতের। রাষ্ট্রীয় উপরিকাঠামোর বিভিন্ন ব্যাপারে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক। '৫২ এর ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানীরা কখনোই সুনজরে দেখেনি। বাঙালীরা বাংলা বলছে এটাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছে গাত্রদাহের ব্যাপার। তারা অনেক সময় সরাসরি ঘৃণাও প্রকাশ করতো বাঙালীদের বাংলা বলতে দেখলে। বাঙাল বলে গাল দিতো। পাকিস্তানের মূল ভূখন্ডে গিয়ে ব্যাপারগুলো সামনাসামনি দেখে একেবারে সরাসরি বুঝতে পারতাম কী প্রবল বৈষম্য বিরাজমান দুই পাকিস্তানের মধ্যে। আগেতো সব শুনতাম। শোনা আর সামনাসামনি দেখার মধ্যে অনেক পার্থক্য। শুধু যে সামরিক বাহিনীর অফিসার বা সরকারী কর্মকর্তারাই বাঙালীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন, তা নয়। সাধারণ পাঞ্জাবীরাও বাঙালীদের নীচু জাত বলে মনে করতো। বাঙালীদের প্রতি তাদের ছিলো নাক–উঁচু একটা ভাব। এছাড়াও একটা ঘটনা আছে বিশেষ করে আমার ব্যাপারে। মিলিটারী একাডেমীতে একজন বাঙালী সিনিয়র ক্যাডেট ছিলেন পিরোজপুরেরই। আমরা একই স্কুলে পড়াশোনা করতাম। স্কুলে তিনি আমার দু'বছরের সিনিয়র ছিলেন। তিনি যখন আমাকে দেখলেন নতুন ব্যাচের ক্যাডেট হিসেবে তখন প্রথম দিনই সবার কাছ থেকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে

বললেন, 'দেখো, পাকিস্তানীরা যেনো কোনভাবেই বুঝতে না পারে তুমি তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার ভাই।' তখন অবশ্য পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, পাকিস্তানীরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া–এ ধরনের বাঙালী ব্যক্তিত্বদের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ এবং তাদের রক্তলোলুপ দৃষ্টি এঁদের ওপর রয়েছে। মানিক মিয়া তো করাচীতে রহস্যজনকভাবে মারা গেছেন আগেই। তবু আমি তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার ভাই এটা পাকিস্তানীরা জানলে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে বলে ধারণা করেছিলেন সেই সিনিয়র ক্যাডেট। এবং ধারণাটি খুব একটা অযৌক্তিক ছিল বলেও আমার মনে হয় না। অবশ্য মিলিটারী একাডেমীতে আমাকে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়নি যে আমি মানিক মিয়ার ভাই কিনা। তবুও সেই সিনিয়র ক্যাডেটের সুপরামর্শটি মনে বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ভেবেছি গত ২৪ টা বছর এই পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে কি করে আছি আমরা।

ইসলামের দোহাই দিয়ে শাসকশ্রেণী যা ইচ্ছা তাই করে যাবে আর আমরা মুখ বুজে থাকবো, এটা কি করে সম্ভব? ইসলামের দোহাই দিয়ে তারা আপনার আদরের দুলালীকে চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে, পাশবিক উল্লাসে তারা মাতাল হয়ে উঠবে আর আপনি ইসলামের দোহাই দিলেই সব কিছু ভুলে থাকবেন–একটানা ২৪ বছর ধরে এটা কি করে সম্ভব হলো এই প্রশ্নটা পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানের প্রাথমিক দিনগুলোতে আমাকে খুব চিন্তিত করে তুলতো।

পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে দুই পাকিস্তানের তুলনামূলক অবস্থা, তারতম্য প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে মনে হতো সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করাটাই আজ বাঙালীদের জন্যে সবচেয়ে জরুরী। কারণ আমি স্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছি, দেশ স্বাধীন করার জন্য কোন না কোন সময় যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে। এজন্যেই সামরিক একাডেমীর মতো একটা জায়গা, যেখানে বলতে গেলে রাজনৈতিক চিন্তা–ভাবনার প্রবেশ নিষেধ সে রকম একটা কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ঘেরা জায়গায় বসে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছিলাম। পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে আমরা সামরিক মহড়া দিয়েছি প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে। এসব মহড়ার সময় পাকিস্তানের সেই পাহাড়, সেই পর্বতমালা, সীমান্ত প্রদেশের সুবিশাল পর্বতমালা, পাকিস্তানের অন্যতম বৃহৎ নদী মঙ্গলনালা এসব এলাকায় আমরা সামরিক মহড়া দিয়েছি। তবে এসব এলাকার সৌন্দর্য আমাকে তেমন আকৃষ্ট করতে পারেনি। আমি যেন আমার সমস্ত চোখ ভরে এই শ্যামল বাংলাকেই দেখতাম। আমাদের সুন্দরবন, নদীনালা, শ্যামল সবুজ বাংলা এর চেয়ে কখনোই পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার নৈসর্গিক দৃশ্য আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়নি। আমার মন জুড়ে থাকতো এই বাংলাদেশ।

পাকিস্তান সামরিক একাডেমীর প্রায় শেষ অধ্যায়ে আমরা যখন উপনীত তখন বোঝা যাচ্ছে যে, ১৯০ জন ক্যাডেটের মধ্যে কারা প্রথমদিকে থাকবে। ঠিক তেমনি আমিও নিজের ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত যে, ভাল ফলই করবো। যা হোক, এখানে আরেকটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। একজন বাঙালী মেজর ছিলেন আমাদের কোম্পানীর প্লাটুন কমান্ডার। অবশ্য তিনি সরাসরি আমাদের কমান্ডার ছিলেন না। আমাদেরই কোম্পানীর অন্য একটা প্লাটুনের কমান্ডার। একদিন কোন এক পর্বতমালায় আমরা সামরিক মহড়া দিচ্ছি। পর্বতের সুউচ্চ একটা পর্যায়ে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে আমরা বসে আছি, এমন সময় সেই বাঙ্গালী অফিসার আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গেলেন পাহাড় চূড়ার আরেকটা অংশে। তিনি আমাকে বললেন, 'প্রশিক্ষণের সময়তো শেষ। অল্প কয়েকদিন পরেই তোমরা অফিসার

হিসেবে বিভিন্ন রেজিমেন্টে জয়েন করবে। আমি চাই তুমি যেন বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দাও। কারণ বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাঙালী সৈনিকদের গৌরবদীপ্ত একটি রেজিমেন্ট।' বাঙালী সৈনিকদের মধ্যে অফিসার হিসেবে যারা কর্মরত তারা সবাই চাইতেন যেন নতুন চৌকষ অফিসাররা বেঙ্গল রেজিমেন্টেই যোগ দেয়। সিনিয়র সেই বাঙালী অফিসার যখন আমাকে বললেন বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দিতে আমি কিন্তু তখন তার প্রস্তাবে রাজী হলাম না। বললাম, 'না স্যার, আমি পাঞ্জাব রেজিমেন্টে যোগ দেব।' তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কেন?' তিনি খুব হতাশ হয়েছেন আমার উত্তর শুনে। বাঙালী জাতির একজন কুলাঙ্গার সন্তান হিসেবে আমাকে আখ্যায়িত করে ফেললেন তিনি অবলীলায়। ইংরেজীতে বললেন, 'ইউ আর এ ডিসগ্রেসফুল সান অব বেঙ্গল।' আমি বললাম, 'স্যার, পাঞ্জাব রেজিমেন্টে যোগ দিতে চাচ্ছি একটাই কারণে–শত্রুর ভেতরের অবস্থান এবং তার শক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে ভবিষ্যতে আমাদের দেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তির যে সংগ্রাম সেই সংগ্রাম দুর্বল হয়েই থাকবে।'

আমার এই যুক্তি তার মনঃপুত হলো না। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই হিসেবে। একজন বাঙালী সিনিয়র অফিসার হিসেবে। তবু আমি আমার সিদ্ধান্ত পাল্টালাম না। পাঞ্জাব রেজিমেন্টে যোগ দেয়ার ব্যাপারে আমি তখন দৃঢ়চিত্ত। সিনিয়র সেই অফিসার অবশেষে চূড়ান্ত হতাশ হয়ে আমাকে বকাটকা দিয়ে চলে গেলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার এক/দেড় বছর পর ১৯৭৩ সালে যখন বাঙালী অফিসাররা স্বাধীন বাংলার মাটিতে ফিরে এলেন তখন সেই বাঙালী অফিসারের সঙ্গে আমার দেখা হলো আর্মি হেডকোয়ার্টার্স মেসে। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'মুক্তিযুদ্ধে তোমার ভূমিকা সম্পর্কে আমি জেনেছি। সেই পাহাড়ের চূড়ায় বসে পাঞ্জাব রেজিমেন্টে যোগ দেয়ার ব্যাপারে তুমি যে যুক্তি দেখিয়েছিলে সেটা যে তুমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে তা কিন্তু তখন আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তোমার ভূমিকা দেখে আমি এতো আনন্দিত হয়েছি, এত আমার ভাল লেগেছে যা বলার নয়।' তার কথার মধ্যে ভালবাসা স্নেহ এমনকি কৃতজ্ঞতাবোধের ছোঁয়াও যেন পাচ্ছিলাম। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি, এটা ছিল তার মনের দুঃখ। এখন স্বাধীন দেশে ফিরে এসেছেন। তারা যুদ্ধ করেননি বলে যে দেশের স্বাধীনতা চাননি এমনটি ভাবা ভুল। যেসব বাঙালী অফিসার পাকিস্তানে রয়ে গিয়েছিলেন অবস্থার কারণে তাদের মধ্যে শতকরা ৯৮ জনই ছিলেন মনেপ্রাণে দেশের স্বাধীনতার সমর্থক। এবং তারা সেদিন সুযোগ পেলেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার দুই তিন মাস আগে থেকেই পাকিস্তানীরা বাঙালী সৈনিক ও অফিসারদের পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছিল। তাদেরকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছিল। এই কারণেই অনেক বাঙালী অফিসার, অনেক বাঙালী সৈনিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি।

পাকিস্তানের সামরিক একাডেমীর প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে একজন নতুন বাঙালী অফিসার তার বাঙালী কমান্ডারকে যে কথা বলেছিলেন তা বাস্তবে রূপ নিল কয়েক মাস পরেই। যা হোক এই প্রসঙ্গে পরে আসছি, আমাদের ব্যাচে আমরা যত বাঙালী ছিলাম তারা সবাই কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলাম। মেধা তালিকায় প্রথমদিকের দু'জন আমাদেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের সমাপনী মহড়া ছিল পাকিস্তানের বৃহত্তম নদী মঙ্গলনালায়। মঙ্গলনালায় মহড়াকে পাকিস্তানীরা পানি পথের যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করতো। কয়েক হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে বয়ে যাচ্ছে মঙ্গলনালা। পাহাড় বেয়ে বেয়ে আমাদের নামতে হবে এ নালায়। এখানে বলে নেয়া ভালো, পাকিস্তানীরা নদীকেই নালা বলে। আমাদের মহড়া শুরু হলো বন্ধুর পার্বত্য পথে। পাহাড়ে ওঠার চেয়ে নামাই বোধহয় বেশি ঝুঁকিপুর্ণ। আমাদের সঙ্গী এক

পাঞ্জাবী অফিসার ছিটকে পড়ে গেলেন অকস্মাৎ। পড়লেন গিয়ে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ ফিট নীচে, পাহাড়ের আরেকটা স্তরে। তার পা'টা মাঝখান থেকে ভেঙ্গে গিয়েছিল। পরে অবশ্য সুস্থ হয়ে সফল হয়েছিল সে সামগ্রিক প্রশিক্ষণে। যা হোক, পর্বতের দুর্গম পথ বেয়ে আমরা নামছি। সম্ভবতঃ ১০/১১ হাজার ফুট উঁচু সেই পর্বতমালা। আমরা যখন সেটা অতিক্রম করছি তখন বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টির মধ্যেও থামাথামি নেই, চলছি। যে কোন সময় পা পিছলে ত্রিশ চল্লিশ ফিট তো ভালই, কয়েকশ' কয়েক হাজার ফিট নীচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে নামতে নামতে একদিন সকাল এগারোটার দিকে পৌঁছলাম আমরা মঙ্গলনালায়। বেশ খরস্রোতা সেই নদী। আমরা সেখানে মাছের সন্ধান পেলাম। মাছের সন্ধান পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই বাঙালী চিত্ত আনন্দে নেচে উঠল। আমরা কয়েক বাঙালী বন্ধু মিলে নেমে পড়লাম মাছ ধরায়। একটা বড় তোয়ালে দিয়ে পানি ছেকে মাছ ধরলাম। তারপর নিজেরাই রান্না করে খাওয়া। সামরিক মহড়ায় অনেক সময় নিজেরাই রান্না করে খেতে হয়। মাঝে মাঝে রান্না করা খাবার দেয়া হতো। এছাড়া অন্যান্য সময় রান্না করার কোন বিকল্প নেই। প্রয়োজনবোধে রান্না করে খেয়ে বাঁচতে হবে এমন একটা ব্যাপারও সেই প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য। রান্না করার যাবতীয় সরঞ্জাম সে হিসেবে আমাদের কাছে সব সময়ই থাকতো। আমরা তো মাছ পেয়ে মহাখুশী। কয়েকজন বাঙালী সন্তান মিলে সে মাছে কোনভাবে একটু মশলা ছিটিয়ে রেঁধে ফেললাম। তারপর সেই মাছ দিয়ে আমাদের মধ্যাহ্নভোজটা সেরে নিলাম। বাঙালী হৃদয়ের গভীরে মাছ কিভাবে গেথে থাকে তা সেদিন ভালমতোই বুঝতে পেরেছি। মাছ খাওয়াটা আমাদের কয়েকজনের জন্যে বিশেষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে মাছ খাওয়ার সুযোগ সুবিধাটা ছিল কম। পশ্চিম পাকিস্তানীরা সাধারণত মাছ খেত না। নদী কম হলেও কিছু মাছ পাওয়া যেত। ঝিলাম নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। পাঞ্জাবের নদীগুলোতে মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু এসব নদীর মাছ ওরা খায় না। মাছ সম্পর্কে ওদের ধারণা হচ্ছে, মাছ খেলে শরীর খারাপ হয়, রোগটোগ হয় ইত্যাদি। এ সমস্ত কারণে মাছ খাওয়ার তেমন সুযোগ পেতাম না। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে মাঝে মাঝে সুযোগ মিলতো। যা হোক মঙ্গলনালায় মাছ দিয়ে মধ্যাহ্নভোজটা সেরে আমরা সেই নদী অতিক্রম করে ফিরে এলাম। এরকম বেশ কিছু সামরিক মহড়ায় অংশ নিতে হয়েছে আমাদের। এগুলো প্রশিক্ষণেরই অংশ। সামরিক ভাষায় এগুলোকে এক্সারসাইজ বলা হয়। পাকিস্তানের বিভিন্ন দুর্গম পাহাড় পর্বতে এসব মহড়া অনুষ্ঠিত হতো।

পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীর খুব কাছেই মারী অবস্থিত। এই মারী পাকিস্তানের স্বাস্থ্যকর জায়গা হিসেবে পরিচিত। বহুলোক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে সেখানে গিয়ে থাকতো। আমাদের একাডেমী কাকুলের কাছেই এবোটাবাদ। এবোটাবাদ থেকে মাঝে মাঝে আমরা মারীর মেঘমুক্ত নীল আকশের দিকে নজর দিতাম। পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু কিছু অঞ্চল সত্যিই নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আঁধার হিসেবে গণ্য হতো। পাশাপাশি দেশকে সুন্দর করে গড়ে তোলার অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান সরকার। অবশ্য এই প্রয়াস শুধুই পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে। সবকিছুই সাজিয়ে নেয়ার জোর প্রচেষ্টা তখন তারা চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতি দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যেত আমাদের। হাজার হাজার কিলোমিটার রাস্তা পাকা করে ফেলেছে তারা এরই মধ্যে। প্রতিটি জেলার সঙ্গে শহরের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে অথচ সে আমলে পূর্ব পাকিস্তানের খোদ রাজধানী ঢাকা শহরের অবস্থাই যে কোন মফস্বল শহরের মতো। তুলনামূলক চিত্রতো আগেই তুলে ধরেছি। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ যাওয়ার রাস্তাটিও তখন সেই অর্থে ছিলোনা। পশ্চিম পাকিস্তানীরা চব্বিশ

পঁচিশ বছরের শোষণের মধ্য দিয়ে তাদের দেশকে গুছিয়ে নিয়েছিল। সাজিয়ে নিয়েছিল স্বপ্নের মতো করে। পাকিস্তানের মাঠে প্রান্তরে পাহাড়-পর্বতের গুহার মধ্য দিয়ে যে নৈসর্গিক সৌন্দর্য বিরাজ করতো তা কখনোই অন্তত আমার কাছে, এমনকি সমস্ত বাঙালী ক্যাডেট এবং অফিসারদের কাছে বাংলাদেশের সবুজ শ্যামল প্রান্তরের সরল সৌন্দর্যকে ম্লান করতে পারেনি।

যাহোক, এভাবেই পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে আমার। প্রশিক্ষণ নেয়ার সময়টুকুতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো- আমরা কয়েকজন বাঙালী ক্যাডেট মিলে মিলিটারী একাডেমীতে বসেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা নিলাম। আমরা বুঝতে পেরেছি কোন না কোন সময় নিজের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্যে অস্ত্র আমাদের ধরতেই হবে। এই চিন্তা ভাবনা থেকেই এই বিদ্রোহের পরিকল্পনা। অথচ ব্যাপারটা সর্ব অর্থেই খুবই দুঃসাহসিক। নিয়ম শৃংখলার দিক থেকে পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমী ছিল প্রসিদ্ধ।। এ ধরনের যে কোন বিদ্রোহ পরিকল্পনা ফাঁস হযে যাওয়ার সম্ভাব্য পরিণতি ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যু। তবু আমরা পিছপা হইনি। জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবনের ঝুঁকি নেয়া কোন ব্যাপারই নয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমরা আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হইনি। বা তা করতেও হয়নি আমাদের। আমরা জানতাম এক সময় দেশের জন্য যুদ্ধ করতে হবে পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই সময়টা যে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবে তা আমরা ভাবতে পারিনি।

যাহোক এরপরে বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে প্রায় দশ মাস পরে পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতে আমাদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়। আমরা পাসিং আউট প্যারেড করলাম। ইয়াহিয়া খাঁ সাহেব তখন পাকিস্তানের মসনদে সমাসীন। তিন এলেন প্রেসিডেন্ট প্যারেডে। প্রধান অতিথি হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেন। আমাদের সেই প্রশিক্ষণের সবচেয়ে গৌরবদীপ্ত দিক হলো, উক্ত প্রশিক্ষণে বাঙালী অফিসাররা কৃতিত্বের সঙ্গে উচ্চ অবস্থান অধিকার করে পাস আউট করেছে। সেই ব্যাচে বাঙালী অফিসার ছিলেন প্রায় ৩০ জনের মতো। পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীর আর কোন ব্যাচে এত বেশী সংখ্যক বাঙালী ক্যাডেট প্রশিক্ষণ নেয়নি। এটা একটা রেকর্ড। পাকিস্তানীরাও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কোন বিশেষ কোর্সে এত অধিক সংখ্যক বাঙালী প্রশিক্ষণার্থী এর আগে কখনোই রিক্রুট করেনি। এটা গেল একটা দিক। এছাড়া উক্ত ব্যাচের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন আমাদেরই এক বাঙালী বন্ধু, মোহাম্মদ ইব্রাহিম। সে হিসেবে সোর্ড অব অনার পেয়েছেন তিনি। পাকিস্তান আমলে যোগ্যতা থাকলেও বাঙালী হয়ে সোর্ড অব অনার পাওয়া একেবারেই দুর্লভ ঘটনা। কিন্তু সেবার ব্যতিক্রমী ঘটনাটি ঘটে গেছে। শুধু শীর্ষস্থানই নয়, শীর্ষস্থানের ঠিক পরের স্থানগুলোও বাঙালী ক্যাডেটদেরই দখলে। যখন শুনলাম আমাদেরই বাঙালী বন্ধু ইব্রাহিম শীর্ষস্থান দখল করেছে তখন আমরা সবাই আনন্দে বেশ উদ্বেলিত। এরই মধ্যে আরেক উল্টো প্রচারণা আমাদের কানে এলো। শুনলাম ইব্রাহিম বাঙালী হওয়ায় তাকে সোর্ড অব অনার দেয়া হবে না। অন্য একজন পাঞ্জাবী ক্যাডেটকে সোর্ড অব অনার দেয়া হবে। আমরা এসব শুনে খুব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবীদের সেই প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হয়নি। যে পরিকল্পনা তারা নিয়েছিল বাঙালী ক্যাডেটকে সোর্ড অব অনার না দিয়ে একজন পাঞ্জাবীকে তা দেয়ার সেটা বাস্তবায়িত করতে পারেনি। কারণ পাঞ্জাবী যে ক্যাডেটকে তারা সোর্ড অব অনার দিতে চেয়েছে (যার স্থান ছিল ইব্রাহিমের বেশ কয়েকজনের পরে) সে রেগুলার কোর্সের ক্যাডেট নয়। সে গ্রাজুয়েট কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী। আমাদের কোর্সে তার অন্তর্ভুক্তি হয়েছিল একজন সহযোগী হিসেবে। যেহেতু মূল কোর্সের ক্যাডেট সে নয় সেহেতু

পাঞ্জাবীদের সেই ষড়যন্ত্রটা কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত মুহূর্তে অর্থাৎ ১৯৭০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বরে সোনালী সকালে পাকিস্তানী মিলিটারী একাডেমীতে আমাদের পাঠ শেষের পাসিং আউট পর্ব শুরু হলো। ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খানসহ বেশ বড় বড় জেনারেলদের আগমন ঘটলো একাডেমীতে। যা হোক, পাসিং আউট প্যারেড শেষ হলো। আমরা মিলিটারী একাডেমী থেকে বিদায় নিলাম। এখানে পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমী সম্বন্ধে কিছুটা মূল্যায়ন বোধহয় করা প্রয়োজন। বেশ উচ্চমানসম্পন্ন একাডেমী সেটা। যেহেতু ব্রিটিশের একটি অপচ্ছায়া আমাদের সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্রকে তখনো গ্রাস করে রেখেছে সেহেতু পাকিস্তানী মিলিটারী একাডেমীও আচার-আচারণে, নিয়ম-নীতিতে ব্রিটিশদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মিলিটারী স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে সারা বিশ্বেই পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীর আলাদা একটা সুনাম ছিল। সশস্ত্র প্রশিক্ষণ ছাড়াও সামরিক ইতিহাস এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক রণনীতিগত কৌশলের দিক থেকেও এই একাডেমী ছিল উচ্চমানের এবং পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক অবস্থান সম্পর্কে অফিসারদের সচেতন রাখার ব্যাপারেও একাডেমীর বেশ সক্রিয়তা ছিল। যেমন ধরা যাক, পাকিস্তান-চায়না বন্ধুত্ব। এ ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ের সেমিনার, লেকচার ক্লাশ এগুলো হতো। এর মধ্য দিয়ে অফিসারদের পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়া হতো পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক অবস্থানে কারা বন্ধু কারা শত্রু। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভারত যে পাকিস্তানের শত্রু সেটাও অফিসারদের ভালমতই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। এটা গেল মোটিভেশন্যাল দিক। তবে পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতে আমরা অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র এবং হায়ার টেকনোলজিক্যাল যুদ্ধ সম্পর্কে কোন শিক্ষা অর্জন করতে পারিনি যা বর্তমান বিশ্বে বহুল পরিচিত। সেই সনাতনী প্রথার মুখোমুখি যুদ্ধ এখনতো আর হয়ই না। আজকে মারণ যুদ্ধের পরিকল্পনা রূপ নিয়েছে তারকাযুদ্ধে, সেখানে সনাতনী কায়দায় যুদ্ধের জন্য কোম্পানী, ব্যাটালিয়ান গঠন করে শত্রুকে মোকাবেলা করে আক্রমণ করে পজিশন দখল করা-এগুলো আজকের পারমাণবিক যুগের সমরকৌশলে খুব একটা গুরুত্ব বহন করে না। এ কারণেই পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে এটা বলতেই হয় যে, আধুনিক যুদ্ধেরও কলাকৌশল রপ্ত করানোর ব্যাপারে এই একাডেমীর দুর্বলতা ছিল। এই বোধটা এখন আরো স্পষ্ট। সাধারণ মানুষ এখন এটা বোঝে। এছাড়া অন্যান্য দিকের হিসেবে পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমী ছিল বিশ্বমানের। তবে যাইহোক, মিলিটারী একাডেমীর দিনগুলি আমাদের ভালই কেটেছে। দশ মাস সেই সামরিক একাডেমীতে প্রশিক্ষণ নেয়ার পরে যখন একাডেমী ছেড়ে এসেছি তখন বেশ খারাপই লেগেছে। জন্মের পর জ্ঞান যখন হয়েছে মানে যখন থেকে স্মৃতিশক্তি কার্যকর সে-সময় থেকে পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতেই আমাকে সবচেয়ে শ্রম সাধ্য, কষ্টকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হয়েছে। অবশ্য এর মধ্য দিয়েই অর্জন করেছি চমৎকার শারীরিক শক্তি ও সামরিক জ্ঞান। এটা কম বড় পাওয়া নয়। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কঠোর প্রশিক্ষণ ছাড়া সম্ভব নয়। তারপরেও বলবো, পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীর দিনগুলো কেটেছে প্রচন্ড পরিশ্রম, শারীরিক কষ্ট, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং অমানবিক শাস্তি ভোগের মধ্য দিয়ে। তবে দশ মাসের প্রশিক্ষণশেষে একাডেমী যখন ছাড়তে হলো তখন কিন্তু মনে হয়নি এখানে খুব কষ্টে ছিলাম।। বেশ খারাপই লেগেছে একাডেমী ছেড়ে আসতে। একা শুধু আমি নই, বিদায়ের সময় সব ক্যাডেটই ছিলো মনমরা, হৃদয়ের ভারে আক্রান্ত। সেই দশ মাসে প্রত্যেকের জীবনেই যুক্ত হয়েছে স্মরণীয় কিছু অভিজ্ঞতা। ছোটবেলা থেকেই সমরবিদ হওয়ার, একজন সামরিক অফিসার হওয়ার যে রোমান্টিক কল্পনা আমার মনে পাখা মেলে উড়তো তা বাস্তবে রূপ নিলো মিলিটারী একাডেমীর দশ

মাসের প্রশিক্ষণ শেষে। ছোটবেলার সেই স্বপ্ন প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঘটনাটি আমার নাম পরিবর্তন করা সংক্রান্ত। বাবা মা নাম রেখেছিলেন আবুল মোমেনীন জিয়াউদ্দিন আহমেদ। অষ্টম শ্রেণীতে উঠে যখন স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমাকে যোদ্ধা হতে হবে তখন থেকেই ভাবনা–নামটা বদলাতে হবে। নবম শ্রেণীতে ওঠার পর যখন নাম রেজিস্ট্রি করা হলো তখন নামটা বদলিয়ে ফেললাম। অবশ্য এর আগে প্রয়োজন মায়ের অনুমতি নেয়া। মাকে বললাম। আমি আমার নাম পরিবর্তন করতে চাই। মা জানতে চাইলেন, কেন? কারণটা কি? কারণটা আমি তাঁকে স্পষ্ট করেই বললাম, যেহেতু আমি একজন যোদ্ধা হবো সেহেতু হযরত আলীর নামের সঙ্গে একীভূত করে নামটা আবুল মোমেনীন জিয়াউদ্দিন আহমদের জায়গায় আলী হায়দার জিয়াউদ্দিন আহমেদ রাখবো। মা সম্মতি দিলেন, ঠিক আছে, তুমি যখন চাচ্ছো, করো। রেজিস্ট্রেশনের সময় পরিবর্তিত নামটাই বহাল হলো। ১৯৭০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর সকাল বেলা সেই নাম পরিবর্তনের সার্থকতা প্রথম অনুভূত হলো। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটা একাডেমী থেকে একজন নবীন সমরবিদ হিসেবে সনদ পাওয়া গেল। সেখান থেকেই যাত্রা শুরু। পাসিং আউটের পরে ১৫ দিনের ছুটি। বেশ কিছু বাঙালী অফিসার চলে এলেন পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু আমার আসা হলো না। আসতে না পারার মূল কারণটা অর্থনৈতিক। প্রায় বছর খানেক পর বাড়ি যাচ্ছি। বাড়িতে ছোট ভাইবোনেরা আছে, অন্যান্য অনেকেই আছে। তাদের সবার জন্যেই উপহার জাতীয় কিছু একটা নিয়ে আসার ব্যাপার রয়েছে। অথচ আমার হাতে টাকা পয়সাও তেমন নেই। ভাবলাম, ছয় মাস কি এক বছর পরে অবস্থাটার কিছু পরিবর্তন হলে টাকা জমিয়ে সবার জন্য কিছু কিনে তারপর বাড়ী যাব। চিঠির মাধ্যমে বাবা–মার সঙ্গে যোগযোগ রয়েছে নিয়মিত। তারা জানালেন যেন বাড়ী চলে আসি। আমি জানিয়ে দিলাম, না, মাত্র পনেরো দিনের ছুটি। এরমধ্যে বাড়ি আসা হবে না। নিতান্তই অর্থনৈতিক সংকটের কারণেই যে বাড়ী ফেরা সম্ভব হচ্ছে না এটা অবশ্য তাদেরকে জানাইনি। ভাবলাম, এটা জানালে তারা দুঃখ পাবে। আমাদের অনেক আশা আকাংক্ষা পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অর্থনীতির মতো ভয়াবহ একটি ব্যাপার। এটা একটা রূঢ় সত্য। আমি আমার বাবা–মাকে সে সময় সেই রূঢ় সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে চাইনি।

আমার ছোট বোনের স্বামী ক্যাপ্টেন আলতাফ চাকরি করতেন পশ্চিম পাকিস্তানের ঝিলামে। ঝিলাম নদীর তীরে সেই মরু অঞ্চলে শিকার করে ছুটির সেই পনেরোটা দিন পার করলাম। ছুটির শেষে এসে যোগ দিলাম লাহোর ক্যান্টনমেন্টে, গোলন্দাজ বাহিনীতে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর চতুর্থ গোলন্দাজ বাহিনীতে পোস্টিং। যোগ দেওয়ার পরে প্রথম পর্যায়ে রেজিমেন্টের কাজকর্ম বোঝা, নিজের কর্তব্যটা বুঝে নেয়া, ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করা এসবের মধ্য দিয়েই প্রথম কয়েক মাস কেটে গেলো। আমাদের সঙ্গী এক বাঙালী অফিসার সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, আমরা লাহোর ক্যান্টনমেন্টের যে মেসে থাকতাম তার খুবই কাছে লাহোর এয়ারপোর্ট। আর মেস থেকে রেজিমেন্টের মূল অফিসের দূরত্ব প্রায় তিন মাইলের মতো। প্রতিদিন সকালবেলা রেজিমেন্টে অফিসারদের পিটি হতো। কিন্তু কোন অফিসারই পিটি করতে যেতো না। কারণ প্রচন্ড শীত পড়েছিল সে সময়। আর ভোর বেলায় শীতের কামড়টা কী ভয়াবহ সেটাতো সবারই জানা। সেই ভয়ানক শীত উপেক্ষা করে একমাত্র জিয়াউদ্দিন আহমেদই প্রতিদিন ভোর সাড়ে চারটায় উঠে দৌড়াতে বেরোত।

বাঙালী অফিসারের স্মৃতিচারণটা পুরোপুরি সত্য। আমি প্রতিভোরে উঠে তিন চার বা পাঁচ মাইল দৌড়াতাম। আমার মনে ভাবনা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটা খুব কাছে। এই মুহূর্তে আমি

যদি আরামপ্রিয় হয়ে যাই, ঠিকমতো শরীরকে প্রস্তুত না রাখি তাহলে মুক্তিযুদ্ধে পিছিয়ে পড়বো। সে কারণে সকাল বেলায় প্রিয় বিছানা ছেড়ে তিন মাইল, চার মাইল, পাঁচ মাইল দৌড়াতাম। স্মৃতিচারণকারী সেই বাঙালী অফিসার ঘুম থেকে উঠে দেখতেন সেই প্রচন্ড শীতে তিন–চার মাইল দৌড়িয়ে ঘর্মাক্ত অবস্থায় আমি ফিরে আসছি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি যখন পাকিস্তান থেকে ফিরে এসেছেন তখন আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে আমাকে বলেছেন, তুমি যে লাহোরের প্রচন্ড শীতের মধ্যে ভোরবেলা দৌড়ে ফিরে আসতে তখন আমি মনে করতাম হয় তুমি পাগল অথবা তোমার মনের মধ্যে কোন গোপন পরিকল্পনা কাজ করছে। তুমি কিছু একটা করতে চাচ্ছ।

যাহোক, এভাবে আমাদের সেই লাহোরের জীবনটা শুরু। লাহোর থেকেছি প্রায় সাতমাস– ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭১ এর মার্চ পর্যন্ত। এরমধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই বললেই চলে। চিঠিপত্রের মাধ্যমে বাবা মা'র সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। এদিকে আমার ছোট ভগ্নিপতি ক্যাপ্টেন আলতাফ ছুটিতে বাড়ী গিয়েছিলেন। বাড়ী থেকে ফিরে যাওয়ার সময় লাহোর এয়ারপোর্টে তার সাথে দেখা। আমার কিছু কিছু প্রিয় খাবার বানিয়ে মা তার মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই খাবারগুলো আমাকে দেয়া এবং দেখা করার উদ্দেশ্যে ছোট ভগ্নিপতি টেলিগ্রামের মাধ্যমে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন কখন তিনি লাহোর রেলস্টেশন থেকে রওনা দেবেন ঝিলামের উদ্দেশ্যে। ঢাকা থেকে কখন তার ফ্লাইট এবং কখন ট্রেন ছাড়বে লাহোর স্টেশন থেকে এই সময়টা সমন্বয় করে আমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম লাহোর রেলওয়ে স্টেশনে। তিনি প্রথমে মায়ের বানানো খাবারগুলো আমাকে দিলেন। পাশাপাশি তিনি আমাকে খুব জোর দিয়ে বললেন যে বাংলাদেশ অচিরেই স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে। আমার কাছে এটা খুব নতুন কথা বলে মনে হয়নি। কিন্তু তার বলার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন একেবারে চাক্ষুষ দেখতেই পাচ্ছেন যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে এবং এতো দ্রুত পরিস্থিতিটা এগিয়ে আসছে যা আশ্চর্যজনক। তার বলার মধ্যে এমন একটা ভাবই প্রকাশ পাচ্ছে। আমাকে বারবার তিনি বোঝাচ্ছেন, 'দেশতো স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে। সেই বাংলাদেশ আর নেই। সমস্ত রাজপথ এখন জনতার দখলে। সমগ্র জনতা আওয়ামী লীগের পেছনে ঐক্যবদ্ধ, শেখ মুজিবের পেছনে ঐক্যবদ্ধ এবং তারা যে অবস্থানে আছে তাতে পাঞ্জাবীদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই হয়ে যাবে এবং চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাবে।' এর কিছুই আমার কাছে নতুন মনে হয়নি। তবু খবরাখবর পাওয়ার অর্থে খবরগুলি আমি পেলাম। ভগ্নিপতিকে বিদায় দিয়ে ফিরে এলাম আমাদের সেই আর্টিলারী মেসে। ফিরে এসে খুব অস্থিরতার মধ্যে কাটাচ্ছি। এখানে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করবো যা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে। কথিত কাশ্মিরী মুজাহেদীনরা একটি ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে লাহোর নিয়ে এসেছিল। এবং এটা ছিল বেশ ষড়যন্ত্রমূলক একটি ঘটনা। আমাদের মেসের কাছেই অবস্থিত লাহোর এয়ারপোর্টে ছিনতাইকারীরা বিমানটি অবতরণ করিয়েছিল। ভারতের কাছে এই কাশ্মিরী মুজাহেদীনদের দাবী ছিল কাশ্মীরের স্বাধীনতা। বিমানের আরোহীদের ছেড়ে দেয়া হলো। জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তান থেকে লাহোর এসে পৌঁছলেন। বিমান বন্দরে নেমে তিনি কাশ্মিরী মুজাহেদীনদের সঙ্গে একান্তে সলা–পরামর্শ করলেন। এর ঘন্টা চারেক পরে কাশ্মিরীরা ডিনামাইট দিয়ে বিমানটা উড়িয়ে দিলো। ঘটনা খুব উত্তেজনাকর পরিস্থিতির দিকে গড়াল। সমগ্র সেনা ছাউনীগুলোতে প্রচন্ড গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে লাহোরসহ পাকিস্তানের বিশাল ভূখন্ড অধিকার করে নেবে। রাতের মধ্যে আমাদের কাছে নির্দেশ এলো। আমরা আমাদের পুরো রেজিমেন্ট নিয়ে তৎক্ষণাৎই রওনা দিলাম ভারতীয়

দিলাম ভারতীয় সীমান্তের দিকে। রাতের অন্ধকারে বিআরবি ক্যানেল পেরিয়ে সীমান্তবর্তী বারকি নামে এক গ্রামের পেছনে পৌঁছে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে আমাদের কামানগুলো বসালাম। তাঁবু খাটানো হলো। আমরা অফিসার যারা ছিলাম যার যার তাঁবুতে শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল বেলা উঠে আমি রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। দেখলাম, আমার তাঁবু থেকে আড়াইশ কি তিনশ গজ দূরে বড় একটা পাকা কুয়োর চারপাশে অসংখ্য পুরুষ এবং কিছু কিছু মহিলার ভিড়। পুরুষদের দেখে বুঝতে পারছি এরা সবাই হিন্দু। কারণ ওদের পরনে ছিল ধুতি। আমি ঘাবড়ে গেলাম। রাতের বেলা অন্ধকারে কি পথ ভুল হলো? ম্যাপ রিডিং ভুল করে ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে ফেলেছি–এই আশংকায় মনটা দুলে উঠলো। তাড়াতাড়ি হাবিলদার মেজরকে ডাকলাম। ডেকে বললাম, 'হাবিলদার মেজর, আমরা ভুল করিনিতো? ম্যাপ রিডিং ভুল করে রাতের মধ্যে ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় কোন গ্রামে চলে আসিনিতো?' উর্দুতে কথা হচ্ছে আমাদের।

হাবিলদার মেজর বললো, ' কেন স্যার, এমন হওয়ার তো কোন কারণ নেই। আমরা তো বারকি ভিলেজের পেছনে আছি। যে গ্রামটা সামনে দেখছেন এটা বারকি ভিলেজ। আপনি কেন ভাবছেন যে এটা হিন্দুস্থান?' আমি বললাম, 'এতগুলো লোক দেখতে পাচ্ছি। এদের সকলের পরনে ধুতি। এরাতো হিন্দু।' হাবিলদার আমাকে বললো, 'কেন সাহেব, পাঞ্জাবে তো সমস্ত মুসলমানরা ধুতি পরে। ধুতি পরলেই হিন্দু হবে কেন? আমরা বারকি ভিলেজের পেছনেই আছি। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।'

উত্তরটা হাবিলদার মেজরের কাছে খুব সহজ ছিলো। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছিল উত্তরটার মধ্যে বিরাট ঐতিহাসিক একটি জটিলতা রয়েছে। কারণ, এই নব্য পাঞ্জাবের শাসকগোষ্ঠী পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে এবং একই দশকের শেষ প্রান্তে বারবার এই পূর্ব বাংলায় ধুতি আর লুঙ্গির সেন্টিমেন্ট উসকে দিয়ে হিন্দু–মুসলমানকে ঠেলে দিয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিকে। হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা বাধিয়েছে এই পাঞ্জাবীরাই। আর এই পাঞ্জাবেই গ্রামের সাধারণ মানুষ, কৃষক, মজুররা ধুতি পরে, সেখানে তাদের ইসলাম নষ্ট হয় না। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলমানরা ধুতি পরলে হিন্দু হয়ে যায়। আমাদের দেশের মানুষকে বোকা বানানো খুব সহজ। এভাবেই পাঞ্জাবীরা বার বার আমাদের বোকা বানিয়েছে। এই কথাগুলোই আমার মানসপটে ভেসে ওঠেছিল বারকি ভিলেজের পেছনে দাঁড়িয়ে, হাবিলদার মেজরের সহজ স্বীকারোক্তি শুনে। হায়রে দুর্ভাগা দেশ! এদেশের মানুষকে ইসলামের নামে, আল্লার নামে অপব্যাখ্যা দিয়ে ভুল বুঝিয়ে এদেরকে দিয়ে না করানো যায় এমন বোধহয় কিছু নেই।

যাই হোক, হাবিলদার মেজর তার বুঝ বুঝে চলে গেল আর আমি আমার বুঝ বুঝে থ খেয়ে বসে থাকলাম। বার বার মনের ভেতর আলোড়ন তুলছিল নোয়াখালীর সেই হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা, ঢাকার হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা, আমাদের পিরোজপুরের সেই হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা–এসব দাঙ্গার পেছনে ধুতি–লুঙ্গির ব্যাপারটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বারকি ভিলেজের পেছনে অবস্থান নিয়ে বসে আছি তো আছিই। এক সময় আমরা বুঝে ফেললাম, ভারত আক্রমণ পরিচালনা করছে না। লাহোরসহ পাকিস্তানের বিরাট ভূখন্ড দখল করে নেয়ার পরিকল্পনা আপাততঃ তাদের নেই। গরম মাথায় কিছু করার অভিলাষ নেই ভারতের। আমরা আস্তে আস্তে বেশ স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরে এসেছি। আমাদের মধ্যে এক পাঞ্জাবী অফিসার ছিলেন, ভদ্রলোক বেশ ভালো। উদার প্রকৃতির মানুষ। বেশ বড় জমিদার পরিবারের ছেলে। তার সঙ্গে আমার একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল। একদিন তার তাঁবুতে

গিয়ে আমি গল্প করছি। হঠাৎ দেখি, তার তাঁবুর কোণায় একটা পয়েন্ট টু টু রাইফেল। আমি তাকে বললাম, 'স্যার, এই রাইফেল দিয়ে আপনি শিকার করছেন না কেনো?' তিনি বললেন, 'এটা ভালো না। এটা দিয়ে শিকার করা যায় না।' বললাম, 'স্যার আমি একটু চেষ্টা করে দেখি?' তিনি সম্মতি দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি যদি পারো চেষ্টা করে দেখো।' বিআরবি খালের ওপর পদ্মফুলের মতো কয়েকটা ফুলের ওপর টার্গেট প্রাকটিস করতে গিয়ে দেখি আসলে পাঞ্জাবী অফিসার সাহেব রাইফেলটাকে জিরোইং করতে পারেননি। অর্থাৎ নিশানা সঠিক করে এর যে এলাইনমেন্টটা জিরোইং করতে হবে সেটাই করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। আমি রাইফেলটা দিয়ে শিকার করার প্ল্যান করলাম। এরপর প্রায় প্রতিদিনই দু'একজন মেস বয় এবং আরো কিছু সঙ্গী–সাথী জুটিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। সকাল বেলা বেরিয়ে যেতাম। দুপুর গড়িয়ে বিকাল, একেবারে সন্ধ্যায় ফিরে আসতাম। উদ্দেশ্য দুটো। গৌণ উদ্দেশ্য পাখি শিকার আর মুখ্য উদ্দেশ্য পাখি শিকার করতে করতে পাকিস্তান–ভারত সীমান্তটা রেকী করে ফেলা। কারণ বাংলাদেশের অশান্ত পরিবেশ যখন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যুদ্ধের মাঠে পদার্পণ করবে তখন আমাকে এই সীমান্ত অতিক্রম করেই ভারত হয়ে বাংলায় গিয়ে হাজির হতে হবে–এই ছিল মানসিক ভাবনা। আমার দীর্ঘদিনের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের সময়তো সামনেই। কাজেই সীমান্তটা পর্যবেক্ষণ করার (সামরিক ভাষায় যাকে বলে রেকী করা) সুযোগটা আমি অবহেলায় হারাতে পারি না। আমি প্রায় দুসপ্তাহ ধরে শিকার পর্ব চালিয়ে গেলাম। প্রচুর পাখিও মারলাম আর পাখি মারার ছল করে বি আর বি খাল পেরিয়ে পাকিস্তান–ভারতের সীমান্ত এলাকাটি সুন্দরভাবে, অপারেশন্যাল ম্যাপ মিলিয়ে মিলিয়ে, হেঁটে হেঁটে দুর্গম এলাকা রেকী করার কাজ সম্পন্ন করে ফেললাম। প্রায় তিন সপ্তাহ কি তার একটু বেশি সময় পরে আমাদের নির্দেশ দেয়া হলো ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যাওয়ার। তিন সপ্তাহ পরে পাকিস্তানী জেনারেলরা বুঝলেন ভারত অন্ততঃ এ–দফা পাকিস্তানের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে না। আমরা ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এলাম; কিন্তু পাক–ভারত সীমান্তের যে এলাকাটা আমি রেকী করেছি সেই এলাকার ম্যাপটা আমি আর জমা দিচ্ছি না। সেটি আমি বেশ যত্ন সহকারে নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে আমার কাছে রেখে দিয়েছি। সাধারণভাবে একটি অপারেশন্যাল ম্যাপ কোন অফিসারের কাছে থাকার কথা নয়। এই ম্যাপে শত্রুবাহিনী এবং মিত্রবাহিনীর সমস্ত অবস্থান চিহ্নিত থাকে। কিন্তু আমি ম্যাপটি না দেয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশলে অজুহাত দেখাতে লাগলাম। ম্যাপটি বাসা থেকে আনা হয়নি, অফিসে রয়ে গেছে, আজকে ভুলে গেছি, ঠিক আছে সাতদিন পরে দিচ্ছি–এইভাবে নানান অজুহাত দেখিয়ে ওটা রেখে দিচ্ছি নিজেরই কাছে। ঠিক এই সময়টাতেই আমার সেই ছোট ভগ্নিপতি বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান থেকে ফিরে গেলেন লাহোর হয়ে ঝিলামে। এটা ফেব্রুয়ারীর শেষের দিককার ঘটনা।

সারা বাংলা তখন জ্বলছে। সারা বাংলার মানুষ স্বাধীনতার জন্যে একপ্রাণ হয়ে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে হঠাৎ করেই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমাকে বাড়ি চলে যেতে হবে। হাতে সময় আর নেই। বাড়ি যাওয়ার জন্য আমি বিভিন্ন অজুহাত খুঁজতে শুরু করে দিলাম। একটা অজুহাত পেয়েও গেলাম। সে সময় আমার বড় বোনের কাছ থেকে একটা চিঠি গেল। চিঠিতে বার্তা এই যে, বড় বোনের শ্বশুর বাড়ি গলাচিপাতে নভেম্বর '৭০–এর সেই বিখ্যাত জলোচ্ছ্বাসে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশজন লোক নিহত হয়েছে। অবশ্য আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কেউ মারা যাননি। যা হোক, তবু অজুহাততো পাওয়া গেল একটা। এই অজুহাতটি পাওয়ার পরে আমি মনে মনে বুদ্ধি আঁটিলাম এটা দেখিয়েই আমি ছুটি চাইবো। একদিন দুপুরে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি, আরো দুজন পাঞ্জাবী বন্ধু আমার পাশে বসে আছে, হঠাৎ করে একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে নিয়ে ফেললাম যে, আমাকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে গিয়ে হাজির হতে হবে। বাবা–মাকে দেখিনা বহুদিন। তাঁদেরকে, বিশেষ করে মাকে দেখার জন্যও মনটা প্রচণ্ড অস্থির হয়ে উঠেছে। এটা হচ্ছে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের কথা। পরের দিন রেজিমেন্টে চলে গেলাম। গিয়ে রেজিমেন্টের সিনিয়র অফিসারকে বললাম যে, আমি সিও সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমাকে বলা হলো, 'কমাণ্ডিং অফিসারতো ব্যস্ত। কালকে দেখা করো। তোমার এতো ব্যস্ততার কি আছে?' তখন রেজিমেন্টের অ্যাডজুটেন্টকে বললাম, 'আমি বাড়ি যাব।' তিনিতো একথা শুনে রীতিমতো ঘাবড়ে গেলেন। কারণ সেই সময় বাড়ি যাওয়ার জন্য ছুটি কাউকেই দেয়া হচ্ছে না। বরং অফিসার এবং সৈনিকদের মধ্যে যারা ছুটিতে রয়েছে তাদের সকলকে আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে ছুটি বাতিল করে রেজিমেন্টে যোগ দেয়ার জন্য টেলিগ্রাম করে দেয়া হয়েছে। সে অবস্থায় নতুন করে একজন বাঙালী অফিসারকে বাংলাদেশে আসার জন্য ছুটি দেয়া হবে– এটা একটা অভাবনীয় ব্যাপার ভেবেই অ্যাডজুটেন্ট সাহেব একটু আশ্চর্য হলেন। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবী। আমি তাকে বললাম, 'আমাকে বাড়ি যেতেই হবে। আমি সিও'র সঙ্গে দেখা করতে চাই।' তখন তিনি উর্দুতে বললেন, 'জিয়া তুমি পাগল হয়ে গেছো। এখন কি ছুটি পাবে নাকি?' আমি তবু নাছোড়বান্দা। তখনও বলে যাচ্ছি– 'না স্যার, ছুটি আমাকে পেতেই হবে। সিও'র সঙ্গে দেখা করবো আমি।'

অ্যাডজুটেন্ট অবস্থা বুঝে সিও'র সঙ্গে আমার বিশেষ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলেন। তখন আমাদের কমাণ্ডিং অফিসার হচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত। যিনি মূল সিও সেই পাঠান কর্নেল আশিকশা সে সময় খুব সম্ভব ছুটিতে কিংবা কোন একটা কোর্সে অংশ নেয়ার জন্য বাইরে রয়েছেন। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল আতিক সাহেব হলেন সে সময় আমাদের ভারপ্রাপ্ত কমাণ্ডিং অফিসার। আতিক সাহেবকে গিয়ে আমি বুঝিয়ে

বললাম এবং আমার বড়বোনের পাঠানো চিঠিটা দেখালাম। বললাম যে, বেশ কয়েকজন আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু হয়েছে। আতিক সাহেব সব শুনে বেশ সাহসী ভূমিকা পালন করলেন। সেই প্রতিকূল অবস্থাতেও ছুটি দিলেন আমাকে। আমাদের ডিভ কমান্ডার হচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার শামস। আতিক সাহেব ছুটি দিলেইতো হবে না। ব্রিগেডিয়ার শামসেরও অনুমতি লাগবে। ব্রিগেডিয়ার সাহেব বাঙালী। বাঙালী হলেও কট্টর বাঙালীবিরোধী হিসেবে পাকিস্তানে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন। পাঞ্জাবীদের তোষণে তিনি ঐতিহাসিক রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে জড়িত বাঙালী সৈনিক, স্বয়ং শেখ মুজিব এবং স্বাধীনতাকামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালীদের বিরোধিতা করে ব্রিগেডিয়ার শামস সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হন এবং এ কারণেই তিনি অন্যান্যের তুলনায় দ্রুত ব্রিগেডিয়ার পদমর্যাদায় উন্নীত হতে পেরেছেন।

মেজর আতিক আমাকে নিয়ে আর্টিলারী ডিভ . কমান্ডার শামস সাহেবের কাছে গেলেন। ব্রিগেডিয়ার শামস কিছুতেই আমাকে ছুটি দিতে রাজী হলেন না। পরবর্তীতে আতিক সাহেবের দৃঢ়তার সামনে ব্রিগেডিয়ার শামসকে মাথা নত করতে হলো। আমাকে দুই মাসের ছুটি দিতে রাজী হলেন তিনি। ছুটি পাওয়ার পরেও সমস্যা হলো ঢাকায় ফিরে আসা। কারণ তখন পিআইএ'র সমস্ত ফ্লাইটগুলো ভরে পাঞ্জাবী সৈন্যদের ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে। টিক্কা খানের নেতৃত্বে একটা আর্মি কোর ঢাকায় নতুন করে অবস্থান নিচ্ছে। সেখানে পাঞ্জাবী সৈনিকদের শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সমস্ত ফ্লাইট ভর্তি করে দফায় দফায় পাঞ্জাবী সৈনিকদের ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি তো দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করেও টিকেটের ব্যবস্থা করতে পারছি না। ছুটি যদিও পেলাম, টিকেট পাওয়া গেল না। আমার রেজিমেন্টে এক পাঠান অফিসার ছিলেন–লেফটেন্যান্ট রহিম। তার পরিবারের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে। দরিদ্র পরিবারের সন্তান রহিম। মা খুব কষ্ট করে তাকে মানুষ করেছে। এমনকি সেলাই করে কাপড় বিক্রি করে ছেলেকে পড়াশোনা করিয়েছে। সেই রহিম পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন পেয়েছে। এক সময় বাঙালী অফিসার লেফটেন্যান্ট জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে তার একটা বন্ধুত্ব হলো। মাঝে মাঝে সে আমাকে নিয়ে যেতো তার বাড়িতে। বিশেষ করে বৃহস্পতিবার বিকেল বেলা। মা রান্না করতেন মাছ। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, এই পাঠান পরিবার মাছ খেতো। মাছ খাওয়ার কারণে আমিও মাছের সন্ধানটা পেতাম। ভালই লাগত। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার সেই বাড়িতে যাওয়া হতোই। এই যাতায়াতই আমার ভাগ্যকে সহায়তা দিয়েছিল সেই চরম দুঃসময়ে। পিআইএ'র ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার ছিলেন রহিম সাহেবের ভগ্নিপতি। সেই ভগ্নিপতি পিআইএ'র ফ্লাইটের নির্ধারিত যাত্রী তালিকা থেকে একজন পাঞ্জাবী সৈনিকের নাম কেটে সেখানে আমার নাম ঢুকিয়ে দিলেন। ১৯ শে মার্চ আমাদের ফ্লাইট। রাত নটার দিকে। প্রচন্ড উত্তেজনা মনের মধ্যে। প্রায় দেড় বছর পৌনে দুই বছর পরে ঘরে ফিরছি। আমার আবাল্য লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে শিগগিরই। সবকিছু মিলিয়ে তীব্র একটা উত্তেজনার মধ্য দিয়ে আমার সময়টা কাটছে। রেজিমেন্টের অফিসাররা রাত্রে একটা ডিনারের আয়োজন করলেন আমার জন্য। আমাকে নিয়ে সবাই একত্রে বসে খাবে–এজন্যেই আয়োজন। আমরা সবাই প্রস্তুত হচ্ছি ডিনারের জন্য। আমার স্যুটকেসে সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছি। অন্য কয়েকজন অফিসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসার জন্য। এমন সময় ব্রিগেডিয়ার শামসের বাড়ি থেকে ফোন কল এলো আমার উদ্দেশ্যে। হাবিলদার মেজর দৌড়ে এসে খবরটা দিলো আমাকে। আমি গেলাম। আমাকে ব্রিগেডিয়ার সাহেবের বাড়িতে ডাকা হলো। আমাদের এক বাঙালী অফিসারের ভাঙ্গাচোরা একটি গাড়ী ছিলো। সেটা নিয়ে

পৌঁছলাম ব্রিগেডিয়ার সাহেবের বাড়িতে। তিনি বললেন, 'আমরা খবর পেয়েছি বর্তমানে বাংলাদেশে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। তোমাকে যে ছুটিটি দেয়া হয়েছিল সেটা বাতিল করা হলো এবং আমি চাই যে তুমি এ অবস্থায় বাংলাদেশে যাবে না।' তখন আমি বুঝলাম যে আমারতো সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। এখন তো মুখ ফুটে সাহস করে কিছু কথা বলতেই হয়। বিগ্রেডিয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে এক জন সেকেন্ড লেফটেন্যান্টের কথা বলা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতো একটা আমলাতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর মধ্যে বেশ কঠিন। তবুও আমি সাহস করে বললাম, 'স্যার আমাকে দু'মিনিট কথা বলার অনুমতি দিন। স্যার, আমি অজ পাড়াগাঁয়ের একটি ছেলে। রাজনীতি কাকে বল জীবনেও জানিনা। পশ্চিম পাকিস্তানে আসার আগে বাবা মাকে ছেড়ে কোনদিন ঢাকায়ও আসিনি। আমার এতোগুলো আত্মীয়–স্বজন মারা গেছে। এখন আমি আমার মাকে না দেখলে কিছুতেই রেজিমেন্টাল কাজকর্মে মন বসাতে পারবো না। আমাকে ছুটি না দিলে আমি চাকরি করতে পারছি না।' ব্রিগেডিয়ার সাহেব একটু ঝিমিয়ে নিয়ে তারপর রাজী হলেন। আমাকে ছুটি দিলেন। কয়েকটা চিঠি দিলেন ঢাকায় পোষ্ট করার জন্যে। আর বললেন, 'দু'মাস পরে যখন ফিরে আসবে তখন আমার জন্যে কিছু পান নিয়ে এসো।' কারণ ওভার ফ্লাইট বন্ধ হয়ে গেছে। শ্রীলংকার ওপর দিয়ে আসতে–যেতে হয়। একারণেই একটু অপ্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য তখন আমদানী করা হচ্ছে না। কেবল পাঞ্জাবীদের অস্ত্র এবং বাঙালীদের গণহত্যা করার জন্য পাঞ্জাবী সৈনিকদের ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার মহান দায়িত্বটা পিআইএ পালন করছে। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মেসে ফিরে এলাম। খাওয়া দাওয়া হলো। অন্যান্য অফিসারেরা এলেন। অনেকেই সে সময় মন্তব্য করলেন, জিয়া তো যাচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশে। ব্যাপারটাতে আমি খুব ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বারবার এড়িয়ে যেতে চাচ্ছি, যাতে বিষয়টি আলোচনায় মুখ্য হয়ে উঠে আমার যাত্রাটা আবার বাতিল হয়ে না যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এ ধরনের কোন বিপত্তি ঘটেনি। খাওয়া–দাওয়া, আলাপ আলোচনা সেরে পৌছলাম লাহোর এয়ারপোর্টে। মেস থেকে খুব কাছেই এয়ারপোর্টটা। সঙ্গে বেশ কয়েকজন অফিসার। প্লেনে ওঠার আগে সেই পয়েন্ট টুটু রাইফেলের মালিক আমাকে উর্দুতে বললেন, 'ইয়ার জিয়া, তুমতো ওয় পাস নেহি আউগি। মুজিব ভাই, জিন্দাবাদ, মুজিব ভাই জিন্দাবাদ। তুমতো ওয়া পাস নেহি আউগি।' আমি মনে মনে শুধু আল্লা আল্লা করছি একবার বিমানে উঠতে পারলে হয়। ঝামেলা যাতে না হয় সেজন্যে তার কথার দৃঢ় প্রতিবাদ করে বললাম 'না স্যার, আমি অখন্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী। যাই ঘটুক, পাকিস্তানের অখন্ডতার জন্য আমি চেষ্টা করবো।' মুখে বলছি আর মনে মনে আল্লা আল্লা করছি বিমানটা ছাড়তে দেরী করছে কেন? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বিমান ছাড়ার সময় হলো। আমি বিমানে চড়লাম। করাচীতে যাত্রাবিরতি দিয়ে শ্রীলংকার ওপর দিয়ে বিমানটি ২০ শে মার্চ সকাল দশটা/এগারোটার দিকে ঢাকা বিমানবন্দরের রানওয়েতে পৌছলো। জানালা দিয়ে দেখলাম সমস্ত বিমানবন্দরে অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্ট গান বসিয়ে রাখা হয়েছে। বুঝতে পারলাম পুরোপুরি যুদ্ধের একটা প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে পাঞ্জাবীরা। বাঙ্গালী জাতি নিরস্ত্র হলেও মানসিকভাবে তারা তখন সশস্ত্র। এয়ারপোর্টে কোন কুলি বা পোর্টার কাউকেই পাওয়া যায়নি। সমগ্র এয়ারপোর্টে মাত্র দু'চারজন লোক আছে। অসহযোগ চলছে তখন সারা বাংলায়। পশ্চিম পাকিস্তানে থাকা অবস্থাতেই অবশ্য পত্রিকা মারফত এসব জানতে পেরেছি। আমি এয়ারপোর্ট থেকে সোজা সদরঘাট চলে এলাম লঞ্চ ধরার জন্য। এর আগেই অবশ্য বাংলোদেশে চলমান ঘটনা ও বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি মোটামুটি অবগত মূলতঃ পত্রিকার মাধ্যমে। এছাড়া কোন বাঙালী অফিসার দেশ থেকে ছুটি কাটিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরলে তার সঙ্গে আলোচনা হতো। বাংলাদেশের উদ্ভূত

পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডিনার পার্টিতে উত্তপ্ত কথাবার্তা হতো। সে সময় জেনারেল আতিক পাকিস্তানের অফিসারদের সঙ্গে এসব ব্যাপার নিয়ে রীতিমতো ঝগড়া করতেন। এতে আমরা ভয় পেয়ে যেতাম। তিনি যেভাবে পাঞ্জাবীদের যা–তা বলে বকাবকি করতেন তাতে ভয় না পেয়ে উপায় ছিল না। তিনি বলতেন, বাঙালীরা যে আজ স্বাধিকার চাচ্ছে তার জন্যে তোমরা পাঞ্জাবীরাই দায়ী, তোমরা আমাদের দেশ লুণ্ঠন করেছো, তোমরা আমাদের দেশে নির্যাতন করেছো, তোমরা আমাদের ভাষার ওপর হামলা করেছো। তোমরা আমাদের মা–বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছো। তোমরা আমাদের কৃষ্টি, আমাদের সংস্কৃতির ওপর হামলা চালিয়েছো। আমাদের অর্থনীতি ধ্বংস করে দিয়েছো। এসব বলে তিনি পাঞ্জাবীদের সংগে খুব ঝগড়া করতেন। আমরা ভয় পেতাম। পাঞ্জাবীদের এভাবে খোলাখুলি সব বলে ফেললে তারা সব বুঝে ফেলবে। তখন আমাদের মেরে ফেলবে অথবা আমাদের কোর্ট মার্শাল করবে। আমি নিজেই বেশ কয়েকবার আতিক সাহেবকে দেখেছি এভাবে ঝগড়া করতে। তিনি বলতেন, বাঙালীরা যা করছে সেটা ন্যায্য। বাঙালীদের মধ্যে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে সেটা তাদের ন্যায্য অধিকার। এসব কথা পাঞ্জাবীদের মধ্যে বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতো। বাঙালীদের অসহযোগ আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ–এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম–এসব পাঞ্জাবীদের বেশ ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল বাঙ্গালীদের ওপর। সমস্ত পাঞ্জাবী অফিসার সে সময় আমাদের উপর আগের চেয়ে অনেক বেশি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেছিলো। অনেক বেশি রোষান্বিত এবং সমস্ত ঘটনার জন্য পাঞ্জাবীরা দায়ী করতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তারা বলতো শেখ মুজিব বিশ্বাসঘাতক এবং দেশদ্রোহী হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছে। বাঙালী অফিসার ছাড়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শতকরা একশজন অফিসারই এটা বিশ্বাস করতো। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের ভূমিকা, লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের ভূমিকা এসব পাকিস্তানীদের জন্যে ছিল প্রচন্ড অন্তর্জ্বালা। কেন বাঙালীরা কথা বলছে, কেন তারা অধিকার চাইছে, কেন তারা আন্দোলন করছে, কেন তারা বিদ্রোহ করছে, কেন ঢাকার রাজপথে কারফিউ ভঙ্গ হচ্ছে। বাঙালী জাতিকেতো বলা হয়েছে যে পাকিস্তান একটি ইসলামিক রাষ্ট্র– তারপরও কেন বাঙালীরা আবার বিদ্রোহ করবে এমন একটা ভাব। একটা প্রবাদ আছে না– ডিম পাড়ে হাঁস, খায় রমেশবাবু– অবস্থাটা ছিল সেরকম। পাঞ্জাবীদের ভাব ছিল এমন, বাঙালীরা খাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানীদেরটা। আবার বিদ্রোহ কেন? তোমাদের দুঃখ কিসের? অভিযোগ কিসের? আন্দোলন কিসের? কারফিউ ভাঙ্গা কিসের? আগরতলা ষড়যন্ত্র কিসের? ছয়দফা কিসের? শেখ মুজিবের ৭ ই মার্চের ভাষণ কিসের? এসব কিছু মিলিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গণ বেশ ঘোলাটে হয়ে উঠল। পাঞ্জাবীরা তখন একটা 'খেয়ে ফেলব' ভাব নিয়ে আমাদের দিকে তাকাতো। তার মধ্যে থেকে ২০ শে মার্চ সৌভাগ্যক্রমেই বলা যায় দেশে ফিরে আসার সুযোগ পেলাম। জেনারেল আতিক সাহেবের মতো সাহসী বাঙালী অফিসারের দৃঢ় ভূমিকার কারণে বাংলার মাটিতে পা রাখার সৌভাগ্য হলো। ঢাকায় পৌঁছে আত্মীয়–স্বজন কারো সঙ্গে দেখা না করেই সরাসরি চলে গেলাম সদরঘাটে। আমার চাচাত ভাই তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার বাসায় থাকতেন আমার আপন বড় ভাই। আমি সেখানেও গেলাম না দেখা করার জন্য। আমার মন শুধু ছুটে যাচ্ছে মা–বাবার কাছে আর আমার গ্রামে, সুন্দরবনের কাছে, আমাদের এলাকায় যেখানে গিয়ে আমাকে ভাবতে হবে, বুঝতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের। এজন্যেই যেন সবকিছু ভুলে দক্ষিণ বাংলার সুন্দরবনের সীমান্ত অঞ্চলগুলো হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকছে।

তখন ঢাকা থেকে দক্ষিণ বাংলাগামী লঞ্চগুলো এতো বড় ছিলো না। ছিলো দেড়তলা। নীচ তলা আর ওপরে ছোট আকারের একটা কেবিন। এখনতো স্বাধীন বাংলার শিল্পপতিরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত লঞ্চ বানিয়েছেন। শিল্পের বিকাশ হচ্ছে, যাত্রীরা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। তখন সেসব ছিল না। তখন যা ছিল সেটাকে আমরা বলতাম দেড়তলা লঞ্চ। ওপরের তলার কেবিনটাকে আবার বলতো ফার্স্টক্লাশ।। লঞ্চে উঠে তথাকথিত সেই ফার্স্ট ক্লাশে গিয়ে বসলাম। সেখানে পেয়ে গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রকে যাদের বাড়ি বরিশাল, পিরোজপুর, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা এসব অঞ্চলে। আর পেয়ে গেলাম আমার স্কুল জীবনের দু'-এক বছরের সিনিয়র নুরুদ্দিন ভাইকে। তিনি আবার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে একজন সক্রিয় কর্মী। এদেরকে পেয়ে আলোচনায় বসে গেলাম। ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলাম আপনারা কি করছেন? স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য আপনারা কি করছেন? তাদের উত্তর শুনে বোঝা গেল তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলেও পুরো বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞ। কেউ কিছু বলতে পারছে না সেরকম। কেউ কেউ বললেন আমরা রাইফেলের টেনিং নিয়েছি। কেউ বললেন যে আমরা বোমা বানাতে শিখেছি। কিন্তু আমি বুঝলাম যুদ্ধের কৌশল নিয়ে কারো মধ্যেই স্পষ্ট কোন ধারণা সৃষ্টি হয়নি। তখন আমি তাদেরকে বললাম যে, যুদ্ধটা একটা গেরিলা যুদ্ধের কৌশল নিয়ে আমাদের শুরু করতে হবে এবং গেরিলা কায়দায় আমাদের গ্রুপকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এছাড়া ভিন্ন কোন পন্থায় এগিয়ে গেলে আমাদের ভুল হবে। আপনারা চারজন/ছয়জনের ছোট ছোট গেরিলা গ্রুপ করে নিজেদের সংহত করবেন এবং শত্রুর ওপর হামলা চালাবেন। শত্রুর চলার পথে হামলা করতে হবে। অ্যামবুশ করতে হবে। শত্রুর অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে হবে। শত্রুর চলার পথ নষ্ট করে দিতে হবে। ব্রীজ, কালভার্ট এসব ধ্বংস করে দিতে হবে। যেসব রাস্তাঘাট শত্রু ব্যবহার করছে সেসব ধ্বংস করে দিতে হবে। যাতে তারা আর সেসব ব্যবহার করতে না পারে। যানবাহন ধ্বংস করতে হবে। শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করার প্রাথমিক পাঠগুলো তাদেরকে আমি দিলাম। এভাবেই সেই ২০ শে মার্চ '৭১-এর বিকেলবেলা লঞ্চের কেবিনে বসে ঢাকা ভার্সিটির কিছু ছাত্র এবং পিরোজপুরের সেই নুরুদ্দিন ভাইকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে আমার তৎপরতা শুরু হয়ে গেল।

পরদিন ২১ শে মার্চ বাড়ি গিয়ে হাজির। বাড়ির সবাই আমাকে দেখে আশ্চর্য। বাবা-মা বা অন্য কেউ জানতেন না যে, আমি বাড়ি আসছি। আচমকা আমাকে উপস্থিত দেখতে পেয়ে সবাই খুব খুশি। পুরো বাড়িতে বেশ আনন্দের একটা ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। তিন/চারদিন পার হলো এভাবেই।। এর মধ্যে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের আসা যাওয়া চলে। বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এসে দেখা করলেন আমার সঙ্গে। ওরা ওদের বিদ্রোহের পরিকল্পনা

নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করলো, কি করে বিদ্রোহ করা যায় ইত্যাদি। ২৫ শে মার্চ রাত্রে আমি এবং আমার বাল্যবন্ধু চার–পাঁচজন সবাই একঘরে ঘুমিয়ে আছি। আমি অনেকদিন পর বাড়ি ফেরার কারণে,বেশ উৎসব উৎসব একটা ভাব। বন্ধুরা আসছে, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। বাবা–মা খুশিতে বেশ টগবগে। বন্ধুদের সঙ্গে খেয়ে দেয়ে একসঙ্গে ঘুমিয়ে আছি। রাত তখন প্রায় দুটো। হঠাৎ মাইক্রোফোনের উচ্চ আওয়াজে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। মাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে? মা বললেন, বুঝতে পারছি না। তবে তোর বড় ভাইকে আওয়ামী লীগ অফিসে ডেকে নিয়ে গেছে।

আমার বড় ভাই সালাউদ্দিন আহমেদ ঢাকা আবার ভার্সিটির ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। ভাইকে ডেকে নিয়ে গেছে শোনার পর আমি আবার গিয়ে বিছানায় শুলাম। কিন্তু ঘুম আর হচ্ছে না। আর মাইকিং যিনি করছেন তিনিও আমাদের এই এলাকাটাই যেন বেছে নিয়েছেন। তিনি উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলছিলেন, 'ভাইসব আপনারা জাগুন। শত্রু আমাদের আক্রমণ করেছে। আপনাদের যার যা কিছু আছে– বন্দুক, খোন্তা, কুড়াল, রাইফেল, দা সব নিয়ে আপনারা থানার সামনে এসে জমায়েত হোন।'

ব্যাপারটা বুঝতে প্রথমে আমার একটু কষ্ট হলো। ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ' কি হয়েছে? এগুলো কি ঘোষণা দিচ্ছ?' তখন ঘোষণাদানকারীরা আমাকে জানাল যে, আমাদের তখনকার এমএনএ এডভোকেট এনায়েত হোসেন খান ছাত্রলীগ কর্মীদের এই ঘোষণা দিতে বলেছেন। ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা আব্দুল মালেক খান আবু নিজেই মাইকিং করছিল। আমি বললাম যে, ঘোষণাটা আরেকটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। কাগজ কলম নিয়ে আমি ঘোষণাটা লিখে দিলাম। আমি লিখলাম–'ঢাকার রাজপথে পাঞ্জাবীরা হামলা চালিয়েছে জনতার ওপরে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে পাঞ্জাবীদের লড়াই শুরু হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। কাজেই আপনারা সবাই স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন। আগামী দিন সকালে যাদের কাছে বন্দুক এবং আগ্নেয়াস্ত্র আছে তারা সেসব নিয়ে থানায় হাজির হবেন।' এটা লিখে দেয়ায় ছাত্রলীগের সেই কর্মী আমার কাছে শুনে আমার লেখা অনুযায়ী এভাবেই ঘোষণাটা দিল। এরপর আমি আবার বাসায় ফিরে গেলাম। সারারাত ধরে মাইকিং চললো। বলা যায় সমগ্র জনগণ যেন বিনিদ্র রাত যাপন করছে এমন একটা অবস্থা। আমিও ঘরে ফিরে ঠিক ঘুমোতে পারলাম না। ভোরে উঠে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের শরণাপন্ন হলাম। প্রথমেই গেলাম আমাদের স্থানীয় এম, এন, এ অর্থাৎ তৎকালীন পাকিস্তানের উচ্চ পরিষদের সদস্য এডভোকেট এনায়েত হোসেন খানের কাছে। তিনি আমার বাবার খুব ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন। পিরোজপুর আওয়ামী লীগের তৎকালীন সধারণ সম্পাদকও তিনিই। তাঁর বাসায় যাওয়ার পর প্রথমে চা নাস্তা খাওয়ার পর্ব। বহুদিন পর তাঁর সঙ্গে দেখা। ছাত্র রাজনীতির উত্তাল পর্বে এগারো দফা, ছয় দফা আন্দোলনের সময় তাঁর সঙ্গে পিরোজপুরের রাজপথে মিছিলে যোগ দিয়েছি। একত্রে মিটিং করেছি। বহু স্মৃতিই রয়েছে। অনেকদিন পর দেখা হওয়ায় প্রথমে কিছুক্ষণ বেশ অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় কাটলো। নাস্তা খাওয়ার পর মুল প্রসঙ্গে আলাপ করতে চাইলাম, যেভাবে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হলো, ঢাকার যে পরিস্থিতি, শোনা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে, শোনা যাচ্ছে ঢাকার রাজপথে বাঙালী জনতা এবং বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। সবমিলিয়ে অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে? স্বাধীনতা যুদ্ধের এই সময়ে আমরা কি করবো তাঁর কাছে জানতে চাইলাম। তার কাছে উপদেশ চাইলাম বাঙালী সৈনিক হিসেবে এখন আমরা কি করবো।

তিনি অনেক কিছু বললেন। কিন্তু বুঝতে পারলাম যে, ঠিক সিদ্ধান্তগত বিষয় তাদের কাছে ছিল না। তবে তিনি বললেন, 'অবশ্যই আজকে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে এবং এ কাজে বাঙালী সৈনিক ও অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার তো প্রয়োজন আছেই। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে বাঙালী সৈনিক, অফিসাররা অবশ্যই তাদের ভূমিকা রাখবেন। আমরা সেভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি এবং তোমাদেরকে আমরা আমাদের সঙ্গে চাই।' আমি যতোটা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত চেয়েছি ঠিক ততোটা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত তিনি দিতে পারলেন না। আমার মনে হয় শুধু পিরোজপুরেই নয়, সারা দেশেই সিদ্ধান্তহীনতার সৃষ্টি হয়েছে প্রাথমিক অবস্থায়। এই সিদ্ধান্তহীনতা মুক্তিকামী জনসাধারণকে বেশ বিপদেই ফেলেছে। তবুও স্থানীয় পর্যায়ে, আমি যতোটা জানি, বরিশাল, পিরোজপুর ঝালকাঠি, বরগুনা, বাগেরহাট, খুলনা এসব অঞ্চলগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিগুলো ২৫ তারিখ রাত এবং ২৬ তারিখের মধ্যেই স্বাধীনতা যুদ্ধের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এবং নিজ নিজ সংগঠনকে সেভাবে প্রস্তুতও রেখেছে। এসব সংগঠনের মধ্যে ছিল আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ, ভাসানী ন্যাপ এবং কমিউনিস্ট পার্টি। এখানে পিরোজপুরের তৎকালীন রাজনীতি এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তির মধ্যে যাদের যাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাদের সম্পর্কে কিছু বলে নেয়া প্রয়োজন। আমি প্রায় দু'বছর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান করার পর দেশে ফিরেছি। বলা যায় ২৬ তারিখ সকালবেলা পিরোজপুরের রাজনীতিতে নতুন করে প্রবেশ করলাম। দু'বছর আগে ১১ দফা, ৬ দফা আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় ছিলাম। দু'বছরের ব্যবধানে পিরোজপুরের রাজনীতিতে যারা নেতৃত্বে এসেছেন, যারা সক্রিয়, যারা একটিভিস্ট হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাদের মধ্যে মূলতঃ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বেশ কিছু রদবদল হয়েছে। ওঠে এসেছে বেশ কিছু নতুন মুখ। অন্যান্য পার্টিতেও নেতৃত্ব ও অন্যান্য অবস্থানে তাদের মেরুকরণ চলছে। এ সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার।

পিরোজপুরের আওয়ামী লীগ আমার বাবা এডভোকেট আফতাবউদ্দিন আহমেদ, এডভোকেট জয়নাল আবেদীন, এডভোকেট এনায়েত হোসেন খান, এমনকি এঁদেরও একটু সিনিয়র সোবহান মোক্তার সাহেবের হাতে গড়া বলা চলে। এদের নেতৃত্বেই আওয়ামী মুসলিম লীগের সৃষ্টি। সেখান থেকে আওয়ামী লীগের সৃষ্টি। বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালী জাতির ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, স্বাধীনতা, স্বাধিকার- ইত্যাদি রক্ষার জন্য আন্দোলনের যে স্রোত ছিল স্থানীয় পর্যায়ে সেটার ভ্রূণ তারাই সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। সোবহান মোক্তার সাহেব আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। আমার বাবা, এডভোকেট জয়নাল আবেদীন এবং সোবহান মোক্তার-এই তিনজনকেই পিরোজপুর আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বলা যায়। বস্তুত একাত্তুরে এসে এডভোকেট এনায়েত হোসেন খান দক্ষিণ অঞ্চলে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেও এবং মেম্বার অব ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী হলেও তিনি বয়সে ছিলেন তুলনামূলকভাবে তরুণ। এ অঞ্চলের আওয়ামী লীগে তিনি সক্রিয়ভাবে যোগ দেন ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। সে কারণেই তাঁকে ঠিক আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বলা না গেলেও যুদ্ধ শুরুর পর্বে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব তাঁকে কেন্দ্র করেই সচল ছিলো। আমার বাবা তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। জয়নাল আবেদীন সাহেবও বেশ বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছেন। (তিনি অবশ্য একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজসেবী হিসেবে পিরোজপুরের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন এবং এখনো তাঁর সেই সুনাম রয়েছে)। সোবহান মোক্তার সাহেব মৃত্যুবরণ করেছেন চৌদ্দ কি পনের বছর আগে। আরো ছিলেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের চাচা এডভোকেট মকবুল হোসেন। মোটামুটি এই চার-পাঁচজনই ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতৃত্ব হিসেবে। পিরোজপুরের বিভিন্ন সামাজিক ব্যাপারেও

এরাই নেতৃত্ব দিতেন। তখন পিরোজপুরের এমপিএ অর্থাৎ মেম্বার অব প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলী ছিলেন জনাব নুরুল ইসলাম ভান্ডারী, মঠবাড়িয়ার এমপিএ শওগাতুল ইসলাম সগীর, স্বরূপকাঠি বানারীপাড়া অঞ্চলের এমপিএ ছিলেন ডাক্তার মাজহার। এমপিএদের মধ্যে আরো ছিলেন ডাঃ ক্ষিতিশ চন্দ্র মন্ডল এবং ডাঃ আবদুল হাই। আর এমএনএ ছিলেন আমাদের এনায়েত সাহেব। '৭১-এর ২৬ শে মার্চ যে আওয়ামী লীগকে আমি পেয়েছি পিরোজপুরে সেই আওয়ামী লীগের রয়েছে বিরাট-বিশাল কর্মীবাহিনী। সে আওয়ামী লীগে তরুণ-প্রবীণ অনেক নেতৃত্বের সমাহার। অথচ ঠিক দু'বছর আগে যখন আমরা ৬ দফা, ১১ দফা আন্দোলন করেছিলাম তখন আওয়ামী লীগ পিরোজপুর অঞ্চলে ছোট্ট একটি ভ্রূণাত্মক সংগঠন। যাহোক, দু'বছরের মধ্যেই আওয়ামী লীগ আকারে, সাংগঠনিক বিস্তৃতিতে বিশাল আকার ধারণ করে ফেলে।

আমি যখন এনায়েত সাহেবের বাসা থেকে ফিরে আসি তখন আমার মানসিক অবস্থা খুব একটা সন্তোষজনক পর্যায়ে নয়। কারণ আমার মনে হচ্ছে হয়তো এরই মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব যুদ্ধের প্রস্তুতিটা নিয়ে ফেলেছে। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছি আমার ভাবনা অমূলক। তাদের সেরকম প্রস্তুতি নেই। প্রস্তুতি নেয়া সম্ভবও হয়নি। ২৬ শে মার্চের পর থেকে তারা সক্রিয় হলেন। আমি বাসায় ফিরে এলাম একটু ভারাক্রান্ত মনে। চিন্তিতও। ভাবছি পাঞ্জাবীদের এই আক্রমণের মুখে আমরা কি করতে পারি। ২৬ তারিখ দুপুর বেলা তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতৃবৃন্দ এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। পিরোজপুরে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপ এবং ভাসানী ন্যাপের মোটামুটি জোরালো একটা ভিত্তি ছিল। খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, নাজিরপুর, মাটিভাঙ্গা অঞ্চলে বেশ ভাল একটা সংগঠন গড়ে উঠেছে। এই সংগঠনের মধ্যে মেনন গ্রুপের রাজনৈতিক প্রভাব বেশ জোরালোভাবেই ছিলো। এবং এই গ্রুপের মূল শক্তিটা ছিল তরুণ এবং ছাত্রদের মধ্যে। এদের মধ্যে আবার প্রভাব ছিল পশ্চিম বাংলার নকশালবাড়ি আন্দোলনের। নকশালবাড়ি কায়দায় নিজেদেরকে সশস্ত্র করা এবং একাত্তুরের যুদ্ধকে শ্রেণীযুদ্ধে পরিণত করার একটা মানসিকতা এদের ভেতর কাজ করতো। এ অঞ্চলে মেনন গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন শহীদুল আলম নীরু, আবুল কালাম মহিউদ্দিন, লুৎফুল কবির দুলাল, ওবায়দুল কবির বাদল, নুর দিদা খালেদ রবি, শহীদ ফজলুল হক ফজলু প্রমুখ। এরা বেশ সক্রিয়। নিবেদিত। আত্মত্যাগী মনোভাবের এই নেতারা প্রস্তুত একটা তুমুল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জন্য।

মোজাফফর ন্যাপের সংগঠনও এ অঞ্চলে বেশ ভাল প্রভাব রাখতো। মোজাফফর ন্যাপের নেতাদের মধ্যে প্রয়াত বাবু নীরোদ নাগের কথা উল্লেখ করতেই হয়। '৫২ -এর ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন পর পর দু'বার। ভাষা আন্দোলনে তাঁর যথেষ্ঠ সক্রিয় ভূমিকা ছিল। পরবর্তীতে তিনি পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং বেশ জোরালো কণ্ঠে তিনি বিরোধী ভূমিকা পালন করেছেন। নীরোদনাগ বাবু আমাদের এ অঞ্চলের রাজনীতির একজন আদর্শ পুরুষ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্জন শেষে গ্রামে ফিরে গেলেন স্কুলে মাষ্টারী করার জন্যে এবং সেখানে রাজনৈতিক কর্মী সৃষ্টি করার একটা কর্মপদ্ধতি তিনি চালু করলেন। এরই ফলশ্রুতিতে সমগ্র পিরোজপুর-বাগেরহাট অঞ্চল জুড়ে মোজাফফর ন্যাপেরও একটা ভাল প্রভাব তৈরী হয়েছে। যুদ্ধের শুরুতে পিরোজপুরে ছিলেন বর্তমানে মোজাফফর ন্যাপের একজন কেন্দ্রীয় নেতা আলী হায়দার খান। তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রনেতা হিসেবে তিনি তখন প্রসিদ্ধ। এছাড়া মোজাফফর ন্যাপ এবং কমিউনিষ্ট পার্টির (যেটাকে তখন আমরা রুশপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টি বলতাম) এডভোকেট এম, এ, মান্নান,

এডভোকেট এম, এ, মান্নান, প্রতুল ব্রহ্ম–এ ধরনের কয়েকজন নেতারও সরব উপস্থিতি পিরোজপুরে সে সময় ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় শক্তি হিসেবে। তৎকালীন ভাসানী ন্যাপ নেতা শহীদুল আলম নীরু যদিও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে খুবই সক্রিয় ছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যুদ্ধের পুরো সময়টা তাকে জেলখানায় কাটাতে হয়। খুলনায় শ্রমিক আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি ধরা পড়েন। এছাড়া অন্যান্য যাদের কথা বলেছি তারা সবাই মোটামুটি উপস্থিত ছিলেন যুদ্ধের ময়দানে। তরুণ–প্রবীণদের মধ্যে আসম সিদ্দিক, হামিদুর রহমান শিকদার বা হামদু শিকদার, শফিজউদ্দিন আহমেদ (আমরা যাকে শফি চাচা বলে জানি) তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক ছিলেন, হেমায়েত উদ্দিন সাহেব–এরাও বেশ সক্রিয় ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। আওয়ামী ছাত্রলীগের নেতাদের মধ্যে আমারই সহপাঠী বন্ধু পরবর্তীতে শহীদ ওমর ফারুক ছিলেন যুব তরুণদের চালিকা শক্তি।

তবে এসব সংগঠনের প্রায় প্রতিটির মধ্যেই একাধিক গ্রুপের অস্তিত্ব ছিল। ভাসানী ন্যাপের তরুণ কর্মীদের মধ্যে নকশালপন্থী যে দুটি গ্রুপ ছিলো তাদের কথা এখানে বলা প্রয়োজন। কারণ স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে অত্যন্ত দ্রুত যেসব ঘটনা পিরোজপুরের বুকে ঘটে গিয়েছিল সেগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে এরা জড়িত। একটি গ্রুপের নেতৃত্বে ছিল শহীদ ফজলুল হক ফজলু। আর একটি গ্রুপের নেতৃত্ব ছিল ওবায়দুল কবির বাদল এবং নূর দিদা খালেদ রবি। যদিও এরা ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের সঙ্গেই যুক্ত তবে ওদের মধ্যে খুব বড় ব্যবধান ছিল কৌশলগত রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা, জীবন যাপন পদ্ধতি, উগ্র অতি উগ্র রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে। এদের ভেতরে পারস্পরিক সংঘাতময় একটা পরিস্থিতি বিরাজ করতো। আমি নিজে মেনন গ্রুপের রাজনীতি করতাম পাকিস্তান যাওয়ার আগে। তখন অবশ্য এই গ্রুপিংটা এতো স্পষ্ট হয়নি। যুদ্ধের শুরুতে এসে ওদের ব্যবধানটা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

২৬ শে মার্চ দুপুরে মেনন গ্রুপের দুটো অংশই এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলো। দুপুরবেলা আমাদের বাড়ির পেছনে অবস্থিত একটা পোড়োবাড়িতে এসে ফজলু গ্রুপ, তারপরে বাদল রবিদের গ্রুপ আমার সঙ্গে কথা বললো। এই দুই গ্রুপের মধ্যে ফজলু গ্রুপ আবার একটু অতিরিক্ত উগ্র বিপ্লবী ধারায় বিশ্বাসী ছিল। এরা এসে সশস্ত্র অবস্থান এবং যে যুদ্ধটা শুরু হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে আলাপ করতে চাইলে আমি এদেরকে মূল রণনৈতিক যে বিষয়টি বলেছি সেটা হলো–গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাহিনী গড়ে তোলা। মুক্তিযুদ্ধে এর কোন বিকল্প নেই। বিকল্প খুঁজে পাওয়া সম্ভবও হবে না। আমি তাদের সঙ্গে একমত হলাম যে আন্দোলনের চরম মুহূর্ত উপস্থিত এবং সশস্ত্র আন্দোলনের সময় এসে গেছে। এদের মধ্যে দু'গ্রুপই আমার সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে কথা বললো এবং দু'গ্রুপের পক্ষ থেকেই তাদের সঙ্গে যেন আমার ভাল সম্পর্ক থাকে সেই আহবান রাখা হলো। কিন্তু আমি সতর্কভাবে তাদের এই আহবানটাকে পাশ কাটিয়ে গেলাম। তবে আমরা একমত যে সশস্ত্র লড়াইয়ের সময় এসে গেছে। এখন প্রস্তুতি দরকার।

এদের মধ্যে কেউ কেউ বললো যে, আওয়ামী লীগ থানা এবং ট্রেজারীর অস্ত্র নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিযে যাবে। এখন আমাদের কর্তব্য কি? আমি বললাম যে, তোমরা যে সব অস্ত্র নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারবে সেগুলো তোমাদের নিয়ে নেয়া উচিত। এরকম আলোচনার মধ্য দিয়ে ওদের সঙ্গে সেদিনের আলাপ পর্বটা শেষ হলো। বিকেলবেলায় আওয়ামী লীগের জনসভা ছিল। ঐ জনসভা থেকে গিয়ে জনতা ট্রেজারীর অস্ত্র ছিনিয়ে নিলো। থানার অস্ত্রও ছিনিয়ে নিলো। ট্রেজারীর অস্ত্রগুলো আওয়ামী লীগসহ প্রায় সকল সংগঠনের কর্মীদের কাছেই গেল। আমার কাছে যখন প্রথম অস্ত্রটি এলো তখন আমি বাড়ির উঠানে

বসা। বাবা–মা– আমি–মেজোভাবী–সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছি। বাড়ির ছেলে অনেকদিন পরে বাড়ি ফিরে এসেছে। মা পিঠা তৈরী করলেন, ভাবী একটু ভাল পুডিং আর কেক তৈরী করেছেন–এমন একটা মধুর আদর আপ্যায়নের অবস্থা। এর মধ্যে বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক রিক্সাওয়ালা আমাকে খবর দিয়ে গেল। রিকশা চালিয়ে যাওয়ার সময় সে চিৎকার করে বলে গেল, 'জিয়া ভাই, ট্রেজারী লুট হয়ে গেছে। অস্ত্র সব লুট হয়ে গেছে।' আমি একটু বিস্মিত হলাম। এইতো দুপুরেই ফজলু রবিদের সঙ্গে আলাপে এমন একটা আশংকাই করা হয়েছে। বিকেল না গড়াতেই জনতা কর্তৃক ট্রেজারীর অস্ত্র লুট হয়ে গেল? অবাক হওয়ার মতোই ব্যাপার। আমি ঝট করে উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার থেকে। আমার এই উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্যেই এমন একটা কিছু ছিল যে বাবা–মা বুঝলেন আমার মন ভিন্নভাবে কিছু ভাবছে এবং তৈরী হচ্ছে। তারা আমাকে বসিয়ে খুব বোঝালেন। 'দেখো তুমি সামরিক অফিসার। তোমার একটা সুন্দর কেরিয়ার আছে। তোমার এসবের মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না।' আমি বসে বসে বাবা–মার উপদেশ শুনছি ঠিকই; কিন্তু উপদেশসমূহ আসলে এক কান দিয়ে ঢুকছে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি তখন বিদ্রোহের জন্য সম্পূর্ণভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছি। বাবা মা আমাকে বুঝিয়ে যাচ্ছেন। আমি চুপ করে বসা। এমন সময় আমাদের পড়শি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মোদাচ্ছের, সে একটা রাইফেল কাঁধে নিয়ে, একটা স্টীল হ্যালমেট মাথায় দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদের বাড়ির পিছন থেকে উঠানে এসে হাজির হয়ে গেল। সে হাঁপাচ্ছে আর বলছে, 'জিয়া ভাই, রাইফেল নিয়া আইছি।' যেন সে খুব একটা গৌরবের কাজ করে এসেছে। বাবা তার ওপর খুব অসন্তুষ্ট হলেন। 'রাইফেল নিয়ে একরম খোলামেলা ভাবে যদি চলাফেরা করো তাহলে তো আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবে।' এই কথা শুনে মোদাচ্ছের একটু অসন্তুষ্ট বাবার ওপর। সে বলল, 'চাচা, আপনারাই তো আওয়ামী লীগ করতে বলছেন।' এরকম কথাবার্তা যখন হচ্ছে তখন আমি উঠে মোদাচ্ছেরের কাছে চলে গেলাম। মোদাচ্ছেরকে গিয়ে ধরলাম। 'তুমি এই রাইফেল আনলা কি কইরা?' ও বললো, 'সবাই নিয়া যায়। আমি মনে করলাম একটা নিয়া জিয়া ভাইয়ের কাছে চইলা যামু–আপনে কিছু করতে পারবেন।' মোদাচ্ছেরের সঙ্গে কথা বলছি এর মধ্যে মা পেছন থেকে আমাকে ডাকলেন। 'বাবা জিয়া তোমাকে না একটু আগে বুঝিয়ে বললাম যে, তুমি এইসবের মধ্যে ঢুকো না। তুমি এইসবের মধ্যে যেয়ো না।' তখন আমি মা'কে মোটামুটি নাটকীয়ভাবেই উত্তর দিলাম, 'মা, যে দেশের সাধারণ মানুষ ট্রেজারী এবং থানা থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে আসে সে দেশকে নিয়ে আগের মতো ভাবনা ভাবলে আর হবে না। এদেশে গ্রামে গ্রামে যুদ্ধ হবে। তারপর এদেশ স্বাধীন হবে। মুক্ত হবে। এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন আর আমাকে বাধা দিবেন না।'

মা আমার এই কথাটা শুনে এর মর্মটা বুঝলেন এবং এর পরে পরবর্তী নয় মাসে তিনি আমাকে কোন ব্যাপারেই বাধা দেননি।

মোদাচ্ছেরের আনা রাইফেলটা নিয়ে আমি আর মোদাচ্ছের চলে গেলাম আমাদের বাড়ীর পেছনে সেই পোড়ো বাড়ীটাতে। উদ্দেশ্য রাইফেলটা লুকিয়ে রাখা। আমাদের বাড়ী থেকে খুব বেশি হলে একশ কি সোয়া'শ গজ দূরেই সেই পোড়ো বাড়ীটার অবস্থান। ভূতুড়ে বাড়ী হিসেবে ওটা পরিচিত। ওখানে কয়েকজন বৈরাগী থাকতেন। এই বৈরাগীরা এক সময় ভারতে চলে যান। তারপর থেকেই সেটা পরিত্যক্ত। অবশ্য আমরা ওটাকে বৈরাগী বাড়ী বলেই জানতাম।

বাড়ীটাতে গিয়ে মোদাচ্ছেরকে বললাম, তোমার রাইফেলটা দাও। ওর কাছ থেকে নিয়ে কয়েকটা কলাগাছের মাঝখানে রাইফেলটা আমি লুকিয়ে রাখলাম। হেলমেটটা মাটিতে রেখে পাতাটাতা দিয়ে ঢেকে দিলাম। মোদাচ্ছেরকে বললাম, 'ভাল করে ঢেকে দাও যাতে কেউ দেখতে না পায়।' তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে প্রায়। ঢেকে রাখার কাজ শেষে মোদাচ্ছেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'গুলী কোথায়?' মোদাচ্ছের বললো, 'জিয়া ভাই, গুলীতো আনি নাই।' ব্যাপারটাতে আমার খুব হাসি পেয়ে গেল। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'গুলী আনলি না তো রাইফেল এনে কি হবে?' এই কথা যখন বলছি তখন হঠাৎ করে মোদাচ্ছের বসে পড়ে আমার দুই পা জড়িয়ে ধরলো। বললো, 'জিয়া ভাই, আমারতো ছেলে-মেয়ে আছে। আপনি এই যুদ্ধে আমাদের সঙ্গে থাকবেন তো?' আমি তখন ওর কাঁধে ঝাকুনী দিয়ে ওকে দাঁড় করালাম। বললাম, 'বিশ্বাস হয় না?' ও বললো, ' হ্যাঁ, আপনার ওপর বিশ্বাস আছে বলেই তো আপনার কাছে আসছি। কিন্তু আপনি থাকবেন তো আমাদের সাথে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, অবশ্যই থাকবো। চিন্তা কইরো না। এখন গুলী আনতে পারবা?' মোদাচ্ছেরতো প্রায় লাফিয়ে উঠল। 'আপনি কইলে পারমু না মানে?' এই বলে সে আবার দে ছুট। ট্রেজারীর দিকে চলে গেল গুলী আনার জন্য। আমি বসে বসে রাইফেলটা পাহারা দিচ্ছি। টর্চলাইট হাতে। এর মধ্যে হঠাৎ করে খেয়াল হলো আমাদের বাড়ীতে খুব গন্ডগোল হচ্ছে-চিৎকার, ধমক, বকাবকি-সব মিলিয়ে একটা হৈ-চৈ শোনা যাচ্ছে। আমি তখন আমাদের বাড়ী এবং বৈরাগী বাড়ীর মাঝখানে যে শুকনো ধানের মাঠ সে মাঠে হাঁটছি। বাড়ীর মধ্যে গন্ডগোল হচ্ছে বুঝতে পেরে ভাবলাম রাইফেলটা পাহারা দেয়ার চাইতে আপাততঃ গৃহযুদ্ধ সামলানোই বড় দায়িত্ব। নিজের ঘরের মধ্যে কি হচ্ছে দেখে আসি। দৌড়ে বাড়ীতে গিয়ে দেখি আজব কান্ড! ছোট ভাই কামাল (পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের একজন কমান্ডার) তার লুঙ্গি খুলে সেই লুঙ্গি ভর্তি করেছে রাইফেলের বুলেটে এবং সেটা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে শুধু আন্ডার ওয়্যার। সঙ্গে তার কয়েক বন্ধু। তাদেরও কারো কারো লুঙ্গি খোলা এবং সেগুলোতে গুলী ভর্তি। কয়েকজনের কাঁধে বারো/চৌদ্দটা রাইফেল। আমার মেজোভাই এবং আব্বা তো মহাক্ষিপ্ত। ভাবটা এমন-হারামজাদা তুমি কেন এর মধ্যে? এসব কি হচ্ছে। এটা নিয়েই

যাবতীয় গোলমাল। কামালের ওপর অভিভাবক পক্ষের খুব হম্বিতম্বি চলছে। আমি গিয়ে বললাম, 'কামাল যেটা করছে সেটা ঠিকই করছে। আজকে সারা দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কাজেই কামাল ভুল করেনি।' আমার কথা শুনে আব্বা–আম্মা চুপ মেরে গেলেন। আমি কামাল আর তার বন্ধুদের নিয়ে ঐ সেই বৈরাগী বাড়ীতে চলে এলাম। বৈরাগী বাড়ীতে এসেই তাৎক্ষণিকভাবে আলোটালো যোগাড় করে, তাঁবু যোগাড় করে ওখানেই প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়ে গেলো। এখান থেকেই শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ পর্ব।

পরের দিন, ২৭ শে মার্চ আমি সকাল বেলা শহরে গেলাম। আমার মনে একটু একটু ভয় আছে, আমি যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন সদস্য হয়েও মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ছি এটার ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিটা কি রকম। এ সম্পর্কে তখনও খুব একটা পরিষ্কার ধারণা ছিল না। যেহেতু দু'বছর আমি দেশে ছিলাম না। এ কারণেই একটু শহরে ঘুরতে বেরোলাম। দেখি সবাই জানে কিনা যে আমি এরই মধ্যে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছি। আমাদের কাছে চৌদ্দ–পনেরোটা রাইফেল এসে গেছে। আমরা ট্রেনিং দেয়া শুরু করেছি। এসব লোকে জানে কিনা সেটা জানার আগ্রহ মনের মধ্যে কাজ করছে। ঘুরে বিভিন্নজনের সঙ্গে আলাপ করে বুঝলাম যে না, তেমন কেউ জানে না যে আমি যুদ্ধের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছি।

অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। ছোট শহর। মোটামুটি সবাই সবার পরিচিত। আমার বন্ধুরাও সব রাজধানী ছেড়ে চলে এসেছে পিরোজপুরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা যাদের বাড়ী পিরোজপুর তারা সবাই ফিরে এসেছে। অনেকের সঙ্গেই দেখা হলো। হোটেলে বসে সবাই মিলে চা টা খাওয়া হচ্ছে। তখন সকাল সাড়ে দশটা কি এগারোটার মতো বাজে। তখন পিরোজপুরের সদর রোড যেটা ছিলো, এখন যেটা শহীদ ওমর ফারুক সড়ক, সেই ওমর ফারুক সড়কের পাশে আমাদের ঘনিষ্ঠ একজন ব্যবসায়ীর একটি দোকান ছিল–তাজ ষ্টোর। ঐ তাজ ষ্টোরে বসে আমরা চা খাচ্ছি। এর মধ্যে রাস্তা দিয়ে আওয়ামী লীগের একটা মাইকিং যাচ্ছে। তাদের ওয়ার্কিং কমিটি কিম্বা ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভার ব্যাপারে সম্ভবতঃ ঘোষণা দেয়া হচ্ছিল। হঠাৎ চা খেতে খেতেই মনে হলো, আমার কিছু বলা দরকার। আমার এখন আর গোপন থাকার সময় নেই। স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যেই কিছু কাজ করা উচিত। তাজ ষ্টোর থেকে উঠে রাস্তায় দিকে এসে ঐ রিকশাটিকে থামতে বললাম যেটা দিয়ে মাইকিং করা হচ্ছে। রিকশা থামল। ছাত্রলীগের একজন নেতা মাইকিং করছিলেন। সেই নেতাকে বললাম 'এখন তোমাদের এই ঘোষণা হবে না। এখন আমি যা বলবো সেটা বলতে হবে।' ছেলেটি বললো, 'হ্যাঁ জিয়া ভাই, কি বলবেন?' আমি বললাম, 'তুমি লেখো, আমি বলছি।' সে লেখার প্রস্তুতি নেয়ার পর আমি বললাম, 'স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে, লেফটেন্যান্ট জিয়াউদ্দিন মুক্তিফৌজ গঠনের উদ্দেশ্যে আজ বিকেলে সরকারী স্কুল ময়দানে এক গণসমাবেশের আহবান জানাচ্ছে এবং গতকাল ট্রেজারী ও থানার অস্ত্র যারা পেয়েছেন তারা তাদের অস্ত্র নিয়ে সেখানে হাজির হবেন।' এটা লিখে নেয়ার পরে ছাত্রলীগের সেই নেতা তার নির্ধারিত ঘোষণা বাদ দিয়ে এটাই এনাউন্স করতে শুরু করলো। আমার আশেপাশে বন্ধু–বান্ধব যারা ছিল তারা বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল হঠাৎ করে আমি এইভাবে সিদ্ধান্তটা দেয়ায়। ছাত্রলীগের নেতা মাইকিং করে বেড়াচ্ছে, আমরা তখনও তাজ ষ্টোরে বসা। এর মধ্যেই পনেরো বিশ জন সেনাবাহিনীর লোক এসে আমার সঙ্গে দেখা করলো তাজ ষ্টোরেই। এসে স্যালুট করে দাঁড়াল অ্যাটেনশন ভঙ্গিতে। বললো, 'স্যার আপনি মুক্তিফৌজ গঠন করবেন। আমরা আপনার সাথে আছি।' আমি সবাইকে স্বাগত জানালাম। কিন্তু পাশাপাশি একটা কূটবুদ্ধিও খেললাম। আমি বুঝলাম এখন যে

পনেরো বিশজন সৈনিককে আমার সঙ্গে পাচ্ছি এরা বিভিন্ন পদমর্যাদার সিপাহী, ল্যান্সনায়েক, হাবিলদার, সুবেদার এরকম। আমার মনে হলো এদেরকে আর বাড়ীতে ফিরতে দেয়া ঠিক হবে না। বাড়ীতে গেলে বাবা মা স্ত্রী ভাইবোন আবার এদের মন পাল্টে ফেলবে। হয়তো আর মুক্তিফৌজে যোগ দিতে আসবেনা। আমি তাদেরকে আমার পকেট থেকে দুইশ' কি তিনশ' টাকা বের করে দিলাম। বললাম, 'আপনারা দুপুরে শহরেই একটা হোটেলে খান। খাওয়া দাওয়া করে আপনারা সরকারী স্কুলে গিয়ে বসেন।' তারা আমার কথা শুনল। টাকা নিয়ে খাওয়া –দাওয়া করে সরকারী স্কুলে গিয়ে সভার আয়োজন করতে থাকল– চেয়ার টেবিল ঠিকঠাক করা এইসব।
আমি বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে সরকারী স্কুল ময়দানে হাজির হলাম। সেখানে হাজার হাজার তরুণ ইতিমধ্যেই জমায়েত হয়েছে। হাজার হাজার লোক সমবেত। প্রায় সোয়া দুইশ রাইফেল জমা দেয়া হলো আমার কাছে। অবশ্য জনতার হাতে রাইফেল চলে গিয়েছিল প্রায় চারশ'। তার মধ্যে সোয়া দুইশ' জমা হলো আর আমার কাছে ছিল পনেরোটার মতো–এই দু'শ চল্লিশটা রাইফেল আমরা পেলাম। উৎসাহী যুবক হাজার হাজার। তারা মুক্তিফৌজে যোগ দেবে। এখন আমি তাদেরকে না বলতেও পারছি না আবার হ্যাঁ বলতেও পারছি না। কারণ হাজার হাজার লোক রিক্রুটিং করে এদের পরিচালনা, এদের ভরণ পোষণ, এদের খরচ টরচ–এগুলো কোথেকে আসেব তাও আমি ঠিক জানি না। তখন একটা কৌশল অবলম্বন করলাম যে, মাপ দিতে হবে। উচ্চতা, বুকের ছাতি, এসবের মাপ লাগবে। অবশ্য আমি নিজেই জানি, মুক্তিফৌজের জন্য এটা দরকার হয় না। কিন্তু এখন কয়েক হাজার লোক আমি রিক্রুট করে ফেলব, সন্ধ্যা থেকেই এদেরকে খাবার দিতে হবে অথচ আমার কাছে সে রকম টাকা পয়সাও নেই। তখন এরকম একটা বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে মোটামুটি চৌদ্দশ ছেলে আমরা নিলাম। চৌদ্দ'শর মধ্যে আবার দু'শ কি সোয়া দু'শ লোক সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী কিংবা আনসার বাহিনীর সক্রিয় সদস্য। বাকীরা অধিকাংশ ছাত্র, ছোট ব্যবসায়ী এবং শ্রমিক। রিক্রুটমেন্টের পরে কোম্পানী ফরমেশন দেয়া হলো, প্লাটুন ফরমেশন দেয়া হলো। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের এমএনএ এনায়েত হোসেন খান ফোন করলেন সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অফিসে। আমার সঙ্গে কথা হলো। আমাকে খুব উৎসাহ দিলেন। আমাকে অভিনন্দন জানালেন এরকম একটা কাজ করার উদ্যোগ নেয়ায়। তিনি বললেন, 'আমি তোমার এখানে আসতে চাই। দেখতে চাই তুমি কেমনভাবে মুক্তিফৌজ গড়ে তুলছো।' আমি বললাম, 'আপনাকে আমি স্বাগত জানাই।'
কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এলেন। তার সঙ্গে আসম সিদ্দিক, শফিজউদ্দিন আহমেদ, হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ, ওমর ফারুক এরাও এলেন। এনায়েত হোসেন খান সাহেব একজন এমএনএ এবং আমরা সদ্য মুক্তিফৌজ গঠন করেছি। আমাদের মুক্তিফৌজ তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করলো। তারপর তিনি তাঁর বক্তৃতায় সকল মুক্তিযোদ্ধাকে স্বাগত জানালেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য দেওয়ারও অঙ্গীকার করলেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর এই অঙ্গীকার সাধ্যমতো রক্ষা করেছেন। এরই মধ্যে তাঁরা স্থানীয়ভাবে একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠন করেছেন যেখানে এনায়েত হোসেন খান হলেন প্রধান ব্যক্তি। বাকিরা আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ, ভাসানী ন্যাপের নেতৃবৃন্দ এবং আমিসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মোটামুটি একাত্ম হয়েই এই সরকারের পক্ষে কাজ করেছি।
২৭ মার্চ রাতেই আমরা চট্টগ্রাম বেতার থেকে জিয়াউর রহমান সাহেবের ঘোষণা শুনলাম। 'অন বিহাফ অব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আই হিয়ার বাই ডিক্লেয়ারড দ্য ইন্ডিপেনডেন্স অব বাংলাদেশ এন্ড আই হিয়ারবাই প্রোক্লেইম অন বিহাফ অব আওয়ার গ্রেট

লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টু বি দ্য গভর্নর অব দ্য প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ। আই গিভ এ কল টু দ্য ওয়ার্ল্ড কম্যুনিটি টু রিকগনাইজ দিস নিউ গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ। জয় বাংলা' (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং আমি আরো জানাচ্ছি যে আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সরকার প্রধান। আমি বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আপনারা বাংলাদেশের এই নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিন।) এইভাবে তিনি তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন–এটা আমরা শুনলাম। কিন্তু অল্প পরেই আবার সেটা বন্ধ হয়ে গেলো। আমরা বুঝতে পারলাম বেতার কেন্দ্র আমাদের খুব সক্রিয় দখলে নেই। যাহোক জিয়াউর রহমান সাহেবের ঘোষণা শুনে আমরা আরো উৎসাহ পেলাম। বুঝতে পারলাম বাংলাদেশের সৈনিকরা তাদের ভূমিকা পালন করছে। তারা বঙ্গবন্ধু এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এই মুহূর্তে সঠিক পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেলো। খুব কঠিন এবং সুশৃংখল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলাম মুক্তিবাহিনীর জন্য। কারণ আমি বিশ্বাস করতাম, সুশৃংখল এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী না হলে তারা আসলে মাঠে ভাল যোদ্ধা হতে পারে না। এই বিশ্বাস আমার ছোটবেলা থেকেই। সে কারণেই সব সময়ই নিজস্ব জীবন এবং পারিবারিক জীবনে আমার শৃংখলাবোধ ছিল প্রবল। সবসময় যে এই শৃংখলা আমি রক্ষা করতে পেরেছি এমন দাবী করবো না। কিন্তু আমার চিন্তা চেতনার গভীরে প্রোথিত ছিল শৃংখলাবোধ। সুশৃংখল না হলে, একটা আত্মশৃংখলার মধ্যে না থাকলে ভাল কিছু করা যায় না। নিজেকে ভালভাবে গড়ে তোলা যায় না। এমন একটা বিশ্বাস আমার সব সময়ই ছিলো, এখনো আছে।

মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং শুরু হলো। এর আগে থেকেই অসহযোগ আন্দোলন চলছে। হাজার হাজার লোক শহর ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছে। খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া দিনাজপুর, রংপুর, সাতক্ষীরা এমনকি ঢাকার লোকজনও দক্ষিণ বাগুলা হয়ে তাদের গ্রামের বাড়ীতে ফিরছে। প্রত্যেকদিন আট, দশ, পনেরো হাজার লোকের চাপ। এরা অভুক্ত। এরা পানি পর্যন্ত পায়নি। এদের চলার মতো শক্তি নেই। অসহযোগ আন্দোলনে আওয়ামী লীগ এবং স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিসমূহের আহবানে সমগ্র জনতা তাদের বাড়ী থেকে খাবার পাঠাতো। বিভিন্ন কর্মী সংগঠনের জন্য খাবার আসতো। এই সময় আমরা জনগণের কাছে আহবান জানালাম বেশি করে খাবার পাঠানোর জন্যে। প্রতিদিন প্রচুর রুটি, গুড়, অন্যান্য শাকসব্জি, ডাব, নারিকেল–মোটামুটি খেয়ে বাঁচা যায় এ ধরনের খাবার আমরা পেলাম প্রচুর পরিমাণে। এগুলো দিয়েই আমরা হাজার হাজার লোকের মোটামুটি জীবন ধারণের ব্যবস্থা করতে পেরেছি। পিরোজপুরের বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করা হলো এই খাবার বিতরণের জন্য।

খুলনায় তখন লড়াই চলছে। সেই লড়াইয়ের ময়দানে রুটি এবং অন্যান্য খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা আমরা নিলাম। এরই মধ্যে খবর এলো মেজর জলিল বরিশালে মুক্তিযুদ্ধের কমান্ড গ্রহণ করেছেন। তিন চারদিন পরে মেজর জলিল পিরোজপুরে এলেন। তার সঙ্গে সেখানেই আমার প্রথম দেখা। তখন তিনি তারুণ্যে ভরপুর, প্রাণোচ্ছল, প্রচন্ড উদ্যোগী একজন তরুণ মেজর। তিনি আমাকে পেয়েও খুব খুশি হলেন। তিনি চাইলেন খুলনা বেতার কেন্দ্র দখল করতে। খুলনা শহরের একটা অংশ এবং বেতার কেন্দ্র দখল করে যদি ঘোষণা দেয়া যায় তাহলে মুক্তিবাহিনী এবং বাংলার মানুষ আরো জোর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে।
পিরোজপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ, বরিশালের মুক্তিযোদ্ধা, ঝালকাঠির মুক্তিযোদ্ধাদের একটা অংশ এবং বাগেরহাটের মুক্তিযোদ্ধাদের একটা অংশ এদের সম্মিলিত বাহিনী খুলনা বেতার কেন্দ্রে হামলা চালালো। সঠিক তারিখটা আমার খেয়াল নেই, তবে খুব সম্ভবত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের ঘটনা সেটি। বেতারকেন্দ্র দখলের যুদ্ধে পিরোজপুরের চারজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হলো। বেশ দীর্ঘক্ষণ সেই যুদ্ধ চললো। কিন্তু মুক্তিবাহিনী এতে সফল হতে পারেনি।
পিরোজপুরে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন করতে গিয়ে আমরা বিশেষ বিশেষ কিছু কাজও করলাম। শিক্ষিত উদ্যোগী মেয়েদের একটা ট্রেনিং সেন্টার আমি করলাম যেখানে পিরোজপুরের তিরিশ/চল্লিশজন মেয়ে ট্রেনিং নিয়েছে। উচ্চশিক্ষিত যুবক কিংবা তরুণ অধ্যাপক–এদের জন্যও আমরা আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলাম। সেখানে যারা প্রশিক্ষণ নিলেন তারা হয়তো রেগুলার মুক্তিবাহিনীতে কাজ করবেন না। কিন্তু ট্রেনিং দিয়ে দিলে গেরিলা যুদ্ধের একটা না একটা পর্যায়ে তাদের সাহায্য আমরা পাবো। প্রত্যেকে যার যার প্রেক্ষাপট থেকে দেশের জন্য কিছু একটা করতে পারবে, আত্মনিবেদন করতে পারবে।
এরই মধ্যে আওয়ামী লীগ তাদের নিজস্ব তরুণদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আলাদা একটা ক্যাম্প করলো। ছাত্র ইউনিয়নের ফজলু গ্রুপ ও বাদল রবি গ্রুপও আলাদা আলাদাভাবে দুটো ট্রেনিং সেন্টার করলো। মূল শক্তিটা ছিলো আমার নেতৃত্বে চোদ্দশ মুক্তিযোদ্ধার।
আমাদের মহকুমা শহরের জনতা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রচন্ড সক্রিয় ছিলো। কিন্তু কারো কাছে পরিষ্কার ছিলো না মুক্তিযুদ্ধ শেষ হতে কতোদিন সময় লাগবে, আমরা কাদের সমর্থন পাচ্ছি, পাবো, প্রথম কয়েকদিন বঙ্গবন্ধু জীবিত আছেন কিনা, গ্রেফতার হয়েছেন কিনা–এসব প্রশ্নে প্রচন্ড আলোড়ন উঠলো পিরোজপুর শহরে। উদ্বিগ্ন একটা অবস্থা। এর পরবর্তী পর্যায়ে পিরোজপুরের পাশের থানাগুলো এবং দু'একটা জেলায় আমাদের কর্মকান্ড শুরু হলো। আমি পিরোজপুরের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের প্রধান জনাব এনায়েত হোসেন খানকে বললাম, 'আমরা সুন্দরবনে ঘাঁটি গড়ে তুলবো।' তিনি আমাকে বললেন, 'হয়তো এটার প্রয়োজন হবেনা। মনে হচ্ছে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা অচিরেই মুক্ত হয়ে যাবে।' তখন সম্ভবত এপ্রিলের প্রথম কি দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরু। আমি বললাম, ' না, আসলে ব্যাপারটা হয়তো এতো তাড়াতাড়ি হবে না। কাজেই আমাদের সুন্দরবনের মতো একটা রিয়ার বা পশ্চাৎ ভূমি বেছে নেয়া উচিত।'
আমাদের মুক্তিফৌজের যে খরচ খর্চা হতো এর মূল অংশটা আমরা অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের কাছ থেকেই পেয়েছি। আর তখনকার পিরোজপুরের সেকেন্ড অফিসার (শহীদ হয়ে গেছেন পরবর্তীতে) জনাব মিজানুর রহমান তার বিশেষ তহবিল থেকে মুক্তিফৌজের জন্য অর্থ সাহায্য করেছেন। অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পক্ষে যতোটা করা সম্ভব তা তারা করতেন। খাদ্য সরবরাহ, ঔষুধ সরবরাহ এবং অর্থ সরবরাহ যখন যা প্রয়োজন হতো তা সাধ্যমতো তারা করতেন।

আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। এপ্রিলের শুরু থেকেই পিরোজপুরের পার্শ্ববর্তী কিছু থানা এবং জেলাতে আমাদের তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। খুলনা জেলার তখনকার মহকুমা শহর বাগেরহাটের কচুয়া, মোরেলগঞ্জ, শরণখোলা থানায় মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন শুরু করি এবং গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য তাদেরকে আমরা পরামর্শ দেই। একই সাথে বানরীপাড়া, নাজিরপুর, স্বরূপকাঠি, কাউখালি, ভান্ডারিয়া, কাঁঠালিয়া, মঠবাড়িয়া–এই থানাগুলোতে আমরা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, মোজাফফর ন্যাপ–ভাসানী ন্যাপ নেতৃবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এরকম যারা ছিলেন তাদের সকলের সাথে মতবিনিময়, পরামর্শ ইত্যাদি শুরু করি। পিরোজপুর শহর যেহেতু চৌদ্দশ মুক্তিযোদ্ধার দখলে এবং পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সে কারণেই এখানে পাঞ্জাবী সৈনিকদের একটা উচিত শিক্ষা দেয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি আমরা গ্রহণ করলাম। পিরোজপুরের ঐতিহ্যবাহী রায়েরকাঠি জমিদার বাড়ির গভীর জঙ্গল, ভাঙা দালানকোঠার মধ্যে আমরা গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করলাম। কালিকাঠি, শংকরপাশা–এই গ্রামগুলিতেও আমরা গোপন ঘাঁটি স্থাপন করলাম। পাকিস্তানীদের আক্রমণ হলে যাতে অ্যাম্বুশ এবং সাঁড়াশি কায়দায় পাল্টা আক্রমণ করতে পারি সেই প্রস্তুতিটা আমরা নিচ্ছি। একটা বিষয় আজকের তরুণ সমাজের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরা দরকার–মুক্তিযুদ্ধে সমগ্র জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে সৃষ্ট সেই মহান আন্দোলন কতোটা জনকল্যাণকর ছিল, হিতকর ছিল। যেমন একটা উদাহরণ–তখন থানা পুলিশ, আইন শৃংখলা রক্ষাকারীবাহিনী বলতে কিছুই নেই। প্রায় সমস্ত অস্ত্রই মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। সে অবস্থায়ও চোর ডাকাতরা প্রচন্ড ভীত হয়ে তাদের সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করে দিল। আইন শৃংখলা প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে কিছুই নেই, রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে ফেলা হচ্ছে, সেনাবাহিনীর অবস্থান গেরিলা যুদ্ধের মুখোমুখি, পুলিশ বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আছে অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। কিন্তু গ্রাম বাংলায় চোর–ডাকাতের উপদ্রব প্রায় নেই বললেই হয়। তারা বুঝতে পেরেছে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে অস্ত্র রয়েছে। আর চুরি–ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়লে হয়তো মুক্তিযোদ্ধারা ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদন্ড দিয়ে দেবে। সে কারণেই সেই অবস্থার মধ্যে যে নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারতো তার কিছুই হয়নি। সমাজবিরোধীরা জনতার ভয়ে, মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে, মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলনের ভয়ে তাদের কুকীর্তি থেকে সম্পূর্ণ বিরত। মুক্তিযুদ্ধের মূল্যায়নে এই বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বের দাবী রাখে।

আমরা, পিরোজপুরের মুক্তিযোদ্ধারা বেশ সুশৃংখল একটা পরিবেশ এবং কঠিন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুললাম। নৌ–বন্দরগুলোতে পাহারা দেওয়া, বিভিন্ন এলাকার জনগণের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মার্চ পাস্ট করা কিংবা সশস্ত্র মিছিল পরিচালনা করা এসব কাজগুলো মুক্তিযোদ্ধারা সঠিকভাবে পরিচালনা করছে। তবুও আমার মন সন্তুষ্ট নয়। এক পর্যায়ে আমি পিরোজপুরের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের কাছে প্রস্তাব দেই সুন্দরবনে ঘাঁটি গড়ে তোলার। বিপ্লবী সরকার এ প্রস্তাব মোটামুটিভাবে মেনে নিলেও কোন রকম অর্থ সাহায্য দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অন্য কোন রকম সাহায্যও তারা দেয়নি। কারণ বিপ্লবী সরকারের একটি অংশের ধারণা, অল্পদিনের মধ্যেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা স্বাধীন হয়ে গেছে, বরিশাল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলও স্বাধীন হওয়ার পথে। সব মিলিয়ে দু'এক সপ্তাহের মধ্যে পুরো বাংলাদেশই স্বাধীন হয়ে যাবে, এমন একটা ধারণা বিপ্লবী সরকার এবং রাজনৈতিক মহলের, এমনকি মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ এবং সাধারণ মানুষের মনেও কাজ করতো। সে কারণে সুন্দরবনে ঘাঁটি করার কাজে কোন সক্রিয় সহযোগিতা আমি পেলাম না।

এপ্রিল মাসের আট কি দশ তারিখে নড়াইলের তখনকার এসডিও কামালউদ্দীন সাহেব, সিরাজুল আলম খান এবং বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ নাসের একটা লঞ্চে করে পিরোজপুরে এলেন। তারা আমাকে প্রচুর অস্ত্র দিয়ে গেলেন। এই অস্ত্রগুলো তখনকার ইপিআর বাহিনী পাঞ্জাবীদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। এগুলো কাকে দেওয়া হবে সেটা নিয়েও কিছুটা সংকটের মধ্যে ছিলেন ওরা। যখন শুনলেন পিরোজপুরে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটা মোটামুটি সুব্যবস্থা আছে এবং এখানে একজন সামরিক অফিসার নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধাদের তখন তারা ভাবলেন এই অফিসারের হাতে অস্ত্রগুলো দিলে এগুলোর যথার্থ ব্যবহার হবে। তারা সেমি অটোমেটিকস, অটোমেটিকস, এসএমজি, এক্সপ্লোসিভস, গ্রেনেড এগুলো আমাদের দিয়ে গেলেন। এরপর বঙ্গবন্ধুর ছোটভাই শেখ নাসের আমাকে বললেন যদি কোনরকম দুরাবস্থায় পড়ি তাহলে যেন তাদের বাড়িতে যোগাযোগ করি। তিনি ধারণা দিলেন তাঁর বাড়িতে যোগাযোগ করলে অস্ত্রশস্ত্র কিংবা অন্য যে কোন সাহায্যের ব্যাপারে তিনি সহায়তা করতে পারবেন। আমি বললাম, 'ঠিক আছে, যদি তেমন কোন সংকটের মুখোমুখি হই তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবো।'

পিরোজপুরের সেকেন্ড অফিসার, থার্ড অফিসার এবং এসডিপিওর (পরবর্তীতে এঁরা শহীদ হয়ে গেছেন) মনে এমন একটা চিন্তা ভাবনা ছিল যে পিরোজপুর ট্রেজারীর অর্থটা মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কাজে লাগানো যায় কিনা। সেকেন্ড অফিসার ও থার্ড অফিসার একদিন আমাকে এমন একটা প্রস্তাব দিলে আমি সরাসরি সেটা প্রত্যাখ্যান করলাম। বললাম, 'টাকাগুলো যদি আপনারা সুন্দরবনে নিয়ে রাখতে চান কিংবা অস্থায়ী সরকার যারা ভারতের মাটিতে অবস্থান করছে তাদের কাছে রাখতে চান তাহলে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এই টাকার যাবতীয় হিসাব নিকাশ আপনাদেরকেই রাখতে হবে। তাহলেই আমি এই টাকাগুলো হাতে নেয়ার বা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিতে রাজী আছি।' তারা একটু সময় নিলেন চিন্তা-ভাবনা করবার জন্য। একদিন পর তারা আমাকে বললেন, 'ঠিক আছে, এই টাকার হিসাব আমরা রাখবো। আপনি আমাদের সশস্ত্র পাহারার সাহায্য দিয়ে প্রথমে সুন্দরবন এবং পরে মুজিব নগরে অবস্থানরত অস্থায়ী সরকারের কাছে টাকাগুলো পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। অস্থায়ী সরকারের কাছে পৌঁছে দেয়ার পর আপনার কোন দায় দায়িত্ব নেই। আমরাই এই ট্রেজারীর যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব মেনটেইন করে আপনার কাছে জমা দিয়ে দেবো।' তাদের এই প্রস্তাবে আমি রাজী হলাম এবং এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আমি খুব গোপনীয়ভাবে তিনটা লঞ্চ সংগ্রহ করলাম যাতে সেকেন্ড অফিসার, থার্ড অফিসার এবং এসডিপিওসহ অর্থকড়ি নিয়ে সুন্দরবনে ঘাঁটি এলাকায় চলে যাওয়া যায়। ট্রেজারীর অর্থ সুন্দরবনে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাটা শুধু সেকেন্ড অফিসার এবং থার্ড অফিসারই জানতেন। অন্য কেউ জানতেন না। খুবই গোপন রাখা হয়েছিল ব্যাপারটা। তিনটা লঞ্চ যোগাড় করার পরে বিভিন্ন থানায় মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্গঠিত করা এবং অন্যান্য কাজে আমি বেরিয়ে পড়ি।

এপ্রিল মাসের শেষের দিকে বেশ কয়েকটি থানা থেকে মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধিরা আমার কাছে এসে হাজির হলো। বলা যায় তারা যেন তাদের এলাকা থেকে পালিয়েই আমাদের কাছে এসেছে। আশ্রয় চাওয়ার মতো একটা অবস্থা দাঁড়াল। তাঁদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি সব কিছু নিজেদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। হঠাৎ করেই বিজয় লাভ হয়ে যাবে এবং ২৬ শে মার্চের পরে এক সপ্তাহ- দু'সপ্তাহের মধ্যে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে এমন দৃষ্টিভঙ্গী যাদের ছিলো তারা কিছুটা হতাশ, কিছুটা পলায়নপর মনোবৃত্তি, কিছুটা আত্মরক্ষামূলক চিন্তা-ভাবনা, পাঞ্জাবীদের আক্রমণ শুরু হলে কোন পথে কিভাবে পালাতে

হবে এসব চিন্তা ভাবনায় আচ্ছন্ন। সে কারণেই বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত প্রতিনিধিরা এসে যে রিপোর্ট করলো তার অর্থ হচ্ছে, তারা তাদের এলাকার ওপর কর্তৃত্ব হারাচ্ছে। কোন কোন এলাকায় থানার পুলিশ মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে দেয়া অস্ত্রগুলো আবার ফিরিয়ে নিয়েছে। বলা যায় মোটামুটি জোর করেই। এরকম অনেকগুলো ঘটনার রিপোর্ট পেলাম। মঠবাড়িয়ার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন তুখোড়, সাহসী ও বেশ নামকরা ছাত্রনেতা শওগাতুল আলম সগীর পিরোজপুর এসে আমাকে সাংঘাতিকভাবে অনুরোধ করলেন যেন আমি মঠবাড়িয়া গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করি। উনি চলে যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে মঠবাড়িয়াতে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্র করা হয়েছে। পুলিশ তাদের সমস্ত অস্ত্র নিয়ে গেছে এবং মুক্তিয়োদ্ধা নেতৃবৃন্দসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হওয়ার মতো একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।
এরকম বেশ কয়েকটা থান্যর রিপোর্ট আসার পরে আমি চারটি লঞ্চ রিক্যুইজিশন করে প্রায় এক হাজার মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ঐ থানাগুলোর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এই এক হাজার মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে প্রায় ছয়শ'র মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর বিডিআর, নৌবাহিনী কিংবা বিমানবাহিনীর তৎকালীন সক্রিয় সদস্য। এদেরকে নিয়ে গিয়ে আমি একে একে কাউখালী থানা, কাঁঠালিয়া, ভান্ডারিয়া থানা, মঠবাড়িয়া থানা এবং শরণখোলা থানার পুলিশকে নিরস্ত্র করে পুনরায় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অস্ত্র প্রদান করলাম। মঠবাড়িয়া থানায় গিয়ে হাজির হওয়ার পরে তখনকার ওসি, একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও অন্য একজন অফিসার-এরা মিলে অজুহাত দেখাল যে তাদের পরিবারবর্গ আছে। তারা যদি এখন মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দেয় তাহলে যখন পাঞ্জাবীরা এসে পুর্নদখল করবে বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তর তখন তারা কি জবাব দেবেন। এ ধরনের টালবাহানামূলক বক্তব্য থানার অফিসাররা রাখলেন। আমরা এই টালবাহানার মধ্যেই কমান্ডো হামলার ইঙ্গিত দিয়ে দিলাম। মুক্তিবাহিনীর মধ্যে যে কমান্ডো অংশ ছিলো তারা মুহূর্তের মধ্যে দুই তিনজন সেন্ট্রিকে নিরস্ত্র করে ফেললো এবং আমি রিভলবার উঁচিয়ে সিআইকে নিরস্ত্র করে তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে থানার অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্রগুলো বের করার নির্দেশ দিলাম। এর মধ্যে চারদিক থেকে মুক্তিযোদ্ধারা এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, ন্যাপ নেতৃবৃন্দসহ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সকল শক্তি বিরাট মিছিল সহকারে, শ্লোগান দিতে দিতে থানায় এসে উপস্থিত হলো। মুক্তিবাহিনীর কাছে আবার অস্ত্র ফিরে গেলো। পরেরদিন শুনতে পেলাম শরণখোলা থানারও একই অবস্থা। শরণখোলা থানায় গিয়ে আমরা যখন হাজির হলাম তখন দেখছি (যখন শরণখোলা থানা থেকে চারশ গজ দূরে আমাদের লঞ্চ) সমগ্র শরণখোলা বন্দরে পাকিস্তানী পতাকা উড়ছে। প্রথমটায় আমরা একটু চিন্তিত হলাম। ভাবলাম, হয়তো এরই মধ্যে পাকিস্তানী বাহিনী শরণখোলা এলাকা দখল করে ফেলেছে যার খবর আমরা পাইনি। আবার মনে হলো তা নাও হতে পারে। হয়তোবা এটা স্থানীয় পাকিস্তানী পন্থীদের চাপে এবং রাজাকারদের চাপেই ঘটেছে। যখন এই পাকিস্তানী পতাকার বহর আবিষ্কার করলাম ততক্ষণে আমাদের গতিপথ পরিবর্তনের কোন উপায় নেই। আমি সেই কমান্ডো অংশটিকে নির্দেশ দিলাম যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করবার জন্য। এবং লঞ্চ ঘাটে নামার সাথে সাথে কমান্ডোসহ সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজ নিজ অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ দিলাম। হলোও তাই। মুক্তিযোদ্ধারা নির্দেশ মোতাবেক ঝটিকা অভিযানের মতো বন্দরে অবস্থান গ্রহণ করলো। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা দেখলাম শুধু পুলিশই আছে প্রতিপক্ষের মধ্যে, রাজাকার বা পাকিস্তানপন্থী কেউ নেই। পাকিস্তানীরা বন্দর পুড়িয়ে দিতে পারে এই ভয়ে এলাকার লোকজন পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে রেখেছে যেন পাকিস্তানী নৌবাহিনী বা সৈন্যরা এসে

পাকিস্তানী পতাকা দেখে বন্দরটা পুড়িয়ে না দেয়। এই কৌশলের কারণেই এখানে পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়ে রাখা হয়েছে।

শরণখোলা থানা থেকেও মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দেয়া হলো। এখানে, পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের সুন্দরবন সাবসেক্টরের সেকেন্ড ইন কমান্ড জনাব সামসুল আলম তালুকদারসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দেয়া হলো। যদিও সামসুল আলম তালুকদার মুক্তিযুদ্ধেরই কোন না কোন কাজে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থান করছেন তখন। কিন্তু তার লোকজন এলাকায়ই আছে। সেনাবাহিনীর সক্রিয় এবং অবসরপ্রাপ্ত লোকজন আছে। তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করা হলো। এরপর আমরা শরণখোলা থানা বন্দর থেকে হেঁটে প্রায় দশ/এগারো মাইল দূরবর্তী সুন্দরবনের বগী এবং শরণখোলা ফরেস্ট অফিসে গেলাম। এখানকার ফরেস্ট অফিস থেকে আমরা কিছু অস্ত্র পেলাম, যান্ত্রিক নৌকা পেলাম এবং প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা পেলাম। আমার সেই আবাল্য লালিত ধারণা, সুন্দরবনে ঘাঁটি গড়তে হবে– সেই ধারণা নিয়েই আমি বন বিভাগের অফিসগুলোতে গেলাম। সুন্দরবনকেও একনজর দেখা হলো। অবশ্য আমি পিরোজপুর মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্প গঠনের দু'সপ্তাহ পরেই গোপনে সুন্দরবন গিয়ে কোথায় কোথায় ক্যাম্প করা যায় তা দেখে এসেছিলাম। সঙ্গে ছিল একদল মুক্তিযোদ্ধা। সেবার দেখে যাওয়ার পর শরণখোলা থেকে এসে সেই দ্বিতীয়বার দেখা। যাহোক ফরেস্ট অফিস থেকে অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে চল্লিশ হাজার টাকাও পেলাম। দেখা গেল যে, ফরেস্ট অফিসার সপ্তাহ খানেক আগে প্রায় আড়াই লাখ টাকা রেভিনিউ খুলনায় পৌঁছে দিয়েছে। আমি যখন প্রশ্ন করলাম 'আপনি পাঞ্জাবীদের এখনও রেভিনিউ দিচ্ছেন, টাকা দিচ্ছেন এর কারণ কি?' তিনি তখন উত্তর দিতে পারলেন না। বললেন, 'আমার কাছে এখন চল্লিশ হাজার টাকা রেভিনিউ আছে। এটা এখন আমি কি করবো?' আমি বললাম, 'ঠিক আছে এটা আপনি মুক্তিবাহিনীর তহবিলে জমা দিন। আমি আপনাকে রসিদ দিচ্ছি'। তখন আমি লিখে দিলাম যে, আমি লেফটেন্যান্ট জিয়াউদ্দিন, বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্যে এই ফরেস্ট অফিস থেকে চল্লিশ হাজার টাকা গ্রহণ করলাম। এই টাকাটা রেভিনিউ'র টাকা এবং এজন্য ফরেস্ট অফিসারের কোন দায়–দায়িত্ব নেই। এটা লিখে দেয়ার পরে সেই শরণখোলা ফরেস্ট অফিস এবং বগীতেই মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। তাদেরকে গোটা বিশেক রাইফেল এবং গ্রেনেডসহ আনুষাঙ্গিক কিছু অস্ত্র এবং কয়েক হাজার টাকা তাদের খরচের জন্য দিয়ে এখানে ঘাঁটি স্থাপনের জন্য আমি নির্দেশ দিলাম। তারা সেই নির্দেশ আনন্দের সাথেই গ্রহণ করলো।

আমরা এখানকার জনগণের সঙ্গে আলাপ করলাম। সমগ্র জনতাই মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে দৃঢ়ভাবে সমর্থন যুগিয়েছেন। আমরা ভাবলাম, বিশেষ করে আমি ভেবেছি, পরবর্তীতে এই ক্যাম্প থেকে সুন্দরবনে ঘাঁটি গড়ার কাজটি আমরা শুরু করতে পারবো। এই গ্রুপটি আমাদের ঘাঁটি স্থাপনের কাজে, যোগাযোগ ও অন্যান্য সরবরাহের কাজে সাহায্য করতে পারবে। এরা স্থানীয় লোক এবং সেনাবাহিনীর একজন সুবেদারসহ সেনাবাহিনীর আরো কিছু লোক আমরা পেলাম। স্থানীয় আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ, ভাসানী ন্যাপ নেতৃবৃন্দকে আমরা ডাকলাম। ডেকে, তাদের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পটা চালু হলো। খরচের জন্য টাকা–পয়সা আমি দিয়ে এলাম। তারপর আমরা আরো গভীর সুন্দরবনে, সুন্দরবনটা দেখে আসার জন্য এবং কোথায় কোথায় গভীরে মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্প করা যায় সেটা দেখার জন্য শরণখোলা ফরেস্ট অফিসের একটা লঞ্চ নিয়ে ভিতরের দিকে দশ/বারো জন মুক্তিযোদ্ধাসহ রওনা দিলাম।

দুপুরবেলা ঠিক নয়, বলা যেতে পারে পড়ন্ত দুপুরে পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম সুন্দরবনের ভেতরে। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সন্ধ্যা হয়ে এলো। রাতটা আমরা সুন্দরবনের মধ্যেই কাটালাম আগুন জ্বালিয়ে, ক্যাম্প ফায়ারের মতো করে। অবশ্য কড়া পাহারার ব্যবস্থাও রাখলাম। কারণ বাঘের আক্রমণের ভয় আছে, সাপের আক্রমণের ভয়ও আছে। যাহোক, রাতটা কেটে গেল ঘটনাবিহীন। টেনশনে কারোই তেমন ঘুম হলো না। তবু সামান্য বিশ্রাম নেয়া হলো। পরদিন ভোরেই আবার শুরু হলো হাঁটা। আনুমানিক সতেরো/আঠারো মাইল ভেতরে ঢুকে আমরা একটা নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালাম। এখানে পেলাম জেলেদের নৌকা। এই নৌকার সাহায্য নিয়ে আমরা চরদুয়ানী এসে হাজির হলাম। জায়গাটা পাথরঘাটা থানার আওতাধীন। চরদুয়ানী এসে দেখলাম এখানকার জনগণও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তাদের অবস্থান দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। চরদুয়ানী পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পরই দুটো পাকিস্তানী গানবোট দেখতে পেলাম আমাদের দিকে আসছে। আমরা পজিশন নিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গানবোট দুটো আমাদের রেঞ্জের মধ্যে এলো না, ঘুরে বরিশালের দিকে চলে গেল। বুঝতে পারছি, বরিশাল শহর কিংবা আশেপাশের অঞ্চলে সম্ভবতঃ আক্রমণ পরিচালনা করা হচ্ছে। অবশ্য আমাদের কাছে রেডিও বা অন্য কোন ধরনের বেতারযন্ত্র না থাকায় আমরা নিশ্চিতভাবে কোন খবরই জানতে পারছি না।

পিরোজপুর ফিরে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করে একটা নৌকায় চেপে বসলাম আমরা। বড় মাছুয়া, মঠবাড়িয়া, তুষখালি হয়ে পিরোজপুরে এসে পৌঁছালাম। পৌঁছে সার্বিক অবস্থাটা মনে হলো খুবই হতাশাব্যঞ্জক। খবর পেলাম বরিশালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিমান হামলা চালিয়েছে এবং গানবোট থেকে বোমা নিক্ষেপ করেছে। মুক্তিযোদ্ধারা এই আক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা করলেও সফলতা লাভ করতে পারেনি। আমরা ধারণা করছি, হয়তো দু' একদিনের মধ্যেই পাঞ্জাবী সৈনিকেরা বরিশাল শহরে হাজির হয়ে যাবে। সে কারণে আমরা আমাদের নিজস্ব অবস্থান আরো শক্তিশালী করার জন্য সচেষ্ট হলাম। এটা এপ্রিলের শেষের দিককার ঘটনা।

বরিশাল শহরের ওপর পাকিস্তানী বাহিনীর বোমা বর্ষণের পর সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা শংকিত অবস্থা আমরা দেখতে পেলাম। আগের চেয়ে শহরের লোক আরো কমে গেছে। সক্রিয় কর্মীদের একটা অংশও লাপাত্তা। এই পর্যায়ে অবস্থা কিছুটা নাজুক হয়ে উঠলো বললে মিথ্যা বলা হবে না।

এরই মধ্যে আমার আবাল্য লালিত সেই স্বপ্ন–সুন্দরবনে ঘাঁটি গড়ে তুলতে হবে–এটা বাস্তবায়নের পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি আমি। তবে অন্যান্যদের কাছে এই ঘাঁটি করার প্রস্তাবটা উদ্ভট কল্পনা, অসম্ভব ব্যাপার হিসেবে প্রতীয়মান হয়। আমি কিন্তু তাদের এ ধরনের মানসিকতার পরিচয় পেয়েও স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্যোগ থেকে পিছিয়ে যাইনি। সুবেদার ফুলুর নেতৃত্বে শরণখোলার বগীতে ঘাঁটি স্থাপন হচ্ছে এই পরিকল্পনার প্রথম ধাপ। শরণখোলা থেকে ফিরে আসার পরে পিরোজপুরের জনগণের মধ্যে শংকিত একটা ভাব লক্ষ্য করলাম। বরিশাল শহরের ওপর পাকিস্তানী আক্রমণ এবং পাকিস্তানী বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধিতে যারা ভাবছিলেন খুব শিগগিরই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে তাদের ভাবনাটা পাল্টে গেল। তারা ধারণা করলেন, না, তাড়াতাড়ি দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এই রকম ধারণা এক অর্থে আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পক্ষেই কাজ এরই মধ্যে হঠাৎ করে একদিন আবিষ্কার করলাম মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের নেতৃবৃন্দের বাড়ির সামনে একটা চিহ্ন দিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি খোঁজ নিয়ে দেখলাম যারা স্থানীয় অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার এবং মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে তাদের

প্রত্যেকের বাড়ির সামনে এই চিহ্নটা দিয়ে যাওয়া হয়েছে। সম্ভবতঃ উদ্দেশ্য হচ্ছে পাকিস্তান বাহিনী যখন পিরোজপুরে আক্রমণ চালাবে তখন কোন্ কোন্ বাড়ির ওপর হামলা চালাতে হবে সেসব আগে থেকেই চিহ্নিত করে রাখা। আমি বিকেলবেলা মুক্তিযোদ্ধাদের একটা বিশেষ স্কোয়াড ডেকে সেই চিহ্নটা নকল করে সমস্ত জামাত–মুসলিম লীগের রাজাকারদের বাড়ির সামনে লাগিয়ে দিলাম। পরিস্থিতিটা দাঁড়াল এমন যে মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ির সামনেও সেই চিহ্ন আছে, রাজাকারদের বাড়ির সামনেও সেই চিহ্ন আছে। তখন পাঞ্জাবীরা কমান্ডো হামলা করতে গেলে শুধু মুক্তিবাহিনীর ওপরই হামলাটা হবে এমন আশংকা আর থাকলো না। ঘটনাটি ছোট্ট, তবে নি:সন্দেহে মজার এবং গুরুত্বপূর্ণ।

এরপরে আমরা খুব বেশিদিন আর পিরোজপুর টিকে থাকতে পারলাম না। বরিশালে বম্বিংয়ের পর আমরা বুঝতে পারলাম এখন আর শহরগুলো দখল করে রাখতে আমরা পারবো না। গ্রামভিত্তিক গেরিলাযুদ্ধ, বিশেষ করে আমাদের এলাকায় সুন্দরবনে ঘাঁটি করে মুক্তিযুদ্ধকে সংহত করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এছাড়া যুদ্ধের ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করা অসম্ভব–এটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম আমরা। সৌভাগ্য যে আমি আগে থেকে অনুমান করেছি, অতিসত্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ শেষ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে মোটামুটি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের জন্য বাস্তব কিছু পদক্ষেপ আমি নিয়ে ফেললাম। এপ্রিলের শেষ দিকে এসে মনে হচ্ছে ঐ পদক্ষেপগুলো না নিলে সেটা হতো আমাদের চরম ভুল।

এ সময় আমার খুব মনে হচ্ছে গানবোট বিধ্বংসী অস্ত্র আমাদের দরকার। এছাড়া পাঞ্জাবীদের মোকাবেলা করা অসম্ভব। বরিশালের মুক্তিযোদ্ধারা মূলত পাঞ্জাবী বাহিনীর গানবোট হামলাতেই কাবু হয়ে পড়েছে। এটা বুঝে আমি সর্ব রকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছি কি করে গানবোট বিধ্বংসী অস্ত্র পাওয়া যায়। কিন্তু আসলে কিছু যোগাড় করতে পারছি না। এই সময় ভাসানী ন্যাপের শহীদ ফজলু আমাকে বললো, 'ভারতে গেলে হয়তো অস্ত্র পাওয়া সম্ভব। তুমি একটা সার্টিফিকেট আমাদের দাও যে আমরা মুক্তিযুদ্ধে আছি। এই সার্টিফিকেট নিয়ে আমরা ভারতে গিয়ে দেখি অস্ত্র যোগাড় করা যায় কিনা।' ওদের প্রস্তাব আমি মেনে নিলাম। আমার দেয়া সার্টিফিকেট নিয়ে ফজলু গ্রুপের কয়েকটা ছেলে ভারতের পথে রওনা দিলো। কিন্তু পশুর নদীর কাছাকাছি পৌঁছানোর পর ওরা পাকিস্তানী গানবোটের মুখোমুখি পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্পীডবোট, ম্যাকানাইজড বোট এসব হারিয়ে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে পিরোজপুর ফিরে এলো।

আমি তখনো চেষ্টা চালাচ্ছি গানবোট বিধ্বংসী কামান যোগাড় করতে। ধারণা হচ্ছে, ভারতেরই কোন না কোন জায়গা থেকে এই কামান সংগ্রহ করা সম্ভব, হতে পারে সেটা সরকারী সহায়তার মাধ্যমে কিংবা বেসরকারী কোন সোর্সের মাধ্যমে। আমাদের পিরোজপুরেরই উত্তর অংশে চালতাখালি বলে একটা জায়গা আছে। এই চালতাখালিতে মুলঙ্গিবাড়ি নামে একটা পাড়া আছে যাদের অনেক আত্মীয়–স্বজন ভারতে বসবাস করতো। এরা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হিসেবে কাজ করেছে, দৃঢ় সমর্থন যুগিয়েছে। আমি ভাবলাম এই মুলঙ্গিবাড়ির লোকজনের মাধ্যমে ভারত থেকে কিছু অস্ত্র আনা যায় কিনা। সে সময় গানবোট বিধ্বংসী যে কোন ধরনের অস্ত্র আমার খুবই প্রয়োজন–সেটা হতে পারে রিকয়ললেস রাইফেল কিংবা ভাল রকেট লাঞ্চার ইত্যাদি। এ জাতীয় অস্ত্র ছাড়া গানবোটের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। আমি অনেক কাজের মধ্যেও একটু সময় করে সেই চালতাখালির মুলঙ্গিবাড়িতে গেলাম। সেই বাড়ির দায়িত্বশীল যারা ছিলো তাদেরকে বললাম, 'এ ধরনের কিছু অস্ত্র আমার প্রয়োজন। তোমরা কি এ ব্যাপারে কোন সহযোগিতা করতে

পারো?' ওরা বললো, 'ঠিক আছে, আমরা একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখি এ ধরনের কোন অস্ত্র পাওয়া যায় কিনা। আমরাতো এসব অস্ত্র-শস্ত্র সম্বন্ধে কিছুই জানি না। রিকয়ললেস রাইফেলের নাম এই প্রথম শুনলাম আপনার মুখে। ঠিক আছে, আপনার বক্তব্যতো শুনলাম। এখন আমরা খোঁজ-খবর নেব।'

একরাত সেখানে অবস্থান করে আমি ফিরে এলাম। সেদিনই পিরোজপুর শহরে কিছু ঘটনা ঘটে যা পিরোজপুরের মুক্তিযুদ্ধে একটা টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে আখ্যা পাওয়ার যোগ্য। সেদিন পিরোজপুর ট্রেজারীর অর্থ নিয়ে একটি হঠকারী ঘটনা ঘটে যায়। ঘটনাটি ঘটে ভাসানী ন্যাপের ফজলু গ্রুপের নেতৃত্বে। সেকেন্ড অফিসার, থার্ড অফিসারসহ আমাদের পরিকল্পনা ছিল ট্রেজারীর অর্থ প্রথমে সুন্দরবন নিয়ে যাওয়ার। এই উদ্দেশ্যে তিনটা লঞ্চও যোগাড় করে রেখেছিলাম। কিন্তু প্রচণ্ড অ্যাডভেঞ্চারে বিশ্বাসী আমার ছোটবেলার বন্ধু ফজলু (পরবর্তীতে শহীদ হয়ে গেছেন। তার নামে সড়কও হয়েছে) ট্রেজারীর সেই অর্থ মুক্তিযুদ্ধেরই কাজে লাগানোর জন্য হস্তগত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করল। এটার কোন যুক্তি কিন্তু ছিল না। ফজলু গ্রুপের সর্বমোট সক্রিয় সদস্য সংখ্যা বারো কি চৌদ্দজন। মাত্র বারো চৌদ্দজন লোক নিয়ে সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়ে যাওয়া, সেগুলো নিরাপদ স্থানে রক্ষণাবেক্ষণ করা কিছুই তার পক্ষে সম্ভব নয়। তারপরেও কেন যে সে এই 'মাথা গরম' কাজটা করল তা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। আমি যখন মলুঙ্গীবাড়ি থেকে ফিরছি, রাজারহাট বন্দরের কাছাকাছি পিরোজপুর সরকারী সোহরাওয়ার্দী কলেজের পেছনে পৌঁছেছি তখন দেখা হলো বাগেরহাটের প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম খোকন ও ভাসানী ন্যাপের ফজলু গ্রুপের প্রতিদ্বন্দ্বী বাদল-রবি গ্রুপের চার পাঁচ জনের সঙ্গে। তারা শহর থেকে হেঁটে গ্রামের দিকে যাচ্ছে। ঐ গ্রামের প্রান্তে রবিদের বাড়ি। আমার কাঁধে একটা চাইনীজ রাইফেল, সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধারাও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সশস্ত্র। রফিকুল ইসলাম খোকন এবং অন্যান্যরা আমাকে জানালো যে ফজলু গ্রুপ ট্রেজারীর অর্থ নিয়ে যাচ্ছে। সংবাদটা আমাকে খুব শঙ্কিত করলো। সমগ্র পিরোজপুরে সাধারণ মানুষের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের যে অবস্থানটা ছিলো সেটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা আমি অনুভব করলাম। কারণ ফজলু গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেজারীর অর্থ মুক্তিযুদ্ধের কাজে লাগানোর জন্য নিয়ে গেলেও এ ব্যাপারে জনসাধারণের কাছে তারা কোন প্রচারণা চালায়নি। সুবিধাবাদী শ্রেণী ঘটনাটিকে সরাসরি লুণ্ঠন হিসাবে চিহ্নিত করে। ফলে জনসাধারণ পড়ে যায় প্রচন্ড বিভ্রান্তিতে। তারা ঘটনাটিকে কিছুতেই সার্বিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মেলাতে পারে নি। যাহোক বাদল-রবিরা ওদের গন্তব্যের দিকে চলে গেল। আমি কলেজ এলাকা অতিক্রম করে রাজারহাট বন্দরে এসে উপস্থিত হলাম। বন্দরের ব্যবসায়ীরা আমাকে বললো যে, নকশালপন্থীরা ফজলুর নেতৃত্বে ট্রেজারীর উপর

হামলা চালিয়েছে। ট্রেজারীর অর্থ তারা নিয়ে যাচ্ছে। তারা আমাকে বললো, 'আপনি এখন শহরের মধ্যে ঢুকবেন না। আপনাকে ওরা হয়তো মেরে ফেলবে।' আমি বললাম, 'আমাকে মেরে ফেলা খুব সহজ ব্যাপার নয়।' আমি তখন ওদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শহরে ঢুকে পড়লাম এবং ট্রেজারীর পাশের রাস্তা দিয়েই হেঁটে এসে পিরোজপুর সরকারী স্কুলে দেড় মাস আগে গড়ে তোলা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হলাম। ট্রেজারীর পাশ দিয়ে যখন আসছি তখন দেখলাম যে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ফজলুর সঙ্গে ট্রেজারীর মধ্যে অবস্থান করছে। আগরতলা মামলার আসামী তাজুল ইসলামসহ কিছু মুক্তিযোদ্ধাও সেখানে রয়েছে। এই তাজুল ইসলাম পিরোজপুর সরকারী স্কুলের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তাকে ফজলুর সঙ্গে দেখে আমি একটু বিচলিত হলাম।
পিরোজপুর সরকারী স্কুলে সংগঠিত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আমার পরেই তাজুল ইসলামের স্থান। এই তাজুল ইসলাম গিয়ে ফজলুর সঙ্গে যোগ দিয়েছে – এটা আমাকে কিছুটা ভাবনার মধ্যে ফেলে দিল। বুঝতে পারছি, একটা সর্বনাশা অবস্থার মধ্যে আমরা পড়ে যাচ্ছি। সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কমান্ড কন্ট্রোল হারিয়ে যাচ্ছে। এটা দেখার পরে আমি সরাসরি মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে চলে এলাম। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের আরেকজন কমান্ডার, প্রাক্তন সৈনিক মোঃ বরকত আমাকে জানালো যে, তাজুল ইসলাম ফজলুর সাথে চলে গেছে। এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য থেকে একটা ক্ষুদ্র অংশ, দশ বারো কি পনেরোজন, এমন একটা অংশ তাজুল ইসলাম তার সঙ্গে নিয়ে গেছে। এসব তথ্য জানার পর এখন আমাদের কি করা উচিত এ ব্যাপারে যখন আমি আলোচনা করছি তখন গোলাগুলির তীব্রতা আরো বেড়ে গেল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, ফজলু গ্রুপের নিয়ে যাওয়া অর্থের ওপর হামলা চালিয়েছে কিছু লোকজন। সাধারণ মানুষ যেহেতু আগে থেকেই বিভ্রান্তির শিকার সেহেতু হামলা হওয়ার পর পরিস্থিতি দাঁড়ালো চূড়ান্ত ভয়াবহ। যদি মুক্তিযোদ্ধারা টাকাটা সেকেন্ড অফিসার বা থার্ড' অফিসারের মাধ্যমে কর্ডন করে নিয়ে যেতো তাহলে জনগণ প্রশান্তির সঙ্গেই ব্যাপারটা গ্রহণ করতো। মেনে নিতো। কিন্তু তারা যেভাবে টাকাটা নিয়ে যাচ্ছিল তাতে করে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থেকে গেছে–এটা হচ্ছে আমার মুল্যায়ন। ফজলু গ্রুপ যখন রিক্সায় করে দুটো কি তিনটি কাঠের বাক্সে টাকা ভর্তি করে নিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ করেই একটা রিক্সার ওপর হামলা সংঘটিত হয়। প্রতিটি রিক্সায় ফজলু গ্রুপের একজন একটা রাইফেল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। হামলার মুখে এই পাহারা অকেজো হয়ে পড়ে। শুরু হয়ে গেল লুন্ঠন পর্ব। আগেই বলেছি, ট্রেজারীর এই অর্থ সেকেন্ড অফিসার, থার্ড অফিসারের মাধ্যমে প্রথমে সুন্দরবন এবং পরে মুজিবনগরে অবস্থানরত অস্থায়ী সরকারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনটি লঞ্চ আমি প্রস্তুত রেখেছিলাম। তিনটি লঞ্চের একটি ছিল সেই পাড়েরহাট খালে। ফজলু গ্রুপ সেই লঞ্চটাতে করেই টাকা নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা এঁটেছিল। কিন্তু খালের কাছে পৌছবার আগেই পথে পথে তার লোকেরা হামলার মুখে পড়ে যায়। পুরো শহরেই ছড়িয়ে পড়ল এই লুন্ঠন পর্ব। পাড়েরহাট সড়ক এবং এই সড়কের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খাল–সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করল টাকার খেলা। চারিদিকে গোলাগুলি, বিশৃংখল অবস্থা। কালিকাঠি শংকরপাশায়ও আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ক্যাম্প গড়ে তুলেছিলাম। সেই এলাকার জনগণ উক্ত ক্যাম্পগুলিতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য চাইল। বললো, 'আপনারা আমাদের সাহায্য করেন। ট্রেজারীর টাকা নিয়ে এইভাবে গন্ডগোল হচ্ছে। এখন কি করা যায়?' কোন কোন মুক্তিযোদ্ধা সাহায্য করল, কেউ কেউ করল না। তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না কি করবে। কিংবা কমান্ডার হিসেবে আমি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা তারা জানতোও না। সব মিলিয়ে প্রচন্ড একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়ে গেল। এবং দীর্ঘক্ষণ এই অবস্থা

চলতে থাকল। আমি মুক্তিযোদ্ধাদের বললাম, আপনারা গ্রামীণ ক্যাম্পগুলোতে চলে যান। কারণ এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে আমাদের শহরকেন্দ্রিক অবস্থান আর ধরে রাখা সম্ভব নয়। এখন জনগণও আর আমাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছে না। আমরাও এই মুহূর্তে নিজেদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করে বলতে পারবো না যে ফজলু গ্রুপের সঙ্গে আমাদের কৌশলগত এবং চিন্তাগত পার্থক্য রয়েছে। একটা প্রচন্ড বাজে অবস্থার মধ্যে আমরা পড়ে গেলাম। যাহোক রায়েরকাঠি, কালিকাঠি, শংকরপাশার মুক্তিযোদ্ধাদের চলে যেতে বলে আমি চলে এলাম আমাদের বাড়িতে। দুদিন আগে আমি যখন চালতাখালি মুলঙ্গিবাড়ি যাচ্ছিলাম তখন শুনেছিলাম বাবা গ্রামের বাড়ি চলে যাবেন। বাড়ি গিয়ে দেখলাম ইতিমধ্যে তারা চলে গেছেন। সম্পূর্ণ বাড়ি ফাঁকা। সঙ্গী–সাথীসহ আমি এসেছি দুপুরে খেয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে এগোব কি করা যায়। এর মধ্যে কালিকাঠি শংকরপাশা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প থেকে লোক এলো সংবাদ নিয়ে। কালিকাঠি শংকরপাশার পুরো এলাকা, পিরোজপুর পাড়েরহাট খাল এবং পার্শ্ববর্তী সড়কে বিশৃংখল অবস্থা। মুক্তিযোদ্ধারাও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে এবং কিছুই করার নেই এখন।

আমরা বললাম, পরিস্থিতি যাই হোক, তোমরা অন্ততঃ ঘাঁটিগুলো টিকিয়ে রাখার চেষ্টা কর। যাহোক এদিকে আমাদের খাবার কিছু নেই। ভাবছি কোথায় খাব। আমার বাল্যবন্ধু, সহপাঠী এবং মুক্তিযোদ্ধা বিপুল হালদারের বাড়ি আমাদের বাড়ির পেছনেই। ভাবলাম ওদের বাড়িতে গিয়েই দেখি কিছু খাবার পাই কিনা। গিয়ে দেখি বিপুলের বড় ভাই শুধু বাড়িতে আছেন। অন্যদের নিরাপত্তার কারণে দূরবর্তী গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তবু আমরা গিয়ে যখন খাবার চাইলাম তখন মোটামুটি ভালভাবেই আমাদেরকে খাবার পরিবেশন করা হলো।

গোলাগুলীর শব্দ তখনো থামেনি। যাকে বলে গণলুন্ঠন সেরকমই অবস্থা। চারদিক যেন উৎসবে মাতোয়ারা। খাবার খেয়ে আমরা কালিকাঠির দিকে রওনা দিলাম। উদ্দেশ্য কালিকাঠির মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প। বিপুলদের বাড়ি থেকে সেই ক্যাম্পের দূরত্ব এক মাইল কিম্বা আরেকটু বেশি। বেলা দুটো কি আড়াইটা বাজে। আমরা এগোচ্ছি। সম্ভবতঃ মে মাসের মাঝামাঝি সময়, বৈশাখের শেষ কিম্বা জ্যৈষ্ঠের শুরু–এমন একটা সময়। ঠিক তারিখটা খেয়াল নেই। পূর্ণিমার প্লাবনের চাপে মেঠো রাস্তার দুপাশে ধানের ক্ষেত, মাঠ জলমগ্ন। হঠাৎ দেখলাম ভাসানী ন্যাপের ফজলু গ্রুপের একজন হাঁটুজল ভেঙ্গে মাঠ পেরিয়ে শহরের দিকে এগোচ্ছে। ইতিমধ্যে সে তার টাকা–পয়সা, অস্ত্রসহ সব কিছু হারিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় পৌঁছেছে। আমরা অবশ্য তাকে কিছু বললাম না। কারণ ট্রেজারীর অর্থ সংক্রান্ত কোন ঘটনার সঙ্গে কোনভাবে জড়িয়ে পড়া বা এসব ঘটনার কোন দায়–দায়িত্ব নেয়ার বিন্দুমাত্র মানসিকতা আমার নেই। যখন মুক্তিবাহিনীর মুল কমান্ডের কোনরকম সিদ্ধান্ত ছাড়াই ঘটনা ঘটে গেছে তখন এর পরবর্তী ঘটনাসমূহের দায়–দায়িত্ব নেয়া আমার জন্যে ঠিক হবে না। যাহোক আমরা এগোচ্ছি। কালিকাঠি ক্যাম্পের দু'জন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আমার খোঁজেই বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে আসছে। তাদের সঙ্গে দেখা হলে ওদের কাছে থেকে খারাপ পরিস্থিতির রিপোর্ট পেলাম। অবশ্য রিপোর্ট পাওয়ার পরেও আমি ক্যাম্পে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঠিক রাখলাম। কালিকাঠির এই ক্যাম্পে আমি প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ভাল একটা সংগঠন গড়ে তুলেছি এবং গ্রামবাসীকেও সচেতন করে তুলেছি যাতে তারা সশস্ত্র লড়াইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে থাকে। কিন্তু ট্রেজারীর অর্থ সংক্রান্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে সেই অবস্থাটা তখন আর নেই। সমগ্র এলাকায় বিশৃংখলা। আমরা কালিকাঠি থেকে আগত দুজন মুক্তিযোদ্ধাসহ এগোচ্ছি। শেষ বিকেল, প্রায় পাঁচটার দিকে কালিকাঠির পার্শ্ববর্তী

একটি গ্রামে গিয়ে আমরা হাজির হলাম। সেই গ্রামে গিয়ে খবর পেলাম, মুক্তিবাহিনীর কালিকাঠি ক্যাম্পে ফজলু গ্রুপের কয়েকজন নেতা গ্রেফতার হয়ে আছে এবং সমগ্র গ্রামবাসী উত্তেজিত তাদেরকে হত্যা করবার জন্য। খবরটা পেয়ে আমি আবার খবর পাঠালাম কালিকাঠি ক্যাম্পে যেন ফজলু গ্রুপের নেতৃবৃন্দকে ছেড়ে দেয়া হয়। কারণ মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে যদি জনগণের হাতে ফজলু গ্রুপের নেতারা নিহত হয় তাহলে এর দায়–দায়িত্বটা আমার ওপরেই বর্তাবে। এভাবে অযথা দায়িত্বভার কিম্বা বদনামের ভাগী আমি হতে চাইলাম না। এছাড়া তখন ফজলু গ্রুপকে শত্রু মনে করার মতো কোন অবস্থানও নেই। তারাও পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত। তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার এই নির্দেশ পাঠিয়ে আমি কালিকাঠির পার্শ্ববর্তী সেই গ্রামেই অবস্থান করছি। এর মধ্যে শত শত সাধারণ মানুষ এসে আমার সঙ্গে দেখা করল। তারা সবাই বলতে চাইল, মুক্তিযুদ্ধের যে অবস্থানটা এখানে সৃষ্টি করা হয়েছিল তা আর ধরে রাখা সম্ভব নয়। সমস্ত কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে কিংবা অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানীদের সফলভাবে প্রতিরোধ করা এখানে সম্ভব হবে না। বুঝলাম জনগণ হতাশাগ্রস্থ। তারা বিভ্রান্ত। আমি তাদেরকে বুঝাতে চাইলাম যে, এটা ছোট্ট একটা গ্রুপের কাজ, যদিও তারা মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় অংশ। তবুও এ কাজের মধ্য দিয়ে যে হতাশা নেমে এসেছে সেটা কাটিয়ে তুলতে হবে এবং মুক্তিযুদ্ধে আমাদেরকে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে। এটা বলার পরে সন্ধ্যার দিকে আমি আবার শহরে ফিরে এলাম। ফেরার পথে ট্রেজারীর অর্থ সংক্রান্ত ঘটনার মূল নায়ক এবং আমার বাল্যবন্ধু ফজলুর সঙ্গে দেখা হলো। আমাকে দেখে প্রথমে সে একটু ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সম্ভবতঃ সে ভেবেছে আমি হয়তো তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারি। কিন্তু আমি তেমন কিছুই বললাম না। ফজলু যখন বুঝলো যে আমি তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নই তখন সে আমাকে একটা অনুরোধ করলো। ও বললো, 'তুমি এখন জনগণকে বুঝিয়ে বললে জনগণ তোমার কথা শুনবে। জনগণ এখনও তোমার ওপর বিশ্বাস রাখে। কাজেই তুমি একটা উদ্যোগ নাও। জনগণকে শান্ত করো। মুক্তিযুদ্ধকে আবার সংগঠিত করে পাঞ্জাবীদের প্রতিরোধ করার মতো একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করো।' আমি বললাম, 'এটা খুবই বিলম্বিত হয়ে গেছে। এখন, এই অবস্থার মধ্যে ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে নেই। সবকিছুই নতুন করে আবার শুরু করতে হবে। পুনর্গঠিত করতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের, সংগঠিত করতে হবে। তারপরেই কেবল মুক্তিযুদ্ধ সম্ভব। এখানে এই মুহূর্তের কোন প্রচেষ্টা কোনরকম ফলই বয়ে আনবে না।'

ফজলুর সঙ্গে এটাই আমার শেষ দেখা। এর দেড়মাস পরে সে পিরোজপুরেরই গ্রামীণ এলাকায় বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পাকিস্তানী দালালদের হাতে বন্দী হয় এবং পিরোজপুরে পাকিস্তানীদের ক্যাম্পে তাকে নিয়ে আসা হয়। অমানুষিক নির্যাতনের পর পাঞ্জাবীরা বলেশ্বর নদীর ঘাটে ফজলুকে গুলী করে হত্যা করে। যখন গুলী করা হয় সেসময় শহীদ ফজলু মুষ্ঠিবদ্ধ হাত তুলে জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে বুক উঁচু করে দাঁড়ায়। পাকিস্তানীদের বুলেট তার বুকের পাজর ঝাঁজরা করে দেয়। দূরে দাঁড়িয়ে নিরস্ত্র মানুষ অশ্রুসজল চোখে তাদের বীর সন্তানকে চির বিদায় জানায়।

উগ্র রাজনৈতিক মনোভাব এবং চরমপন্থী মানসিকতায় গড়ে উঠলেও শহীদ ফজলু মুক্তিযুদ্ধের একজন নিবেদিত প্রাণ সেনানায়ক ছিলেন। এই সময় ফজলু গ্রুপের নেতৃস্থানীয় শহীদ বিধান মন্টু, শহীদ সেলিমসহ বেশ ক'জন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানীদের হাতে গ্রেফতার হন এবং নির্মমভাবে নিহত হন।

আওয়ামী ছাত্রলীগের নেতা, আমারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সহপাঠী শহীদ ওমর ফারুক পিরোজপুরে ঘটমান অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে বরিশালে আত্মগোপন করেন। সেখানে তিনি গ্রেফতার হলে পাকিস্তানীরা তাকে বরিশাল টার্মিনালে নিয়ে আসে। সেখানে পাঞ্জাবী ও জামাত-মুসলিম লীগের আল-বদর, রাজাকাররা শহীদ ওমর ফারুককে বলে যে, তিনি যদি পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলেন তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না। ওমর ফারুক এই প্রস্তাব প্রচন্ড ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে জাগ্রত কণ্ঠে জয় বাংলা ধ্বনি দিতে থাকেন। বার বার বলা সত্ত্বেও ওমর ফারুক যখন পাকিস্তান জিন্দাবাদ বললেন না তখন পাকিস্তানী সৈনিকেরা একটি বিভৎস, অমানবিক কান্ড ঘটায়। একটি বাংলাদেশী পতাকার স্ট্যান্ড উঠিয়ে সেটার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বসিয়ে দেয় ওমর ফারুকের মাথায়। শহীদ ওমর ফারুকের মাথায় বিদ্ধ হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার খুঁটি। ওমর ফারুক শেষ বারের মত দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন জয় বাংলা।

ফজলুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমরা শহরে ফিরে এলাম। প্রায় সাত আটজন মুক্তিযোদ্ধাসহ আমি শহরে ঘুরে বেড়ালাম। সমগ্র শহর মৃতপুরীর মতো। দোকানপাট সব বন্ধ। এক অর্থে শহরে কেউই নেই। জনমানবশূন্য পরিত্যক্ত শহরের মতো অবস্থা। কেবল মাঝে মাঝে দু'একটা ঘরে টিম টিম করে আলো জ্বলছে। তাদের সঙ্গে আলাপ করে বোঝা গেল যে তারা খুবই সন্ত্রস্ত এবং ভীত অবস্থায় রয়েছে। তারা যে কোন সময় শহর ত্যাগ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত। তারা বুঝতে পারছে, মুক্তিবাহিনী যখন একটা বিশৃংখল অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে, জনগণ যখন বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেছে তখন পাঞ্জাবীরা এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে আক্রমণ করে বসবে। যাহোক শহরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে আমরা এক সময় পিরোজপুর পৌরসভার পাশে অবস্থিত আশুবাবুর পুকুরপাড়ে গিয়ে বসলাম। বিশ্রাম নেয়ার পাশাপাশি পরবর্তী কর্মসূচী এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যই বসা। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাড়িতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসেরের কাছে অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে সাহায্য চাইব। বিশেষ করে সেসময় আমাদের প্রয়োজন ছিল গানবোট বিধ্বংসী যে কোন অস্ত্র। আগেই বলেছি মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে শেখ নাসের একবার পিরোজপুরে এসেছিলেন। সে সময় তিনি আভাস দিয়েছিলেন অস্ত্রের ব্যাপারে সহায়তা করতে পারবেন। এ কারণেই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে তার কাছে যাবো। সেখানে গিয়ে যদি অস্ত্র পাই তাহলে আবার এলাকায় ফিরে আসবো। আরো একটা সিদ্ধান্ত আমরা নিলাম-গোপালগঞ্জ যাওয়ার আগে দুজন দুজন মুক্তিযোদ্ধার স্কোয়াড করে এলাকার যারা চিহ্নিত রাজাকার এবং মৌলবাদী তাদের বাড়ীর সামনে গ্রেনেড চার্জ করবো। উদ্দেশ্য ওদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করা এবং ভবিষ্যতে এরকম হামলা আরো হতে পারে সেটা বুঝিয়ে দেয়া। পাকিস্তানীদের সঙ্গে তাদের সখ্যতা এবং বন্ধুত্ব

যেন তারা সীমিত রাখে সেজন্য আমরা তাদের ওপর একটা মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে চাইছিলাম। পরবর্তী দু'ঘন্টায় আমরা পরিকল্পনামাফিক দশ–বারোটা গ্রেনেড চার্জ করলাম চিহ্নিত পাকিস্তানপন্থীদের বাড়ির সামনে, দেয়ালের পাশে, ঘরের সামনে। তারপরে আমরা রাতের অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে শহরের বাইরের দিকে চলে গেলাম। আগেরবার অস্ত্রের সন্ধানে যে চালতাখালি মুলঙ্গীবাড়িতে গিয়েছিলাম সেই পথ ধরে আস্তে আস্তে এগোচ্ছি। এই পথ ধরেই গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া যাওয়া যায়। চালতাখালি মুলঙ্গিবাড়ির পরে নাজিরপুর থানা, তারপরে মাটিভাঙা এবং তারও পরে গোপেরডাঙ্গা হয়ে গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া। পুরো পথটাই যেতে হবে পায়ে হেঁটে। মোটামুটি সারাটা রাতই আমরা হাঁটলাম। এক সময় আমরা এক গরীব কৃষকের বাড়ীতে হাজির হলাম গিয়ে। তাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বুঝিয়ে বললাম, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা বাকী রাতটা একটু বসব। বিশ্রাম নেবো। ভোরে আবার চলে যাব।' কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে খুব সকালে আবার আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। এক সময় বলেশ্বর নদীর পাড়ে গিয়ে একটা নৌকা পেলাম, যেটা ভাড়া নেয়া যাবে। এ ধরনের নৌকাকে টাপুরে–নৌকা বলে। এই টাপুরে নৌকা করে আমরা নাজিরপুর হয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে রওনা হলাম। সেদিন বিকেলেই আমরা গোপালগঞ্জের গোপেরডাঙ্গায় গিয়ে পৌঁছলাম। এখানে আমার এক ভগ্নিপতির বাড়ি ছিল। এই ভগ্নিপতি অবশ্য কড়া মুসলিম লীগার এবং কড়া পিস কমিটির লোক। অবশ্য তখনও গোপেরডাঙ্গা অঞ্চলে পিস কমিটি কিম্বা মুসলিম লীগের কার্যক্রম শুরু হয়নি। কাজেই তিনি তখনও নিরপেক্ষ অবস্থানেই ছিলেন। আমাদেরকে তিনি উৎসাহ কিম্বা সমর্থনও দিচ্ছেন না আবার বিরোধিতাও করছেন না।

ভগ্নিপতির বাড়ী থেকে সাত আট মাইল দূরবর্তী বাঁশবাড়িয়া নামক একটি গ্রামেও আমরা আস্তানা গাড়লাম। সেখানে আমার বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী মিন্টনের ভগ্নিপতির বাড়ি। এরা অবশ্য আওয়ামী লীগের লোক। আওয়ামী লীগের সমর্থক এবং সংগঠক। এদের বাড়িটাই আমরা আমাদের গোপন আশ্রয়স্থল হিসেবে নির্ধারণ করলাম।

বাঁশবাড়িয়া থেকে হেঁটে আমরা বঙ্গবন্ধুর টুঙ্গিপাড়ার বাড়িতে গেলাম। সকাল প্রায় সাড়ে নয়টায় সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। শেখ নাসেরকে পেলাম। সারা বাড়িতে প্রচুর লোক। এমনিতেই পরিবারটি বিরাট। এলাকার সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবারের মধ্যে বঙ্গবন্ধু পরিবার অন্যতম। সেই পরিবারের সবাই তখন বাড়িতে উপস্থিত। অন্যান্য লোকজনও আছে। সব মিলিয়ে মনে হলো তিন/চারশ লোক হবে। আমি শেখ নাসেরকে বললাম, 'ভাই, এত লোকজন আপনাদের বাড়িতে। পাঞ্জাবীরা যদি হামলা করে তাহলে কি করে বাঁচবেন?' শেখ নাসের বলেন, 'আমাদের ব্যবস্থা আছে। তুমি চিন্তা কোরো না।' তিনি আমাদের নাস্তা খেতে দিলেন। নাস্তা খাওয়া হলো, চা খাওয়া হলো। এরপর আমরা বঙ্গবন্ধুর বাবা–মার সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁদেরকে সালাম করলাম, দোয়া চাইলাম। শেখ নাসেরের সঙ্গে এরপর আমরা আসল কাজের কথা পাড়লাম। বললাম, 'আমাদের তো এখন গানবোট বিধ্বংসী কিছু একটা দরকার। আপনি বলেছিলেন যেন এ ধরনের কোন প্রায়োজনে আপনার সঙ্গে এসে যোগাযোগ করি, যেন আপনার শরণাপন্ন হই। আপনি জানেন যে বরিশাল শহর আক্রান্ত হয়েছে। সেখানে বিমান হামলা হয়েছে। গানবোট থেকে কামান দাগা হয়েছে। বরিশালের নিয়ন্ত্রণ এখন বলতে গেলে পাঞ্জাবীদের হাতে। এমন একটা অবস্থায় আমাদের এখন গানবোট মারার অস্ত্র দরকার।' আমাদের কথা শুনে তিনি খুব বিব্রত এবং অসহায় বোধ করলেন বলে মনে হলো। তিনি বললেন, 'আসলে এ মুহূর্তে আমার কাছে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যে তোমাদের জন্য কোন কিছু করতে পারি। তখন বলেছিলাম, কারণ তখন বললে হয়তো একটা ব্যবস্থা করতে

পারতাম। কিন্তু এখন আমার কাছে কোন উপায় নেই। এখন সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। সমস্ত আয়োজন যার যার তার তার অবস্থায় চলে গেছে। এখন আর কিছু দিতে পারছি না।'
এরপর অবশ্য শেখ নাসের আমাদের অনুরোধ করলেন দুপুরের খাওয়া দাওয়া যেন করেই যাই। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গেছি। আমরা মুক্তিযোদ্ধা। আদর আপ্যায়নতো স্বাভাবিক। অবশ্য আমরা দাওয়াতটা গ্রহণ করলাম না। সবিনয়ে বললাম, 'আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে। দীর্ঘ পথ। অন্য সময় খাবো।' এরকম কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ গানবোটের আওয়াজ ভেসে এলো।
বঙ্গবন্ধুর বাড়ির পেছনের নদীপথে গানবোট আসছে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে হামলা চালানোর জন্য। আমরা প্রথমে একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম ঠিকই, তবে কিছুক্ষণের মধ্যে পরিস্থিতিটা সামলে নিয়ে আমি আমার সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধাদের বললাম গানবোটের আক্রমণ মোকাবেলায় প্রস্তুত হওয়ার জন্য। কিন্তু শেখ নাসের আমাকে বাধা দিলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা সাত-আট জন মুক্তিযোদ্ধা খুব একটা ক্ষতি করতে পারবে না গানবোটের। তোমরা এখানে প্রতিরোধ গড়ে তুললে পরবর্তীতে হয়তো পাঞ্জাবীরা বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে বেশী অত্যাচার চালাবে। জ্বালিয়েও দিতে পারে। কাজেই আমার মনে হয় এই মুহূর্তে কিছু না করে তোমাদের আস্তে আস্তে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়াই ভাল হবে।' আমরা বললাম, 'আমরা না হয় নিরাপদ স্থানে চলে গেলাম। কিন্তু আপনাদের নিরাপত্তার কি হবে?' তিনি বললেন, 'আসলে আমরা আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছি।' বেশ কিছু দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিপডিঙ্গির ব্যবস্থা করা ছিল। শেখ নাসের পরিবারের অন্যান্যদের নিয়ে ছিপডিঙ্গিগুলোতে উঠলেন এবং ডিঙ্গিগুলো অতি দ্রুত পার্শ্ববর্তী অর্ধেক জলে ডোবা বিস্তৃত পাটক্ষেতের মধ্যে ঢুকে গেল। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির পাশে এই বিলগুলোতে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত পাটক্ষেত। একবার কেউ এই দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে গেলে একমাত্র হেলিকপ্টার ছাড়া অন্যকিছুর মাধ্যমে তাকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। শেখ নাসের যখন সবাইকে নিয়ে পাটক্ষেতে ঢুকে পড়লেন তখন আমরাও ধীরে ধীরে রওনা দিলাম। প্রায় দশ বারো মাইল বিল অতিক্রম করে মাটিভাঙ্গা এবং বাঁশবাড়িয়া অঞ্চলের পেছনে সম্ভবত শাপলা বাগদা বিল এলাকায় গিয়ে আমরা হাজির হলাম। চারিদিকে বিল আর বিল। মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপের মতো। মাত্র কয়েক বিঘা শুকনা জমি এবং এইটুকু দ্বীপে কয়েক হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। আমরাও সেখানে গিয়ে হাজির। আমাদের সকলের কাছেই গোপনে লুকানো অস্ত্র। কিন্তু সঙ্গে খাবার দাবারতো কিছু নেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল প্রায় আড়াইটা কি তিনটা বাজে। আমাদের সমস্ত শরীর ভেজা। কাপড়চোপড় ভেজা। আস্তে আস্তে শরীরের উত্তাপে কাপড় শুকাচ্ছে। ক্ষুধা বাড়ছে। দেখতে পাচ্ছি কিছু কিছু লোক তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা সরঞ্জামাদি বের করে রান্নার আয়োজন করছে। আবার কারো কারো কাছে শুকনা মুড়ি, চিড়া এই ধরনের খাবার দ্রব্য আছে। মোদ্দাকথা সবাই কোন না কোন খাবার খাওয়ার এন্তেজাম করছে। কিন্তু আমাদের কাছে কোন খাবার নেই। কি আর করব? চুপচাপ বসে আছি। আমাদের ধূমপান বা এই ধরনের কোন নেশাও নেই। সময় কাটানোই অসহ্য হয়ে পড়েছে, যাকে বলে বেগতিক অবস্থা। চুপচাপ বসে আছে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা যারা দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বাপ-মা-ভাই-বোন-স্ত্রী এবং নিশ্চিত আপাত সুখী গৃহকোণ ছেড়ে, যদিও তাদের আয়োজন কম। অন্তত স্বপ্ন বাস্তবায়নে সাফল্য বয়ে আনার মতো যথেষ্ট নয়।
যাহোক এভাবে ঘন্টাখানেক বসে থাকার পর ছিপছিপে লম্বা এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার নাম কি জিয়া?' প্রশ্ন শুনে আমি প্রথমে খানিকটা

খাবড়ে গেলাম। পরবর্তীতে চিন্তা করলাম, সবাইতো আমরা দ্বীপে। ওরাও পাঞ্জাবীদের ভয়ে পালিয়ে এসেছে, আমরাও পালিয়ে এসেছি। আর আমাদের কাছে অস্ত্র আছে সুতরাং পরিচয় দিতে তেমন অসুবিধা নেই। বললাম 'হ্যাঁ, আমার নাম জিয়া। কিন্তু কিভাবে আপনি চিনলেন?' লোকটি বললেন, 'ছোটবেলায় আমি আপনাকে পাখি শিকার করতে দেখেছি। খুব ভাল শিকার করতেন আপনি।' বললাম, 'ভালই, চিনে ফেলেছেন। আর কি খবর টবর?' বললেন, 'ভালই।' বলে তিনি আবার চলে গেলেন। গিয়ে তার সঙ্গের আত্মীয় স্বজন, পরিবারবর্গের সঙ্গে আলাপ করে আবার ফিরে এসে আমার কাছে জানতে চাইলেন, 'আপনারা কি দুপুরে খেয়েছেন?' আমরা বললাম, 'না, আমরা খাইনি।'

'আসেন, আমাদের সঙ্গে খাবেন।' এরচেয়ে বড় আহবান, এরচেয়ে বড় দাওয়াত, নিমন্ত্রণ আর কি হতে পারে? তারপরেও আত্মসংবরণ করে বললাম, 'দেখুন আমরা খেলেতো আপনাদের অসুবিধা হতে পারে।' তিনি বললেন, 'না, আমাদের অসুবিধা হবে না। আপনারা আসেন। আপনারা না খেয়ে আছেন। আমরা জানি আপনি মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার। আমাদেরওতো কর্তব্য আছে।' মনে হলো ভদ্রলোক যথেষ্ট সংবেদনশীল। আমরা আর দেরী না করে তার সঙ্গে গিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। ভদ্রলোকের মা-বোন এরা সবাই মিলে আমাদের খাবার পরিবেশন করল। মেনু হচ্ছে-ভাত, ডিম ভুনা, মরিচ পোড়া দিয়ে আলুভর্তা আর ঘন করে রান্না করা ডাল। নিরেট, নিখাদ বাঙালী খাবার পরিবেশন করা হলো। আমরাও বলতে গেলে হাপুস হুপুস করে প্রচুর খেলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরাতো মুক্তিযোদ্ধা, আমরাতো সশস্ত্র। কিন্তু কোনরকম আক্রমণ হলে আপনাদের কি উপায় হবে?' তিনি বললেন, 'না আমরা এখানে বেশিক্ষণ থাকবো না। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে যাব। বাড়ি কাছেই, এক-দেড় মাইলের মধ্যে। বিলের অপর পাড়েই গ্রাম।' তখন আমি বললাম, 'তাহলে আমাদেরওতো যেতে হয়। ঘাঁটি এলাকায় ফিরতে হবে।'

বিকেলের দিকে রওনা দিলাম বাঁশবাড়িয়ার দিকে। বাঁশবাড়িয়ায় আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী মিন্টনের ভগ্নিপতির বাড়ি। এই ভগ্নিপতির নাম দুলাল। দুলাল বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে যথেষ্ট সক্রিয় ভুমিকা পালন করেছে। তার বাড়িতে আমাদের উপস্থিতির জন্য তাকে যথেষ্ট ভোগান্তির সম্মুখীনও হতে হয়েছে সে সময়। যাহোক আমরা সেই বাড়িতে আবার এলাম। দু'একদিন সেখানে অবস্থান করলাম। এরপর আমার বোনের বাড়িতে যাওয়া দরকার হয়ে পড়লো। কারণ সেই বাড়িতে পিরোজপুর থেকে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আমার জন্য খবর নিয়ে আসবে- এমন একটা পরিকল্পনা রয়েছে। এজন্যেই আগে বোনের বাড়ি গিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা এরপর আমরা কোন্ পথে এগোব। বোনের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বাঁশবাড়িয়া নদী অতিক্রম করে শুরু হল হাঁটা। হেঁটে হেঁটে প্রায় সাত আট মাইল রাস্তা পেরিয়ে মধুমতি নদীর তীরে আমরা গিয়ে হাজির। মধুমতি নদী অতিক্রম করে যেতে হবে গোপেরডাঙ্গা পাটগাতি বাজারে। নদীর পাড়ে দু'একটা ছোটখাট দোকান, রেস্তোরাঁ। অবশ্য ক্রেতাদের তেমন ভীড় সেখানে নেই। তবে অল্পবয়স্ক কয়েকটা লোক যাদের চেহারা এবং প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন তারা একটা দোকানে বসে আছে। আমাদের দেখেই তারা নিজেদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করে একজন লোক আমাদের দিকে এগিয়ে এল। আমাদের সামনে এসে সে হঠাৎ করেই তার হাতের শক্ত লাঠি দিয়ে সজোরে আমার মাথা বরাবর আঘাত হানল। সঙ্গে সঙ্গে গালি দিয়ে উঠল, 'শালা হিন্দু, ভারত যাচ্ছিস্! সোনাগয়না নিয়ে যাচ্ছিস।' আমি মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিলাম যে এরা লুটেরা। এরা লুণ্ঠনকারী এবং আমি মুক্তিযোদ্ধা। কাজেই আমাকে বাঁচার মতো অবস্থান সৃষ্টি করতে হবে। লাঠির বাড়ি সজোরে, দ্রুত নেমে আসছে দেখে আমি ঝট করে বিদ্যুৎগতিতে সরে দাঁড়ালাম। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো লোকটার প্রচেষ্টা।

লাঠির বাড়ি আঘাত হানল মাটিতে। আমি আর বিলম্ব না করে কোমর থেকে পিস্তল বের করলাম। পিস্তল বের করে আমি যখন তাকে হাত উঁচু করতে বললাম তখন সে উল্টো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে, দৌড়ে গ্রামের মধ্যে চলে গেল। ঐ দোকানে জটলা করে থাকা তিন চারজনও সুড়সুড় করে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিল। আমরা এই ঘটনার পর একটু তাড়াহুড়া করে খেয়ায় উঠার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। যেখানটায় পারাপার সেখানে নদীতে একটু চড়া পড়ে গেছে। খেয়ায় উঠতে হলে প্রায় দু'তিনশ' গজ হাঁটু পানিতে হেঁটে যেতে হতো। আমার বোনের বাড়ি থেকে জায়গাটার দূরত্ব মাইল তিনেক হবে। আমরা খেয়ায় ওঠার জন্য যখন কাছাকাছি পৌঁছে গেছি সে অবস্থায় হঠাৎ গ্রামের ভেতর থেকে প্রায় তিন-চারশ লোক ঢাল, বল্লম, সড়কি ইত্যাদি নিয়ে আলী, আলী ডাক ছেড়ে আমাদের দিকে তেড়ে এল। এই তিন-চারশ লোক যে আমাদের ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছে, তাদেরকে আবার দশ পনেরোজন লোক ঠেকাতে চাচ্ছে যাতে তারা আক্রমণ না করে। বেশ উত্তেজনাপূর্ণ একটা অবস্থা। আমরা বুঝতে পারলাম যে ধরনের আক্রমণ হতে যাচ্ছে এখন বেশ কিছু লুণ্ঠনকারী লোককে হত্যা করা ছাড়া আমাদের বাঁচার কোন বিকল্প নেই। আমার সঙ্গে সাত-আটজন মুক্তিযোদ্ধা। আমি সবাইকে গ্রেনেড প্রস্তুত করতে বললাম। তারাও প্রস্তুত। চাবি খোলা বাকি শুধু। আর আমাদের সঙ্গে রয়েছে দুটো পিস্তল। সেই দুটোও আমরা প্রস্তুত করে ফেললাম এবং ভিন্ন একটা কৌশল অবলম্বন করলাম। আমি ভাবলাম যদি ওরা আমাদের খুব কাছে চলে আসে এবং সড়কি ছুঁড়ে দিতে পারে আমাদের ওপর তাহলে হয়ত এই উত্তেজিত লুণ্ঠনকারীদের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। তখন তাদেরকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় থাকছে না। এই পরিস্থিতিটা এড়ানোর জন্য তাৎক্ষণিকভাবে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ভিন্ন কৌশল গ্রহণের। ওরা যখন প্রায় দুই/আড়াইশ গজ দুরত্বে তখন আমি চিৎকার করে বললাম, 'আমি মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার জিয়া। যদি তোমরা আর সামনে আগাও তাহলে আমাদের কাছে যে অস্ত্র আছে সেটা দিয়ে আমরা ট্যাংক ধ্বংস করতে পারি এটা তোমাদের ওপর চার্জ করবো। গ্রামের বহুলোক মারা পড়বে। আমি তোমাদের অনুরোধ জানাচ্ছি তোমরা আর এগোবে না।' দেখা গেল আমি যখন দুই/তিন বার ধমকের সুরে কথাগুলো বললাম তখন যে লোকগুলো এই লুণ্ঠনকারীদের প্রথম থেকে বাধা দিচ্ছিল (বয়সে তরুণ, স্কুল-কলেজ- ইউনিভার্সিটির ছাত্র, শহর থেকে পালিয়ে গিয়ে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে) তারা তখন তাদের খুঁটি শক্ত করতে পারল। তারা বুঝতে পারল আমরা আসলেই মুক্তি বাহিনীর লোক। তা না হলে এসব গ্রেনেড, ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র কার কাছে থাকবে? সেই সময় তারা সজোরে নিজ গ্রামবাসীদের প্রতিরোধ করতে শুরু করল এবং একপর্যায়ে আক্রমণোদ্যত জনতা থেমে গেল। তখন স্কুল কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটির সেই ছেলেগুলো আমাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল, 'আপনারা কারা?' আমি বললাম, 'আমরা মুক্তিবাহিনী। আমি এ অঞ্চলের কমান্ডার, পিরোজপুরে আমার বাড়ি। সমগ্র এলাকায় আমি মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন করেছি এবং এখনও করছি। আমার নাম জিয়া।' তখন ওরা বলল, 'আমরা কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র। আমরা যেভাবে ওদের ঠেকিয়ে রাখতে চাচ্ছিলাম সেটাতো আপনারা দেখলেন। এখন আমরা আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আপনারা আসেন।' ওরা কাছে এগিয়ে এলো এবং এসে খুব আন্তরিকভাবেই আমাদের জড়িয়ে ধরল। ওরাওতো পাঞ্জাবীদের আক্রমণের মুখে গ্রামে আশ্রয় নিয়ে আছে। মুক্তিবাহিনী তথা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ওরা সক্রিয় শক্তি। গ্রামে ওরা এমন কোন সংযোগ পাচ্ছে না যাতে করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়া যায়। কোথায় মুক্তিযুদ্ধের ঘাঁটি, কোথায় মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডাররা অবস্থান করছে-এগুলো যেহেতু খুবই গোপন সেহেতু তাদের পক্ষে জানা সম্ভব হচ্ছে না। তারাতো আমাকে পেয়ে প্রচন্ড আবেগে আপ্লুত। আমাদেরকে জড়িয়ে

ধরে তারা বিভিন্ন খাওয়া-দাওয়া করানোর প্রস্তাব করল। আমরা বললাম, 'এটা ঠিক হবে না। আমাদের এখন যেতে হবে। দুপুরও গড়িয়ে গেছে। আমাদের হাতে কাজ আছে।' এত কিছু বলার পরেও ওরা কিছুতেই ছাড়বে না। নাছোড়বান্দা। পাশেরই একটা বাড়িতে ওরা আমাদের চা-নাস্তা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করল। তখনও কিন্তু ঐ লোকটা খুব উত্তেজিত যে আমার ওপর প্রথমে আঘাত করেছিল। তার উত্তেজনার কারণ হচ্ছে, সে ঐ গ্রামের সেরা মাস্তান শ্রেণীর লোক এবং সেরা লুণ্ঠনকারী। এখন এই বীরপুরুষকে আমার পিস্তলের মুখে লাঠি ফেলে দিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে পালাতে হয়েছে-এই ঘটনা তার জন্য খুবই অপমানজনক। তাই যখন ছাত্র-জনতা প্রায় সবাইকে নিরস্ত্র করে ফেলেছে তখনও সে তার হাতের সেই ঢাল-সড়কি ছাড়ছে না। আলী আলী বলে দু'একটা লাফ দিচ্ছে এবং বলছে, 'আমারে পিস্তল দেহালো ক্যা, আমারে পিস্তল দেহালো ক্যা?' অর্থাৎ এই অপমানটা কেন তাকে করা হলো। এই অপমানবোধের দুঃখ এবং বেদনা নিয়েই সে চিৎকার করছে। অবশ্য দেখা গেল যে অল্পক্ষণের মধ্যেই সমগ্র ঘটনা আমাদের পক্ষে এসে গেল। স্থানীয় মুরুব্বীরা আমাদের কাছে মাফ চাইলেন। পিস্তল দেখানোয় কম্পমান মাস্তানটিও এক পর্যায়ে প্রায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার মতো আমাদের কাছে মাফ চেয়ে চলে গেল। চা-নাস্তা খেতে খেতে স্থানীয় সংগ্রামী ছাত্র, শ্রমিক এদের সঙ্গে পরিচয় হলো। মোঃ শাজাহান নামে একজনের সঙ্গে আলাপ হলো-যিনি খুলনার একটি পাটকলের শ্রমিক নেতা। তিনি আমাদের পরিচয় যখন পেলেন যে আমরা মুক্তিযোদ্ধা তখন আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় করলেন এবং তার ঠিকানা দিলেন যেন আমরা বিপদে পড়লে তার ওখানে চলে যাই। যাহোক মধুমতি নদী পার হয়ে আমরা প্রথমে গিয়ে উঠলাম বোনের বাড়িতে। কিন্তু সেখানে গিয়েই বুঝলাম বাড়ির পরিস্থিতিটা বেশ পরিবর্তিত আকার ধারণ করছে।

মধুমতি নদীতে গানবোট আসার পরে আমার ভগ্নিপতির মেজাজ পাকিস্তানী কায়দায় বেশ উত্তেজিত হওয়ার প্রক্রিয়া তখন চলছে এবং তার এ উত্তেজনা বিভিন্ন ভর্ৎসনার আকারে আমার বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়ের ওপর পড়ছে। ফিরে আসার পর আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি আমার আগমন আর এই বাড়িতে হোক এটা তারা চাচ্ছে না। তখন আর কি করা। অগত্যা সেখান থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ঐ এলাকার ছেলে মোহাম্মদ একরের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। একরের বৃদ্ধা মা আমার খাওয়া দাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। নিজের হাতে রান্না করলেন। একরের একটা বোন ছিল। সে বোন থাকতো খুলনায়। পাকিস্তানীরা সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করার পর খুলনা শহরের নব্বই ভাগ লোক পালিয়ে চলে এসেছে গ্রামাঞ্চলে। একরের বোনও তার বাচ্চাসহ চলে এসেছে গ্রামের বাড়িতে। এই মেয়েটি এবং তার মা আমার খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য ব্যাপারে কি যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল তা বুঝিয়ে

বলতে পারবো না। অথচ আমি আমার নিজের বোনের বাড়িতে থাকতে পারছি না। বোনের বাড়ির পিছনেই ওদের বাড়ি। অপেক্ষাকৃত গরীব ওরা। তারপরেও ওদের আন্তরিকতায় বিন্দুমাত্র ফাঁকি নেই। একর ঐ অঞ্চলে আওয়ামী লীগের সক্রিয় যুবকদের মধ্যে একজন। কাজেই সেও জীবনের সমস্ত রকম ঝুঁকি নিয়ে আমাকে আশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে।

যাহোক, আমরা দুদিন সেখানে থাকলাম। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গেলাম। অবশ্য আগেই আমরা খবর পেয়েছি যে, বঙ্গবন্ধুর বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ওই বাড়িতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাবা–মা কারো সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। কারণ নিরাপত্তার কারণে তাঁরা পার্শ্ববর্তী আত্মীয়–স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর বাড়িটা পুড়িয়ে একেবারে ছাই করে দেয়া হয়েছে। ওখানকার যারা নিকট–প্রতিবেশী গরীব কৃষক বা মজুর তারা জীবনের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে পারছে না। মাটির সঙ্গে তাদের শেষ যে বন্ধন সেটা ছিন্ন করে কোথাও যাওয়ার উপায় তাদের নেই। ওদের কাছে শুনলাম যে পাকিস্তানীরা বঙ্গবন্ধুর বাবাকে এবং মাকে অপমান করেছে। পাকিস্তানীরা যখন বাড়িতে ঢোকে তখন বঙ্গবন্ধুর বাবা নামাজ পড়ছিলেন। নামাজ থেকে তাঁকে উঠিয়ে এনে হিন্দু কাফের বলে গালাগালি এবং আরো নানান অকথ্য ভাষায় যথেষ্ঠ অপমান করেছে। ঘটনাটি শোনার পর আমাদের খারাপ লাগল। কিন্তু করারতো কিছু নেই। শেখ নাসের কিংবা সংশ্লিষ্ট কারো সঙ্গে দেখা করার উপায় নেই। ফিরে এলাম। এই ঘটনার দুই কি তিনদিন পর আবার এই এলাকায় পাঞ্জাবীদের আনাগোনা টের পেলাম আমরা। ওরা গানবোটে করে মধুমতি নদীতে টহল দিচ্ছে এবং কয়েকটা গানবোট একদিন সন্ধ্যাবেলা মধুমতি নদীতে নোঙর করল। এটা আমাদের খুব সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়াল। বঙ্গবন্ধুর বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার পর মধুমতি এলাকায় এতো পাঞ্জাবীদের সশস্ত্র অবস্থান কেন? আমার সন্দেহ হল এ অঞ্চলে আমাদের উপস্থিতির ব্যাপারে পাঞ্জাবীরা হয়ত কোন সংবাদ পেয়েছে। এটা ভেবে সতর্কতা অবলম্বন করলাম। আমরা খুব সতর্কভাবে, নৌকাতে চড়ে, গানবোটের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে ঐ শ্রমিকনেতা শাজাহান সাহেবের বাড়িতে চলে গেলাম। শাজাহান সাহেব সানন্দে আমাকে আশ্রয় দিলেন। সেখানেও তার বৃদ্ধা মা আর বোন জীবনের ঝুঁকি নিলেন আমাদের আশ্রয় দিতে গিয়ে। একজন শ্রমিক নিশ্চয়ই খুব ধনী লোক নন, তবু আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা, আমাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে তিনি যে মনের পরিচয় দিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যে দৃঢ় মানসিক অবস্থানের পরিচয় দিয়েছেন সেটা কিছুতেই ছোট করে দেখা যায় না। আমরা তাঁর ওখানে থেকে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ফরিদপুর এবং নড়াইল অঞ্চল দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে আবার সুন্দরবনের ঘাঁটিতে ফিরে যাব। এই চিন্তা করে আমি আমার সঙ্গী মুক্তিবাহিনীর একটা অংশকে বাঁশবাড়িয়ায় আমার বন্ধু মিন্টনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। আর আমিসহ আরো তিনজন রওনা দিলাম ভারতের পথে। স্থানীয় পাটগাতির একজন মুক্তিযোদ্ধা, শেখ দেলোয়ার এবং সঞ্জীব কুমার–এ তিনজন মুক্তিযোদ্ধা আমার সঙ্গী। আমরা হাঁটা শুরু করলাম ভোরে। হাঁটছি, হাঁটছি–অতিক্রম করছি মাইলের পর মাইল। প্রায় চব্বিশ ঘন্টা বিরামহীনভাবে হেঁটে পঁয়ত্রিশ মাইলের মতো রাস্তা অতিক্রম করলাম। এক সময় আমরা সীমান্তের কাছাকাছি কোন একটা অঞ্চলে এসে পৌছলাম। মোল্লারহাট অঞ্চল থেকে আমরা গাইড হিসেবে একজন লোককে সঙ্গে নিয়েছি যে আমাদেরকে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে। কিন্তু আমরা যখন সীমান্তের কাছাকাছি পৌছলাম তখন সীমান্তে চলছে প্রচন্ড গোলাগুলী। সেই মুহূর্তে কোন অবস্থাতেই সীমান্ত অতিক্রম করা সম্ভব নয়। সারারাত ধরে গোলাগুলী চলছে তো চলছেই। এই গোলাগুলীর মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়াই হয়ে উঠেছে অনিশ্চিত। সিদ্ধান্ত পাল্টানো

ছাড়া গত্যন্তর নেই। বাঁশবাড়িয়া হয়ে সুন্দরবনে ফিরে যাওয়াই মনস্থ করলাম। সুন্দরবন ফিরে গিয়ে সেখান থেকে চেষ্টা চালাব গানবোট বিধ্বংসী অস্ত্রসহ ভালো অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতে পারি কিনা। আর আমাদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হবে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের বিচ্ছিন্ন অবস্থান থেকে সুন্দরবনের ঘাঁটিতে ফিরিয়ে আনা। এই চিন্তা করেই আবার আমরা মোল্লারহাটে ফিরে এলাম। এ পর্যায়ে আমরা প্রায় চল্লিশ–পঁয়তাল্লিশ মাইল কি তারও বেশি রাস্তা অতিক্রম করেছি। সীমান্তের কাছাকাছি যাওয়া এবং ফেরা মিলিয়ে এইরকম দূরত্বই হবে। আমরা হাঁটছি খালি পায়ে। পরনে গ্রামের সহজ সাধারণ মানুষের বেশ–লুঙ্গি, লম্বা পাঞ্জাবীর মতো কুর্তা। তবে কোমরে অস্ত্র ঠিকই আছে আমাদের, লুকিয়ে রাখা। আমাদের চেষ্টা, কেউ যেন দেখে আমাদেরকে অন্যরকম কিছু না ভাবে। যাহোক, এই বেশে আমরা মোল্লারহাটের কাছাকাছি একটা জায়গায় ফিরে এলাম। বন্দর এলাকা। নামটা মনে নেই। বন্দরে এসে নিজেদের খুব পরিশ্রান্ত মনে হল। দুপুর গড়িয়ে গেছে। যে নদীটার সামনে আমরা উপস্থিত হয়েছি সেটা সামনে গিয়ে মধুমতি নদীর সঙ্গে মিশেছে। যেহেতু আমাদের গন্তব্যস্থল বাঁশবাড়িয়া মধুমতি নদীর তীরেই সেহেতু যদি আমরা নৌকায় যাই তাহলে হয়তো দশ বারো ঘন্টার মধ্যে পৌঁছতে পারবো। এটা বুঝে আমরা একটা নৌকা ভাড়া করার চেষ্টা করলাম। একজন মাঝিকে পাওয়া গেল। বেশ জোয়ান বয়স। মজবুত, পেটানো স্বাস্থ্য। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব ঠিক করে নিলাম। উঠে পড়লাম চারজন। রওনা দিলাম। মাঝারি গতিতে এগিয়ে চললো নৌকা। সন্ধ্যার কিছু আগে মাঝি আরেকটা বন্দরে নৌকা ভিড়াতে চাইল। বলল, 'খাবার দাবার কিছু নেই। নৌকা ভিড়াতে হবে।'
আমরা বললাম, 'ঠিক আছে। নৌকা ভিড়াও।' আমরাও কিছু খাইনি সারাদিন।
ছোট্ট একটা গ্রামীণ বন্দর। বন্দরে নৌকা ভিড়িয়ে মাঝি খাবার কেনার জন্য উঠে গেল। আমরা তাকে খুব সম্ভব একশ টাকার মত দিলাম। চিড়া, গুড়, মুড়ি, ডাব বা এই জাতীয় খাবার দাবার যা পাওয়া যায় তা নিয়ে আসতে বললাম ওকে। মাঝি চলে গেল এবং ফিরল একেবারে সন্ধ্যা পার করে দিয়ে। এর মাঝখানে আমি ভাবলাম, আমরা সবাই প্রচন্ড ক্লান্ত। সবারই উচিত গোসল করে নেয়া। আমি ঐ নৌকার পাশেই নদীতে নেমে গোসল করছি এমন সময় বেশ দস্যু প্রকৃতির একটা লোক এসে খুব কড়াভাবে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। তোমরা কোত্থেকে এসেছ, যাচ্ছো কোথায়, নৌকায় কি আছে– এইসব প্রশ্ন। আমিও খুব কড়া কড়া উত্তর দিলাম। ত্যাড়া জবাব শুনে লোকটা আমাকে বলল যে, 'তোমার কথাবার্তা খুব খারাপ।' আমি বললাম, 'তোমার কথাবার্তাও খারাপ। আমরা এখানে কেন আছি, কোত্থেকে আসছি এসবে তোমার কি দরকার? তুমি কে?' লোকটা যখন দেখল যে আমার কথাবার্তা খুব গরম তখন কেটে পড়ল। এদিকে সন্ধ্যা গড়াচ্ছে। আমরা একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হলাম। মাঝি এতোটা সময় নিয়ে কি করছে? আমাদের সন্দেহ হলো। সন্ধ্যার পরে মাঝি এসে হাজির। চিড়া, গুড়, মুড়ি ইত্যাদি নিয়ে এসেছে ঠিকই। আমরা ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এতো দেরী করলে কেন?' মাঝি বলল, 'আমার বাড়ির জন্য কিছু খাবার কিনে দিলাম তো–একটু সময় লেগে গেছে–গ্রামের লোক খুঁজে পাচ্ছিলাম না। গ্রামের লোক খুঁজতে গিয়ে দেরী হয়ে গেছে।' মাঝির কৈফিয়তটা মেকি মনে হল। মন থেকে সন্দেহটা দূর হল না। আমি সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধাদের বললাম, 'এস চিড়া, মুড়ি, খেয়ে নেয়া যাক। সারাদিনতো পেটে কিছু পড়েনি। চিড়া, গুড় খেয়ে অন্তত সতেজতো থাকতে হবে। লড়াইতো আর এমনি এমনি করা যাবে না। মুড়ি, চিড়াগুলো আগে ভিজিয়ে ফেলো পানিতে। তারপর যার যার মত শুরু করো।' আমরা মাঝিকে বললাম, 'তোমার কাছে পানি নেই?' উত্তর দিল, 'নেই।' 'তোমার বাসন কোশন কিছু নেই?' মাঝি উত্তর দিল, 'নেই।' এর মধ্যে

একজন মুক্তিযোদ্ধা বলে উঠল, 'তুমি কেমন মাঝি যে তোমার বাসন নেই, পানি খাওয়ার কিছু নেই। এটা কোন নৌকা হল? এটা কোন কেরায়া নৌকা হল? যারা তোমার নৌকা ভাড়া করবে তাদের জন্য একটা ঘটি থাকবে না, একটা বাসন থাকবে না–এটা কেমন কথা?' এটা বলায় মাঝি উল্টো তিরস্কারের সুরে কি যেন জবাব দিল। মাঝির খুব গরম গরম একটা ভাব। আমি ওকে কিছু না বলে মুক্তিযোদ্ধা সঙ্গীকেই থামিয়ে দিলাম। বললাম, 'থাম, মাঝির সঙ্গে বিবাদে যাওয়ার কি দরকার?' কিন্তু মনের ভেতর সন্দেহ আমার আরো দানা বাধল। কারণ যাত্রী বহন করাই যে নৌকার মূল কাজ সেই কেরায়া নৌকায় বাসন কোশন বা নিদেনপক্ষে খাওয়ার পানি না থাকার কথাই ওঠে না। যাহোক, আমরা শেষ পর্যন্ত মুড়ি, চিড়া আনা হয়েছে যে পাত্রে সেই পাত্রেই মুড়ি-চিড়া ভিজিয়ে চার মুক্তিযোদ্ধা যাকে বলে ভুরিভোজ তাই করলাম। সারাদিন অভুক্ত থাকার পর চিড়া-মুড়ি আর গুড় অমৃতের মত লাগল। দশ পনের মিনিটের মধ্যে আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ। এমন সময় দেখলাম হঠাৎ করে একটা ছিপডিঙ্গি সা সা করে পিছন দিক থেকে আমাদের নৌকার দিকে এগিয়ে আসছে। মাঝিকে আমরা বললাম, 'তুমি পাল তুলে দাও।' প্রচন্ড দখিনা বাতাস। পূর্ণিমার মতো রাত। পূর্ণিমা না হলেও দু' একদিন আগে পিছে হবে। পাল তুললে সহজেই তাড়াতাড়ি আমরা চলে যেতে পারি। কিন্তু মাঝি ব্যাটা পাল তুলতে রাজী নয়। বলল, 'না, দরকার নেই। আমরা পৌঁছে যাব সময়মতো।' আমরা কিন্তু পেছনে ছিপডিঙ্গির আওয়াজ পাচ্ছি। খুব তাড়া করে আসছে যে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। ভাবলাম প্রস্তুতি নেয়া দরকার। আমার পিস্তল দুটো দুই মুক্তিযোদ্ধার কাছে রয়েছে। আমি যখন গোসল করতে নেমেছিলাম তখন দিয়েছিলাম ওদের কাছে। পরিস্থিতিটা কেমন জানি ভারি ভারি ঠেকল। আমাদের ওখানে একটা কথা আছে, মনে ডাক দেয়া। আমার মনেও ডাক দিল যে, আমরা বিপদের মধ্যে আছি। আমি বললাম 'আমার এক নাম্বারটা দাও।' এক নাম্বারটা হচ্ছে একটা চাইনিজ পিস্তল। আর দুই নাম্বারটা হচ্ছে একটা পাকিস্তানী রিভলবার। আমি এক নাম্বারটা চাওয়ার পর সেই মুক্তিযোদ্ধা আমার কাছে গোপনেই পিস্তলটা হাতবদল করল। পিস্তলটা হাতে নিয়ে আমি গলুইয়ের কাছে গেলাম। নদীর পানি খাওয়ার জন্য গলুইতে গিয়ে একটু নুয়ে হাত নামিয়েছি আজলা ভরে পানি তুলে খাব সেই উদ্দেশ্যে। এই অবস্থায় ছিপডিঙ্গিটা আমাদের কাছে চলে এলো। এসে আমাদের খুব কর্কশ ভাষায় প্রশ্ন করা শুরু করল 'তোমরা কারা?' বললাম 'আমরা মানুষ।'

'মানুষ বওয়ার নৌকায় আর কি হবে?' আমরা বললাম, 'তা সেটা যদি বোঝই তাহলে আর প্রশ্ন কর কেন?' আমি বুঝতে পারলাম এরা সাধারণ মানুষ নয়। লুটেরা, ডাকাত এমন একটা কিছু হবে। এরপর জানতে চাইল, 'তোমার নৌকায় কি মাল আছে'? আমি বললাম 'মানুষ।'

'মানুষ আবার মাল হয় নাকি? প্রথমেই তো বললে মানুষ আছে?'

আমি বললাম, 'ব্যস, যা আছে তা আমাদের আছে। তাতে তোমাদের কি?

ওদের মধ্য থেকে একজন বলল, 'শালার কথাতো বেশ গরম গরম মনে হচ্ছে। তেজী তেজী ভাব মনে হচ্ছে।' যাহোক, ছিপডিঙ্গিটা আমাদের সামনে এগিয়ে গেল। আমি আস্তে আস্তে আমাদের নৌকার ভেতর গলুইয়ের দিকে এগোচ্ছি। সামনে নদীর একটা বাঁক দেখলাম। ছিপডিঙ্গিটা আমাদের অতিক্রম করে ঐ বাঁকের ওখানে গিয়ে পজিশন নিয়ে নিল। পাশে চর। ওদের কাছে রামদা, চাইনিজ কুড়াল-টুরাল জাতীয় অস্ত্রপাতি রয়েছে। নৌকাটা চরের কাছাকাছি পৌঁছাল। আমি নীচু হয়ে একবার পানি উঠিয়ে খেয়েছি। দ্বিতীয়বার পানি উঠিয়ে খাবার জন্য নিচু হতে গিয়ে দেখি আমাদের মাঝি এই সময়টুকুর মধ্যে নৌকা ঘুরিয়ে গলুইটা চরে ঠেকিয়ে দিয়েছে। এত দ্রুত সে ঘুরিয়েছে যে দ্বিতীয়বার হাত নামিয়ে পানির বদলে বালুর স্পর্শ পেলাম। পাড়ে যে ভেড়ি সেই ভেড়ির ওপর থেকে রামদা নিয়ে তিনটা লোক আমার

ওপর লাফিয়ে পড়ল। একজন কোপ চালাল একেবারে আমরা ঘাড় লক্ষ্য করে। মুহূর্তের মধ্যে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হল যে আমাদের বাঁচতে হবে, আমরা মুক্তিযোদ্ধা এবং এদেরকে মারতে হবে। এছাড়া আমাদের বাঁচার কোন রাস্তা নেই। ওদেরকে লাফিয়ে পড়তে দেখে মুহূর্তের মধ্যে আমি শরীরটা বাঁকিয়ে ছইয়ের ভেতর নিয়ে গেলাম। নিয়েই আমার বাঁ হাতে ধরা পিস্তলটা হাত বদল করে আক্রমণকারী তিনজনকে তিনটা গুলী করে দিলাম। নৌকা ঘুরিয়ে চড়ায় ঠেকিয়ে দেয়া, নামানো, হাত উঠানো, রামদা নিয়ে তিন লোকের লাফিয়ে পড়া, আমার রিফ্লেক্স অ্যাকশন, গুলী করা–বর্ণনায় লম্বা হলেও ঘটনাগুলো ঘটতে সময় লাগল দুই সেকেন্ডেরও কম। দুজন সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল, একজন আহত। আহতের পেছনে আরো দু'জন। ওরা কোনরকমে আছড়ে পাছড়ে ভেড়িটার পেছনে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভয় পাওয়া পশুর মতো আর্তচিৎকারে কেঁপে উঠল চরের বাতাস। ওরা বুঝতে পারেনি যে এরকম ভয়াবহ একটা পাল্টা আক্রমণ হবে। এমন মারাত্মক একটা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হবে ওদের ওপর এটা আগে বুঝতে পারেনি। ওরা একেবারে হাউমাউ সুরে মেয়েলোকের মতো কান্নাকাটি শুরু করল। আমাদের মাঝি সাহেব এর মধ্যে আবার কৌশল করে একটানে নৌকাটা নদীর মধ্যে নিয়ে এসেছে যাতে আমরা ঐ আহত লোকটার কাছে জিজ্ঞাসা করে মাঝির পরিচয় জানতে না পারি। এই কারণেই সে নৌকাটাকে নিয়ে খেলাধুলা করেছে, নদীর মাঝখানে নিয়ে এসেছে। আমি চট করে নৌকার গলুইয়ে এসে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'মাঝি, তুমি যদি এখন লাফ দিয়ে সরে পড়তে চাও তাহলে আমি তোমাকে গুলী করে দেব।' মাঝি এ অবস্থা দেখে একেবারে হাউমাউ করে আমার পায়ে পড়তে চায়। এর মধ্যে ঐ গ্রাম থেকে অনেক লোক বেরিয়ে এল। হাতে লণ্ঠন, টর্চলাইট ইত্যাদি নিয়ে শত শত লোক এসে নদীর পাড়ে জমায়েত হল। তারা আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগল। কেউ কেউ বলল, 'তোমরা গুলী করলে, তোমাদের বন্দুক কি লাইসেন্স করা, পাশ করা বন্দুক।'

আমি বললাম, 'আমি মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার। আমার সব বন্দুকই পাশ করা। আমার নাম জিয়াউদ্দিন।

গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ একজন বলল, 'তোমার নাম আমরা শুনেছি। তোমাকে একটু দেখতে ইচ্ছা করে।' আমি কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে বললাম, 'যে নদী ক্রস করবে আমরা তাকে গুলী করে দেব। দেখতে ইচ্ছা করে একদিন দিনের বেলা সেটা করা যাবে। এখন আমাদের ওপর ডাকাতের হামলা হয়েছে, এখন নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। এখন এটা করা যাবে না।' এইটুকু বলে আমরা মাঝিকে বললাম, 'নৌকা অন্য পাড়ে নিয়ে যাও।' মাঝি নির্দেশমত কাজ করল। নিয়ে যাওয়ার পরে আমরা নৌকা থেকে নেমে পড়লাম। কারণ এখন আমি আর নদী পথে এগানোটা নিরাপদ মনে করলাম না। মাঝিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখান থেকে মোল্লারহাট কদ্দুর?' ও বলল, 'মাইল দুই–আড়াইয়েক।' জ্যোৎস্না রাত। অসুবিধা নেই। মাঝিকে মোটামুটি আমাদের সামনে হাঁটিতে দিলাম। 'তুমি পথ দেখাও। কিন্তু পালাতে গেলে গুলী খাবে। আর যদি তুমি আমাদের কথা শুনে চলো তাহলে মাফ করে দেব।' ও খুব মাফ চাইছে আমাদের কাছে। বার বার বলছে, 'আমারে মাফ করে দ্যান। আমি ভুল করছি।' যাই হোক ও আমাদের পথ দেখাল। আমরা আস্তে আস্তে মোল্লারহাটের কাছাকাছি চলে এলাম। এমন সময় হঠাৎ করে আমরা এক আকস্মিক আক্রমণের মুখে পড়ে গেলাম। কারা যেন আমাদের দিকে রাইফেল তুলে পজিশন নিল হন্ট হন্ট করে চিৎকার দিয়ে ওঠে। আমরাও পজিশনে চলে গেলাম। অবশ্য আমি একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি যে এরাও মুক্তিযোদ্ধা হবে। কারণ রাজাকার কিংবা ঐ জাতীয় লোকজন এখনো এই অঞ্চলে আসতে পারেনি।

স্থানীয়ভাবে গঠিত হলেও তাদের এখনো এরকমভাবে হন্ট হন্ট করে শত্রু থামানোর কায়দা রপ্ত করার কথা নয়। তখন, পরিস্থিতি বুঝে আমি আমার সঙ্গী একজন মুক্তিযোদ্ধাকে বললাম, 'প্রশ্ন করো, আপনারা কারা।' মুক্তিযোদ্ধা আমার পরামর্শমত জানতে চাইল, 'আপনারা কারা?' ওরা উল্টো জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কারা?' আমি দেখলাম যে যদি গোলাগুলী হয় রাজাকারদের সঙ্গে তাহলে আমাদের পরিচয় জানলেও হবে, না জানলেও হবে। এখান থেকে আমরা আর পালিয়ে যেতে পারছি না। আর পরিচয় দেয়ার পর যদি দেখা যায় আমরা উভয় গ্রুপই মুক্তিযোদ্ধা তাহলে উভয়েরই লাভ। তখন আমি বললাম সঙ্গীকে, 'ঠিক আছে পরিচয় দাও। বল।' ও তখন পরিচয় দিল। 'আমরা মুক্তিযোদ্ধা। আপনারা কারা?' তখন ওরা পরিচয় দিল, 'আমরাও মুক্তিযোদ্ধা।' তখন আমি আমার সঙ্গীদের বলতে বললাম যে আমি তাদের কমান্ডার এবং আমি তাদের সঙ্গে আছি। ওরা জানিয়ে দিল 'আমাদের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জিয়াউদ্দিন আমাদের সঙ্গে আছেন।' এইতো ব্যস, জয় বাংলা শ্লোগান শুরু হয়ে গেল চারদিক থেকে। জায়গাটা হচ্ছে মোল্লারহাট মূল বন্দর। এই বন্দরে তখনো দেড়শ পৌনে দুশ' মুক্তিযোদ্ধা পাহারারত রয়েছে। এরা আমাদেরকে পেয়েতো প্রচণ্ড খুশি। রান্নাবান্না করে খাওয়াল। এরপর আমাদের রেখে দিতে চাইল সেখানে আরো কিছুক্ষণ। আমরা থাকলাম না। প্রায় ঘন্টা তিনেক দেরী করে ওদের রান্না হওয়ার পর খেয়ে দেয়ে তারপর আসতে হলো। এর মধ্যে ঐ এলাকার আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, ভাসানী ন্যাপ, মোজাফফর ন্যাপ এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ অন্যান্য দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দও এলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। তারা জানতে চাইলেন যুদ্ধের অবস্থা কি। অথচ সেই মুহূর্তে যুদ্ধের সার্বিক খবরাখবর আমিও তেমন একটা জানি না। আমার মতো মুক্তিযুদ্ধের একজন কমান্ডারকে পেয়ে তারা ভাবছে আমি হয়তো খবরটা জানি। আমি বললাম, 'আমিও তেমন কিছু জানিনা। তবে যুদ্ধতো আমাদের করতে হবে। আমাদেরতো বিকল্প কোন রাস্তা নেই।' এরকম আলাপ আলোচনার পরে খেয়ে দেয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা আবার মাঝরাতের দিকে পায়ে হাঁটতে শুরু করলাম। হেঁটে হেঁটে আমরা পরদিন প্রায় দুপুরের দিকে বাঁশবাড়িয়ায় এসে হাজির হলাম। সেই নৌকার মাঝি সারাটা পথ সঙ্গেই আছে। বাঁশবাড়িয়া পৌঁছে কথামতো ওকে মাফ করে দিলাম। সে আমাদের সারাটা পথ দেখিয়ে এনেছে এবং আমাদের কিছু মালামালও টেনেছে। ওয়াদা করেছিলাম যে ওকে ছেড়ে দেব, তাই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সাবধান করে দিলাম যেন এরকম কাজ জীবনে আর না করে।

বাঁশবাড়িয়ায় বন্ধু মিন্টনের দুলাভাইয়ের বাড়িতে আবার গিয়ে উঠলাম। মিন্টনের ভগ্নিপতির নাম দুলাল। মিন্টনের ছোট বোন হামিদার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে দুলালের এবং এই পর্বে হামিদার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। একজন সাধারণ গৃহবধূ হয়ে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে বাড়িতে আশ্রয় দেয়া, তাদের রান্না–বান্না করা, এমনকি কাপড় চোপড় ধোওয়ার কাজ করে দেয়া–এসব ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই। আমরা ওদের বাড়িতে আবার এসে হাজির। ওরাও আমাদের পেয়ে খুশি। বড় একটা দুর্ঘটনার হাতে থেকে বেঁচে ফিরে এসেছি সেটাও আনন্দ সংবাদ।

যাহোক, পরবর্তী সিদ্ধান্ত হল, এখানে দু'একদিন বিশ্রাম নিয়ে আমরা নাজিরপুর–কচুয়া–মোরেলগঞ্জ হয়ে সুন্দরবন চলে যাব। দু'তিনদিন বিশ্রামে কাটল। মে মাসের মাঝামাঝি সময়কাল, আমরা যে ওখানে আছি সেটা খুব বেশি গোপন কিন্তু রাখা যাচ্ছে না।

কারণ সে সময় গ্রাম, বন্দর, শহরতো বটেই–সব জায়গাতেই একটা সন্ত্রস্ত অবস্থা। এর মধ্যে আমরা এক বাড়িতে পাঁচ–ছয়জন যুবক থাকছি–নিশ্চয়ই এরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক। এটাতো সহজ অংকের হিসাবে মেলানোর মতো ব্যাপার। এটা বুঝতে পেরে

নিরাপত্তার খাতিরে মাঝে মাঝে মিন্টন আর দুলাল আমাকে ওদের বাড়ি থেকে কয়েকশ গজ পেছনে এক গরীব কৃষকের বাড়িতে নিয়ে রেখে আসতো। সেই বাড়ির খোলা বারান্দায় আমি দুই তিনজন মুক্তিযোদ্ধাসহ ঘুমিয়ে থাকতাম।

এভাবে তিনদিন পার করার পর আমরা সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। মাঝপথে নদী। খেয়া অতিক্রম করে নাজিরপুরের পথে আমরা যাব। খুব সকালে আমরা রওনা দিলাম। দুপুর নাগাদ আমরা নাজিরপুরের কাছে এসে পৌঁছলাম। চারদিকে ব্যাপক হয়রানি এবং সন্ত্রাসের আলামত পাওয়া যাচ্ছে। পাঞ্জাবীরা গানবোট নিয়ে ঐ দিন নাজিরপুরে আক্রমণ চালিয়েছে এবং নাজিরপুর বাজার জ্বালিয়ে দিয়েছে। ঐ দিনেরই ঘটনা। আমরা সরাসরি নাজিরপুর বাজারে না গিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘুরে বন্দরটাকে বাঁয়ে রেখে, নদী অতিক্রম করে চলে যাব–এই হচ্ছে পরিকল্পনা। পরিকল্পনা মতো এগোচ্ছি। এদিকে পেটের ভেতর ক্ষুধার মোচড়। পানি পিপাসাও দারুণ। একটা বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হলো এই বাড়িটা থেকে অন্তত পানি খেয়ে যাই। বাড়িটার মধ্যে ঢুকতেই দেখি, আমার কলেজ জীবনের সহপাঠী এক হিন্দু ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ওর বোন আর ও–দুজনেই কলেজে আমার সঙ্গে পড়তো। আমাকে পেয়ে তারা প্রথমেতো কান্নাকাটি শুরু করে দিল। তাদের চেহারা আর বাড়িঘরের চালাটুকু শুধু আছে, আর সবকিছু লুণ্ঠিত হয়ে গেছে। ওরা জানাল, অনেক অনুরোধ করে, গ্রামের সবাইকে বলে কয়ে মাটির ওপর আশ্রয়টুকু রাখতে পেরেছে। বাকিটা সবাই নিয়ে গেছে। এই লুটপাটে নেতৃত্ব দিচ্ছে জামাত এবং মুসলিম লীগের লোকজন। আমাদের দেখে ওরা এতোকিছুর মধ্যে একটা আশ্বাস, একটা সান্ত্বনা পেল। ওরা খুব করে ধরল যে ওরা রান্নাবান্না করবে এবং আমাদের খেয়ে যেতে হবে দুপুরে। আমি প্রথমে খুব অনুরোধ জানালাম যাতে এটা ওরা না করে। কারণ পাঞ্জাবীদের অবস্থান খুব কাছে, মাত্র মাইল তিনেক দূরে। তারা জ্বালিয়ে দিচ্ছে বন্দর, এলাকার পর এলাকা। আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি বন্দরটা জ্বলছে। আর এখানে বসে আমাদের রান্না বান্না করে খাওয়ার আয়োজনটা ঠিক হচ্ছে না। তবুও ওদের অনুরোধ আর উপেক্ষা করা গেল না। শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হল, 'ঠিক আছে, তোমরা যখন খাওয়াবেই তাহলে কি আর করা। করো, রান্না করো। খেয়েই যাই।' বলে আমরা একটু শান্তিতে, স্বস্তিতে গা এলিয়ে বসলাম। আমার বন্ধু ওদের বাড়ির রাখাল ছেলেটাকে উঠিয়ে দিল নারকেল গাছে। ডাব পেড়ে খাওয়াবে। রাখাল ছেলেটা গাছে উঠছে, আমরা বাড়ির ছোট্ট বৈঠক ঘরটাতে বসে আছি, ডাব পাড়া হল, আমরা খাব এমন সময় হঠাৎ করে ঐ এলাকার চৌকিদার আর দফাদার এসে হাজির। হাতে পাচন লাঠি। এসেই আমাদেরকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কারা?' ওরা আসার পর থেকেই আমি পুরো অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছি। আমি উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিলাম, 'স্লামালেকুম।' দফাদার খুব নাটকীয়ভাবে, মীরজাফরের মতো অট্টহাসি হেসে বললো, 'ও সালাম দিতে শিখে ফেলছ?' আমি বললাম 'কেন?'

'তোমরাতো আসলে হিন্দু?'

আমি বললাম, 'না আসলে আমরা হিন্দু নই। আমরা মুসলমানের ছেলে, আমরা মুসলমান। আপনি যদি কোরআন বা সুরা আয়াতের কথা বলেন তাও আমরা আপনাদের শোনাতে পারি। স্লামেলিকুম শিখেছি মুসলমান পরিচয় দেয়ার জন্য তা নয়। আমরা আসলেও মুসলমান।' ওদের একজন বলল, 'এসব বইলনা, বইলনা। এসব শিখে টিখে নেওয়া যায়।' এ পর্যায়ে আমি একটু সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ এবং বাজে রসিকতার সুরে বললাম, 'আপনার সন্দেহ হলে আমাদের লুঙ্গি খুলেও দেখতে পারেন।' নম্র এবং বিনীতভাবেই ব্যঙ্গাত্মক কথাটা আমি বলে দিলাম।

চৌকিদার সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ অনেক কিছু শিখে ফেলেছ তোমরা। বসো, বসো। তোমাদের বাড়ি কোথায়?' আমি বললাম 'বাড়ি পিরোজপুর।'

'কোথায় গিয়েছিলে?'

আমি চিন্তা করে দেখলাম এখন আমার ভগ্নিপতির নামটা বলা খুব ভাল। কারণ স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি একে অপরকে খুব ভাল করেই চেনে। রাজাকার রাজাকারে মিল হলে খুব ভাল। আমি বললাম যে আমার ভগ্নিপতি অমুক। তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বাড়ি ফিরছি। এই রকম কিছু আলাপ হচ্ছে। এক পর্যায়ে আমি চাইলাম ওদেরকে একটু রিমোটিভেট করতে। দেখি চিন্তা–ভাবনার ধরনটা ঘুরিয়ে দেয়া যায় কিনা। আমি বললাম, 'দেখেন দফাদার সাহেব, আপনারা যা করেন তা তো জানি, বুঝি। আমরা তো ছাত্র মানুষ। তখন আমরা শ্লোগান টোগান দিছি আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পক্ষে। এটা আমাদের অপরাধ হয়েছে। কিন্তু আপনারাতো আমাদের বড় ভাই। আপনারাতো সেটা বুঝবেন যে আমরা অন্যায় কিছু চাই নাই।'

এই কথা শোনার পর আর যায় কোথায়। দফাদারতো একেবারে লাফিয়ে উঠল। মাটিতে লাঠি ঠুকে বলল, 'না, এইসব কথা বলবা না। মুজিবর, ভারতের দালাল। দেশটা ভারতের কাছে বিক্রি করে দেয়ার জন্য সে এইসব করেছে, জয়বাংলা বলেছে। এইগুলি সব ভাওতাবাজি। কিসের দেশ স্বাধীন, আমরা মুসলমান।'

আমি কোনরকমে বললাম, 'আমরাও মুসলমান। আপনি মুসলমান, আমরাও মুসলমান। আমরা ভুল করেছি হয়তো, জয়বাংলা বলেছি, দেশের স্বাধীনতা চাইছি। কিন্তু সেজন্য আপনি শুধু নিজেরে মুসলমান কইতে পারেন না। আমরাও মুসলমান।' আমার মনে মনে সাহস যে আমরা সশস্ত্র। ও বেশি কিছু বললে ওর লাঠি ফাঠি উড়ে যাবে। কথাবার্তার নরম সুর আর নেই আমার মধ্যে। বেশ দর কষাকষির মতো কথাবার্তা হচ্ছে। দফাদার হঠাৎ করে বলে উঠল, 'তোমরা ভারত থেকে এসেছ?'

'না, আমরা তো ভারত থেকে আসিনি।'

'তাহলে কোথেকে আসছ?'

'সেটাতো আগেই বললাম।'

দফাদার বিশ্বাস করে না। 'নাহ্, তোমরা ভারত থেকে আসতে পারো। ভারত থেকে অনেক গুপ্তচর আসতেছে। সেদিন আমি পাকিস্তানী মেজর সাহেবের কাছে একজনরে পিস্তলসহ ধরায়া দিছি। উনি আমারে পাঁচশ ট্যাহা পুরস্কার দিছেন।' ওর কথা শুনে ভেতরে ভেতরে কি যে হচ্ছে আমার! মনে হচ্ছে পিস্তল দিয়ে ওর মাথার খুলিটা উড়িয়ে দেই। কিন্তু যেহেতু একটা অসহায় পরিবারের মাঝখানে আমরা রয়েছি সেজন্য মনের ইচ্ছা মনে চেপে রাখতে হল। কারণ ওকে কিছু করলে পরবর্তীতে হয়তো এই পরিবারটির ওপরে আরো আঘাত নেমে আসবে। তাই, বরিশালের একটা কথা আছে না–দাঁত কামড়ে সহ্য করে নেয়া–তাই নিলাম। বললাম, 'দেখেন, তবু আপনাদেরকে অনুরোধ করবো আমাদের মতো ছাত্র যারা স্কুল কলেজে ভুল টুল করছি তাদেরকে ক্ষমা করে দ্যান।'

'না, না, এইসব বলবানা। এইসব বলবানা। তোমরা ভারতের গুপ্তচর। দালাল। তোমরা কেউ এদেশের ছেলে না।' এর মধ্যে আমাদের বন্ধুর বাড়ির রাখাল ছেলেটি ডাব কেটে আমাদের জন্য নিয়ে আসছে। তখন দফাদার বলল, 'ও, তোমরা হিন্দুদের বাড়ির ডাব খেতে আসছ। তাহলে তোমরা হিন্দু আসলে।' 'না, আমরা যে হিন্দু না তার সব রকম প্রমাণ দিতে আমরা রাজী আছি। হিন্দু আর বলবেন না আমাদের। হিন্দু না হলে হিন্দুদের বাড়ি ডাব খেতে অসুবিধা কি?' 'হিন্দু বাড়িতে কোন মুসলমানে খায়?'

আমি বললাম, 'ভাত–টাত না খেলেও পানিতো খাওয়া যায়, ডাবতো খাওয়া যায়। ডাবের মধ্যে হিন্দু আর মুসলমানের কি পার্থক্য আছে?'
দফাদার চূড়ান্ত রেগে উঠল। 'না, তোমাদের কথাবার্তা ভাল না। আমার সন্দেহ হয়।'
আমার সেই হিন্দু বন্ধু এবার একটু তৎপর হল। ও ভাবল যে আমি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলতে পারি, যেটা করা উচিত নয়। সে এসে দফাদার সাহেবকে চাচা–টাচা ডেকে আমরা যাতে ডাব খেতে পারি সে অনুমতিটুকু নিল। আমার বন্ধু আর বন্ধুর বোন তাকে অনুরোধ টনুরোধ করায় অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মতো দফাদার রাজী হল আর কি। বলল, 'ঠিক আছে, তোমার ডাব খেয়ে যাও।' তার গলার চরম কর্তৃত্বের সুর, 'তোমরা এইসব কোন খারাপ কাজ কইরো না।' আমরা আর কথা না বাড়িয়ে ডাব টাব খেয়ে জলদি করে উঠে পড়লাম। ঐ বাড়ি থেকে প্রায় এক দেড় মাইল দূরে খেয়াঘাট। আমরা একটু তাড়া করেই হাঁটছি। মনে ভাবনা, খেয়া পার হতে পারলে ফাড়াটা কাটে। আমরা খেয়াঘাটে এসে কলামুড়ি কিনে নিলাম। কলামুড়ি খেতে খেতেই খেয়া নৌকার সওয়ার হলাম। নৌকার মাঝি তরুণ। সে বুঝতে পারছে আমরা কারা। সন্দেহ করাতো সহজ ব্যাপার। প্রায় একই বয়সের চার/পাঁচজন যুবক কোথায় যাচ্ছে প্রশ্নটা জাগা স্বাভাবিক। যাহোক সে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল নৌকা, আমাদের খেয়াটা যখন নদীর অপর পাড়ে প্রায় পৌঁছে গেছে সে সময় ছেড়ে আসা পাড়ে সেই চৌকিদার দফাদার সাহেবকে দেখা গেল। সে হাঁক দিয়ে আমাদের খেয়াটাকে ফিরিয়ে নিতে বলল। এখন খেয়ার মাঝি বলছে, 'স্যার আপনাদেরকে এখানে নামিয়ে দেই। ওপারে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। এই দফাদার–চৌকিদার খুব খারাপ।'
আমি বললাম, 'না, তুমি খেয়া ফিরিয়ে নিয়ে চলো।' কারণ চৌকিদার আর দফাদার যদি ডাকাত ডাকাত করে চিৎকার করে তাহলে গ্রামের সমস্ত মানুষ নেমে এসে আমাদের ঘিরে ফেলবে। এইরকম একটি ঘটনা কিন্তু ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রাম অস্ত্র লুণ্ঠনের সময় ঘটেছিল। মাস্টারদা সূর্যসেনসহ সঙ্গী বিপ্লবীদের কিন্তু ডাকাত সন্দেহে গ্রামের লোকেরা আটকে ফেলেছিল। কাজেই দফাদার চৌকিদার যদি চিৎকার করে উঠে ডাকাত ডাকাত বলে তাহলে আমরা যে মুক্তিযোদ্ধা এটা বোঝানোর আগেই জীবন চলে যাবে। আমি ভাবলাম এই সুযোগটা এদেরকে দেয়া ঠিক হবে না। যদিও খেয়া মাঝি বার বার আমাদের বোঝাচ্ছে যে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না; কিন্তু আমি ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে অনড়। দফাদার চৌকিদারকে চিৎকার করার সুযোগ দিতে আমি রাজী নই। নৌকা আবার ফিরিয়ে আনা হল। দফাদার সাহেবকে আমি বললাম, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে। আপনিও কথা বলার জন্য আমাদের ডাকছেন। চলেন পাশে যাই,' বলে আমরা এক দেড়শ গজ এগিয়ে দোকানপাটের পেছনে রাস্তার বাঁক ঘুরে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে আমি বললাম, 'দফাদার সাহেব, আমাদের ডাকছেন কেন?'
'তোমরা তোমাদের পরিচয়তো সেখানে দিলা না।'
'আমরা পরিচয় দিলাম। আপনি আমাদের ডাব খাওয়ার অনুমতি দিলেন। আমাদেরকে ছেড়ে দিলেন। এখন এই দেড় মাইল দূরে এসে বলতেছেন নানান কথা। আমরাতো কিছু বুঝি না। আপনেরে বললাম আমরা মুসলমান, সবইতো আমরা বললাম।'
বলে, 'না এসব কথায় হবে না। আর কিছু থাকলে বল।' অর্থাৎ কিছু টাকা পয়সা দাও। এটা বলছে আর হাতের লাঠি ঠুকে রাস্তার পাশের মাটি আলগা করছে। মাথা নীচু। খুব মুডে, খুব শরীফ মেজাজে উনি আছেন বোঝা যাচ্ছে। মাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছেন এই সুযোগে আমি আমার পিস্তল বের করে ফেলেছি। পিস্তল বের করে ওর বুকে ঠেকিয়ে দিয়েছি। ও যখন দেখল কথা নেই, বার্তা নেই হঠাৎ করে বুকে পিস্তল ঠেকেছে

তখন যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। হতভম্ব অবস্থা। ভয়ে, আকস্মিকতায় একবারে কাঁপতে শুরু করছে। আমি খুব কড়া করে ধমকের সুরে বললাম, 'হারামজাদা, আমি মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার জিয়া। তোর বুকে গুলী করে একেবারে জান খতম করে দেব।' ও তখন কাঁপতে কাঁপতে আমার পা জড়িয়ে ধরার জন্য নীচু হয়ে এগিয়ে আসতে চাইল। আমি হাত তুলে ওকে নিরস্ত করলাম, 'খবরদার, তোর মতো মীরজাফর আমার গা স্পর্শ করবে না। তুমি জানো সমস্ত গ্রামগুলি আমার হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ঘিরে রেখেছে।' কথাটা আসলে একটা ধমক, আসলে সত্য হলো হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ঐ গ্রামে আমি কোথায় পাব? দফাদারতো এক নিঃশ্বাসে বলা শুরু করল, 'জানি স্যার, আপনার কথা কত শুনছি স্যার। আপনারে মনে মনে কত খুঁজছি স্যার, আপনি কয়দিন খান না স্যার। আপনি আমার বাড়ি চলেন, স্যার। আমার বউ আপনারে রান্না কইরা খাওয়াইবো স্যার।'

আমি বললাম, 'শালা মীরজাফরের বাচ্চা, আমি তোমার বাড়িতে দাওয়াত খাইতে যাব। উঠে দাঁড়া।' ওতো আমার পা জড়িয়ে ধরার ভঙ্গি করে সামনে বসে আছে। কথা শুনে উঠে দাঁড়াল। তখনও থরথর করে কাঁপছে। বললাম, 'ঠিক আছে তোমারে আমি মাফ করতে পারি একটা শর্তে। ঐ যে হিন্দু পরিবারটা ওরা আমার সহপাঠী–ওদেরতো সব তোমরা লুট করে নিয়ে গেছো। এরমধ্যে তুমিও ছিলা।'

'না স্যার, না স্যার, আমি তহন বাধা দিয়ে ওদের ঘরের চাল রাইখা দিছি।'

আমি বললাম 'তা জানিনা। কিন্তু ওরা যেন এখন থেকে খাবারের অভাবে কষ্ট না পায় এবং ওরা যেন বাধ্য হয়ে ভারতে না যায়। এইটা আমি তোমার কাছ থেকে গ্যারান্টি চাই। তুমি প্রত্যেক হাটবারে ওদের বাড়িতে গিয়ে হাট করে দিয়া আসবা। এটা যদি তুমি করো তাহলে তোমাকে কিছু বলা হবে না। এর মধ্যে কিন্তু সমস্ত গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা তৈরী হয়ে গেছে। তোমার কিন্তু নিস্তার নেই।'

দফাদার বলল, 'স্যার, এটা আমি করব।'

দফাদারের প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করতে চাই। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্বে, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমি যখন পিরোজপুরে তখন আমার ঐ দুই সহপাঠীর সঙ্গে ঐ দফাদার এসে আমার সামনে হাজির হয়ে গেল। দফাদার বলল, 'আমি এরপর কোন খারাপ কাজ করি নাই। ওদের বাজারটাজার আমি করে দিয়েছি। কাজকর্ম দেখাশুনা করেছি।' আমার বন্ধুও সাক্ষ্য দিল, 'হ্যাঁ, তারপর থেকে সে আমাদের খুব সাহায্য করেছে। লুটপাটেও অংশ নেয় নাই।' দফাদারতো মনে করেছিল সাক্ষাৎ যমের হাত থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। আমার কথাগুলো সে পুরোপুরিই বিশ্বাস করেছিল।

আমরা নদী অতিক্রম করে অপর পাড়ে চলে এলাম। আবারো শুরু হল হাঁটা। হেঁটে হেঁটে এক সময় কচুয়ায় হাজির হলাম। বলেশ্বর নদীর অপর পাড়েই কচুয়া। আমরা নদী পেরিয়ে যেখানে পাড়ে উঠলাম সেখান থেকে মাত্র একশ গজ দূরেই রাজাকারদের মিটিং হচ্ছে। আমরা অবশ্য সেটা জানতাম না। রাজাকারদের বলা যাবে না ঠিক, রাজাকার বাহিনী গঠন করার জন্য মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীর মিটিং হচ্ছে। এই অবস্থায় আমরা বলেশ্বর নদীর সেই খেয়াঘাটে গিয়ে হাজির। পাড় থেকে উঠতে গিয়ে দেখলাম বেশ কিছু লোকের জটলা এবং সেখানে পাকিস্তানের পক্ষে বক্তৃতা হচ্ছে। আমি একটু আতংকিতও হলাম, শংকিত হলাম, সতর্ক হওয়ার চেষ্টা করলাম। অবশ্য তখন আর করার কিছু নেই, নেমেই পড়েছি।

আমরা ধীর ধীরে ঘাট থেকে ওঠে হাঁটতে শুরু করেছি এমন সময় একজন তরুণ (সম্ভবত ওর ডাকনাম মিজান, পরবর্তীতে শহীদ হয়ে গেছে) আমার দিকে এগিয়ে এসে একটু ঝুঁকে চাপা গলায় জানতে চাইল, 'আপনি জিয়া ভাই না?' আমি দেখলাম গোপন করলেও গোপন আর থাকছে না, না করলেতো থাকছেই না। আমি স্বীকার করে নিলাম, 'হ্যাঁ।' তরুণটি বলল, 'আপনি দেখতে পাচ্ছেন রাজাকারদের মিটিং হচ্ছে, রাজাকারবাহিনী গঠন করা হচ্ছে আজকে। আপনি অন্য কোনদিকে না তাকিয়ে, কাউকে কিছু না বলে আমার পেছন পেছন আসুন।' এখন তার এই কথা বা যদি বলি নির্দেশ–সেটা শোনা ছাড়া আমাদের সামনে কোন বিকল্প নেই। এই রকম একটি ঘটনাই প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে, হাটে–মাঠে–ঘাটে কোটি কোটি মানুষ মুক্তির জন্য কিরকম পাগল ছিল এবং তারা কিভাবে মুক্তিবাহিনীকে লালন পালন করে পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সহায়তা করেছিল। এই তরুণ নিজের উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল আমাদের দিকে। আমরাও কোন দিকে না তাকিয়ে, কিছুই না বলে সেই তরুণের পিছু নিলাম। প্রায় এক মাইল দূরে ওর বাড়ী। একদল মুক্তিযোদ্ধাকে সে সময় বাড়ীতে আশ্রয় দেয়া মানে নিজের সমূহ বিপদের ঝুঁকি নেয়া। তরুণটি যেন এই সব বিপদের তোয়াক্কাই করলনা। সরাসরি ওদের বাড়ীতে আমাদের নিয়ে গিয়ে হাজির হল। বাবা–মার কাছে আমাদের পরিচয় দিল। কচুয়া থানা বন্দর পিরোজপুরের খুব কাছে। এই এলাকার বহু লোক আমার বাবাকে খুব ভাল করে চেনে। মুক্তিযুদ্ধে একটা বিশেষ পদে অবস্থানের কারণে আমিও মোটামুটি বিখ্যাত হয়ে গেছি ততদিনে। তরুণ যখন আমার পরিচয় দিল তার বাবা–মাকে তখন তারা আমাদের সাদরেই গ্রহণ করলেন। সন্ধ্যাবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা হল, থাকার ব্যবস্থাও হল।

পরদিন খুব ভোরে আমরা রওয়ানা দিলাম মোরেলগঞ্জের দিকে। মিজান আমাদের এগিয়ে দিল অনেকটা পথ। তারপর ফিরে গেল। মোরেলগঞ্জ যাওয়ার পথে বাধাল নামে একটা জায়গা আছে। এই বাধাল একটা ছোট বন্দর, হাট। বাধাল অতিক্রম করে পশ্চিম দিকে একটা সড়ক আছে, কাঁচা রাস্তা। ঐ রাস্তা ধরে আমরা প্রথমে মোরেলগঞ্জ পৌঁছাবো। তারপর মোরেলগঞ্জ পেরিয়ে সুন্দরবনে যাব–এই হচ্ছে আমাদের পরিকল্পনা। আমারা বাধাল বন্দরটা অতিক্রম করে ঐ কাঁচা রাস্তাটা ধরে একশ–দেড়শ গজ এগিয়েছি এমন সময় পেছনে শব্দ পেলাম। একটা গাড়ী এসে থামল। জীপ কিম্বা মিনিবাস জাতীয় কোন যানবাহন হবে, ট্রাকও হতে পারে। আমরা ঠিক বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা কি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম হঠাৎ করে সমস্ত বাধাল বন্দরটা জ্বলছে। মানুষের চিৎকার–আহাজারী, নারীকন্ঠের কান্নার রোল সব মিলিয়ে হুলস্থুল একটা ব্যাপার। ততক্ষণে আমরা বুঝতে পেরেছি পাকিস্তানীরা বন্দরে আক্রমণ চালিয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি ঐ এলাকা পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালালাম সতর্কতার সঙ্গে। কখনো দ্রুত হেঁটে, কখনো বা দৌড়ে মাইল দুয়েক পথ পেরিয়ে এলাম আমরা। এরই মধ্যে পাঞ্জাবীরা আমাদের পিছু নিয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য মাঝে মাঝে

মাঝে পিছন ফিরে তাকাচ্ছি। দেখলাম যে, না, ওরা আমাদের পিছু নেয়নি। ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অঞ্চলটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া। আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে তারা কিছু জানতো না। যাহোক, আমরা হেঁটে হেঁটে দুপুরের আগে মোরেলগঞ্জ নদীর পাড়ে এসে পৌঁছলাম। নদীর ওপারে মোরেলগঞ্জ, এপারে আমরা একটা রাইস মিলের পাশে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি। এলাকার লোকজন আমাদের জানাল যে ওপারে মুসলিম লীগ ও জামাতের লোকজন মিটিং করছে। রাজাকার বাহিনী গঠিত হচ্ছে। আমরা দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানেই বসে থাকলাম। এর মধ্যে চিড়া মুড়ি খাওয়া হলো। সন্ধ্যার পরে আমরা নদী অতিক্রম করে মোরেলগঞ্জ বন্দরে গিয়ে হাজির হলাম। মোরেলগঞ্জে আব্দুস সাত্তার নামে আমার এক কলেজ জীবনের বন্ধু থাকতো। সে আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী এবং মোটামুটি ধনী পরিবারের সন্তান। ওদের একটা দোকান আছে মোরেলগঞ্জ বন্দরে। সেই দোকানে গিয়ে আব্দুস সাত্তারের সঙ্গে দেখা হল। সেই সময় মুক্তিযোদ্ধাদের কোনরকম সহযোগিতা করা যে কোন অর্থেই ছিল খুব বেশি বিপদজনক। আব্দুস সাত্তার এসব বিপদের তোয়াক্কা না করে আমাদের খাওয়া–দাওয়া এবং ক্ষণিক বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিল। তারপর একটা নৌকা ভাড়া করল যেটাতে চড়ে আমরা সুন্দরবনে যাব। খাওয়া দাওয়া করে সাত্তারকে ধন্যবাদ দিয়ে নৌকায় উঠে বসলাম। সারারাত নৌকা চলল। ভোরের দিকে আমরা এসে পৌঁছলাম সুন্দরবনের কাছাকাছি। সুন্দরবনে পৌঁছে চিন্তা হল, এখন কোথায় যাব। আমার মনেতো মাও সেতুংয়ের পাহাড়ে জংগলে সেই লংমার্চ বাসা বেধে আছে, কিন্তু কিভাবে কি করবো সে সম্পর্কেতো কোন ধারণা নেই। সুন্দরবনে আবার নানা ধরনের বিপদ সারাক্ষণ ওঁৎপেতে আছে। ভাবছি, এখন কি করা যায়?

সুন্দরবনের কাছে গৌপখালি নামে একটা জায়গা আছে এবং এখানে তালুকদার বাড়ি নামে একটা সভ্রান্ত বাড়ি আছে। এরা আবার আমাদের খুব পরিচিত। আমার বাবা–মা, অন্য আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে ভালই পরিচয় আছে, তবে আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় নেই। আমি ভাবলাম ওদের ওখানে গিয়ে আমরা হয়তো দু'একদিন থাকতে পারি। এই চিন্তা করে ওদের বাড়িতে গেলাম। বাড়ির কর্তা তালুকদার সাহেবের সঙ্গে আলাপ হল। বাবা–মার পরিচয় দিলাম। বললাম, 'আমরাতো এসেছি। দু' একদিন থাকা দরকার'–এইসব। তালুকদার সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে।' দুপুরে তারা বেশ আদর আপ্যায়ন সহকারেই আমাদের নিয়ে খেলেন দেলেন। খাওয়া দাওয়ার পরে বিশ্রাম নিয়ে–বিকেলে আমরা একটু সুন্দরবনের পাড়ে হেঁটে বেড়ালাম। অনেকদিন পর মুক্ত পরিবেশে নিশংকচিত্তে হেঁটে বেড়ানোর সুযোগ পাওয়া গেছে–এটা কি ছাড়া যায়? এই বেড়ানোর সময় পরিচয় হলো তালুকদার সাহেবের তৃতীয় সন্তান নজরুল মাষ্টারের সঙ্গে। তিনি একজন স্কুল শিক্ষক। আলাদা বাড়িতে থাকেন। যাহোক তার সঙ্গে আলাপ টালাপ হচ্ছে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তারপর কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ শুরু হয়ে গেল ঝম ঝম বৃষ্টি। নজরুল মাষ্টার আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন নিজের বাড়িতে। আমরা তাড়াতাড়ি তালুকদার সাহেবের বাড়িতে ফিরে এলাম। তালুকদার সাহেব থাকতেন দোতলা দালানে আর নজরুল মাষ্টার থাকেন একটু দূরে, ছোট্ট ঘরে। ছেলে বিয়ে করেছে, সংসার করেছে, কাজেই আলাদা থাকছে। আমরা গিয়ে দেখি তালুকদার সাহেবের বাড়ির দরজা টরজা সব এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা একটু দরজা ধাক্কালাম ফিরে যে এসেছি সেটা জানান দেয়ার জন্য। দরজা কিন্তু খোলে না। দোতলা থেকে আমাদের জানানো হল, 'রাত্রে আমরা কাউকে থাকতে দেই না। আপনারা অন্য কিছু ব্যবস্থা করে নেন।' আমরা পড়লাম মহাবিপাকে। দুশ্চিন্তার ব্যাপার। নৌকা ছেড়ে দিয়েছি। এখানে এসে বললাম থাকব। দুপুরে খাওয়াল দাওয়াল। এখন শুরু হয়েছে বৃষ্টি। এই এলাকায় অন্য কাউকে

চিনিও না। আমি ব্যাপারটা বাড়ির লোকজনকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সবই অরণ্যে রোদন। ওরা কিছুতেই রাজী হল না। অগত্যা নিরুপায় হয়ে ভাবলাম নজরুল মাষ্টারকে গিয়ে বুঝিয়ে বলি। তিনিতো শিক্ষিত মানুষ, অসুবিধাটা বুঝতে পারবেন। দু'তিনশ গজ দূরে নজরুল মাষ্টারের বাড়ী। সেই বৃষ্টির মধ্যে কাদাপানি পেরিয়ে মাষ্টারের বাড়ীতে গেলাম। গিয়ে তাকে ডাকলাম। প্রথমেতো খুব শংকিত হয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। কিছুতেই সামনে আসবেন না। তারপর একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে এলেন তিনি আমাদের সামনে। আমি তাকে খুব অনুরোধের সুরে জানালাম, 'ভাই আমরাতো বিপদে পড়ে গেছি। আপনার বাবাতো আমাদের রাত্রে থাকতে দিতে চাচ্ছেন না। এখন এই বৃষ্টির মধ্যে আমরা যাব কোথায়? আপনি আমাদের রাত্রে একটু থাকতে দেন।' এইরকম অনুরোধ টনুরোধ করছি, নজরুল মাষ্টার দ্বিধাগ্রস্ত ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে তার স্ত্রী তাকে ভেতরে ডাকলেন একটা কথা শুনে আসার জন্যে। নজরুল মাষ্টার ঘরের ভেতর চলে গেলেন। তার স্ত্রী বললেন (আমরা পরে জেনেছি), 'আপনি ওদেরকে রাত্রে থাকতে দেন। বিপদে পড়ছে আর চেহারা দেখলেইতো বোঝা যায় এরা ভদ্রলোকের ছেলে। খারাপ কিছু না।' রাজারে শাসিছে রাণী–রাণীর অনুমতি যখন পাওয়া গেল তখন আর অসুবিধা কোথায়? নজরুল মাষ্টার রাজী হয়ে গেলেন। আমরা উঠে বসলাম তার বারান্দায়। নজরুল সাহেবের আচারে ব্যবহারে আমাদের প্রতি যত্নআত্তির পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়ছে। রাতের বেলা বেশ ভাল খাবার দাবারের আয়োজন হল। ভাল বিছানা পত্র এল। বিছানা করে দেয়া হল। বেশ ভালই ব্যবস্থা। সন্ধ্যায় বৃষ্টিতে ভেজার ফল পেলাম রাত্রে। আমার জ্বর এল গা কাঁপিয়ে। যাহোক ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ঐ জ্বর নিয়েই প্রস্তুত হলাম যাতে আমরা রওনা দিতে পারি। আমাদের উদ্দেশ্য শরণখোলার বগী ফরেস্ট যেখানে সুবেদার ফুলুর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ক্যাম্প গঠন করে দিয়ে এসেছিলাম বেশ আগে। আমাদের নাস্তাটাস্তা দেয়া হল। তখন আমরা নজরুল মাষ্টারকে জানালাম–ভাই আমরা চলে যাচ্ছি। আপনি আমাদের বিপদে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আমরা কৃতজ্ঞ। আপনাকে ধন্যবাদ–এসব নিয়মমাফিক কথাবার্তা চলছে, এরই মধ্যে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, 'হাফিজ ভাই (আমার সেই সময়কার ছদ্মনাম), আপনি জানেন না, নূপুরের মা আপনেরে ভাই ডাকছে।' নূপুর হচ্ছে নজরুল মাষ্টারের বড় মেয়ে। প্রাইমারীর ছাত্রী। নজরুল মাষ্টার এরপর বললেন, 'এখন আপনি যাবেন না। আপনার জ্বর ভাল হলে যাবেন।' নূপুরের মা আমাকে ভাই ডাকার মানে হচ্ছে আমি তার সম্বন্ধী হয়ে গেলাম। আর জ্বরসহ ভাই কিভাবে বাড়ী যাবে? নজরুল মাষ্টারের কথা শুনে আমার চোখে পানি চলে আসছে। নিজের বোনের বাড়িতে গিয়ে আমি আশ্রয় পাচ্ছি না আর কোন অনাত্মীয়া এক মহিলা ভাই ডেকে আশ্রয় দিতে চাচেছ পরম আদরে, জ্বরের মধ্যে যেতে দিতে চাচ্ছে না বাইরে। চোখের পানি পড়তে না দেয়াটা খুবই দুরূহ এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠল আমার জন্য। যাহোক এরপর দশদিনের মতো সেই বাড়িতে থাকলাম। কিন্তু দিনের পর দিন ঐ বাড়িতে থাকাটা আমার জন্য একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কারণ গ্রামের সবাই এমনিতেই সব ঘরবাড়ির সমস্ত খবরই রাখে। কারা কোন বাড়িতে থাকছে, তারা কারা, কি ব্যাপার এসবে গ্রামের মানুষের খুব ঔৎসুক্য। সারাদেশের ওপর একটা বিশেষ অবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে পাঞ্জাবীরা। লুটপাট, আক্রমণ, গণহত্যা সবকিছু মিলিয়ে একটা আতংকিত অবস্থা বিরাজ করছে সারা দেশে। স্বাভাবিকভাবেই অপরিচিত লোকজন সম্পর্কে ঔৎসুক্যের পরিমাণ বেড়ে গেছে আগের চেয়ে। নজরুল সাহেব দেখলেন আমাকে আর বেশীদিন এই ভাবে রাখা যাবে না। তিনি আমাকে বললেন, 'হাফিজ ভাই আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ি আছে। চলেন আপনাকে সেখানে রেখে আসি।' আমি রাজী।

তখন নজরুলের স্ত্রীর ভগ্নিপতির বাড়িতে নিয়ে আমাকে রাখা হলো। আমার দায়িত্ব হচ্ছে সে বাড়িতে রাখাল হিসেবে কাজ করা। এবং যেহেতু আমি শিক্ষিত রাখাল সেহেতু আমাকে বাড়তি আরো একটা দায়িত্ব পালন করতে হবে। সেটা হলো নজরুলের স্ত্রীর দুজন ছোট ভাগ্নে–ভাগ্নী আছে, তাদের আদর্শলিপি জাতীয় বইটই পড়ানো। আমি খুব আনন্দিত চিত্তেই রাজী হয়ে গেলাম। গরু চড়াতে যেহেতু জানি না সেহেতু ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও কম, ভয় নেই। আর যেহেতু কিছু লেখাপড়া জানি, সুতরাং কিছু লেখাপড়া করাতে পারব। যাহোক, দিন কেটেই যাবে।

এর মধ্যে আমরা আমাদের সাথের দু'জন মুক্তিযোদ্ধাকে পাঠিয়ে দিয়েছি পিরোজপুরে যাতে বিচ্ছিন্ন অবস্থানের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অস্ত্র নিয়ে চলে আসে এখানে। কিছু কিছু অবস্থানের খবরও আমরা পেয়েছি–দশজন কি পনেরোজনের এককেটা গ্রুপ এককে জায়গায় সশস্ত্র অবস্থান নিয়ে আছে। বিশেষ করে রায়েরকাঠি ও কালিকাঠির মুক্তিযোদ্ধারা মোটামুটি সংহত অবস্থান বজায় রাখতে পেরেছে তখনও। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগটা তখনও আছে। এবং বেশ কিছু অস্ত্র তারা সংরক্ষণ করতে পেরেছে। এ খবরটা আমার কাছে আছে। এদের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে আমারও এখানে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আর নজরুল পারছেন না আমাকে তার বাড়িতে রাখতে। কাজেই রাখাল হয়ে থাকতেও আমার আপত্তি নেই। রাখাল হয়ে নজরুলের স্ত্রীর বোনের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। নজরুলের স্ত্রীর ভগ্নিপতি গরীব কৃষক। বারান্দায় একটি চৌকি পাতা। সেই চৌকিতে আমি আছি। নজরুলের স্ত্রীর ভাগ্নেভাগ্নী আমার কাছে আদর্শলিপি জাতীয় বই নিয়ে পড়তে আসে। কোলে বসে। প্রথমদিন আর গরুটরু রাখার কথা কিছু বলল না। আমি কিন্তু মানসিকভাবে খুব স্বচ্ছন্দেই প্রস্তুত। আমার কোন আপত্তি নেই। আমি আরো আগ বাড়িয়ে বললাম, 'গরু টরু কিছু বাঁধতে হবেনা?' বলে 'না, নতুন আসছেন। কয়েকদিন থাকেন। তারপর দেখা যাবে'–এইভাবে কথা টথা হলো। আমাকে রাখতে আসা নজরুলকে বললাম, 'আপনি কাল সকালে একটু আসবেন। আমি একটু বেড়াতে যাবে।' ওই জায়গা থেকে খানিকটা দূরে মোরেলগঞ্জ ও পিরোজপুরের মাঝামাঝি একটা হাট আছে। ঐ অঞ্চলটাতে আমি যেতে চাচ্ছি, কারণ আমার ধারণা মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের খবর পেয়ে এই এলাকায় চলে এসেছে এবং আমাদের খুঁজে পাচ্ছে না। আসলে কিন্তু ঘটেছেও তাই। আমার মনের ভেতরে যে ধারণাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল, ঘটনাও ঘটেছে সেরকমই।

কিছু মুক্তিযোদ্ধা সশস্ত্রভাবে সেই এলাকায় আছে এবং আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, পাচ্ছে না। শরণখোলার রায়েন্দার মুক্তিযোদ্ধারা ছিল এই খুঁজে বেড়ানোর দলে। ঐ এলাকার সামসুল আলম তালুকদারের নেতৃত্বে প্রায় শদেড়েক মুক্তিযোদ্ধা সশস্ত্র অবস্থায় খুঁজছে আমাকে। পাচ্ছে না। যাহোক পরদিন সকালে নজরুল মাষ্টারের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় দশ–বারোমাইল হাঁটা। এর মধ্যে বৃষ্টি শুরু হল। আমরা একটা গাছতলায় দাঁড়ালাম। নজরুল মাষ্টার হঠাৎই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা হাফিজ ভাই, আপনারেতো আমাদের ভাল লাগে। তারপর সম্পর্ক হইছে সেটা সারা জীবনই থাকবে। আপনার কথাবার্তাও আমাদের ভাল লাগে। কিন্তু আপনার আসল পরিচয়টাতো আমাদের দিলেন না।'

আমি রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। সর্বনাশ বলে কি? বললাম, 'না, আসল পরিচয় দেব না কেনো। আমি তো বলছি আমি ছাত্র। দোকান আছে। ছোটখাট ব্যবসা করি।'

'সেটা বলেছেন, কিন্তু আপনেরেতো সেই রকম মনে হয়না। আপনেরে বড় মিলিটারী মিলিটারী লাগে।'

সর্বনাশ। এই অজপাড়াগায়ের একজন মাস্টারের চোখে ধরা পড়ে গেছি। ব্যর্থ হয়েছি নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখতে? আমি তাড়াহুড়া করে বললাম, 'না, না, কিযে বলেন, আপনার কাছে কি মিথ্যা পরিচয় দেবো?' অবশ্য মিথ্যা বলা ছাড়া উপায়ও ছিলনা তখন আমার। কারণ পরিচয় ফাঁস করা শুধু আমার জন্যই নয়, তার জন্যেও বিপদজনক হতে পারতো। যাহোক বৃষ্টি কমে আসার পরে আমরা ফিরে এলাম সেই কৃষকের বাড়িতে, নজরুল মাস্টারের স্ত্রীর যিনি ভগ্নিপতি।

সেই বাসায় যদিও আমার নিয়োগ হয়েছে রাখাল এবং কিঞ্চিৎ মাস্টার হিসেবে কিন্তু তাদের তরফ থেকে আমার প্রতি আদর-আপ্যায়নের বহরটা ছিল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো। মেহমানদারী মেহমানদারী ভাব। কারণ তারা জানে আমি নজরুল মাস্টারের ধর্ম-আত্মীয়, নজরুল মাস্টারের স্ত্রী আমাকে ধর্ম ভাই ডেকেছেন। কাজেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বেশ ভালরকম অতিথেয়তার ছোঁয়াই আছে। আমি আর নজরুল মাস্টার ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে (আসল কারণ সহযোদ্ধাদের সাক্ষাৎ পাওয়া, আগেই বলেছি) দুপুরের পর ফিরে এলাম। খাওয়া-দাওয়া করে নজরুল মাস্টার চলে গেল তার বাড়িতে। মাইল খানেক রাস্তা। তাকে একটু এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলাম আমি। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। তারও কিছুক্ষণ পর ঐ গ্রামের চারটি ছেলে এলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। তারা শুনেছে এই বাড়িতে একজন নতুন মাস্টার রাখা হয়েছে। শিক্ষক এবং একইসঙ্গে রাখালও বটে। তাহলে নিশ্চয়ই সে একজন শিক্ষিত ছেলে। গ্রামের একধরনের লোকের বিশেষ কৌতূহল থাকে না, সেরকমই তারাও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে আমার ব্যাপারে। ওরা এসে আমাকে নানা প্রশ্নবাণে একেবারে জর্জরিত করে তুললো। আমার সঙ্গে একজন মুক্তিযোদ্ধা আছে। যাহোক গ্রামীণ যুবকদের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে আমি খুব সাধারণভাবে, গ্রামীণ ঢঙেই উত্তর দিতে লাগলাম যাতে তারা আমার শিক্ষার অবস্থান, সামরিক বাহিনীর অবস্থান বা শহরে অবস্থান কিছুই বুঝতে না পারে। কিঞ্চিৎ শিক্ষিত হয়েও আমি যেন মোটামুটি গ্রামেরই ছেলে এমনভাবে কথাবার্তা বলছি। কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে তারা মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গে চলে এলো। তারা বলছে, 'দেশ স্বাধীন করবে মুক্তিবাহিনী? অসম্ভব। পাকিস্তানের কত বড় সেনাবাহিনী। ওদেরকে কিসের মুক্তিবাহিনী কি করবে?' আমিও তাদের সঙ্গে খুব একাত্ম হয়ে তাল মিলিয়ে যাচ্ছি- পাকিস্তানের মতো বাহিনীকে পৃথিবীর কোন শক্তি নেই পরাজিত করতে পারে। আলোচনা হচেছ, এরই মধ্যে হঠাৎ করে একজন বলে বসল, 'সেদিন আমি খুলনা থেকে আসছি। দেখলাম পাকিস্তানী মিলিটারী কান্ধে কামান নিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে।' আমি নিজে গোলন্দাজ বাহিনীর একজন সদস্য। খুব ভাল করেই জানি, কামান তো কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায় না। এম্নিতেই এতোক্ষণ ধরে ওদের স্বাধীনতা বিরোধী কথাবার্তা অনেক কষ্টে সহ্য করতে করতে ভেতরে ভেতরে খুব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছি। তারপর যখন কামান কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কথা বলে উঠল তখন আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। কথাটা শোনামাত্র ধমকে উঠলাম, 'দূর মিয়া, কামান কি কান্ধে নিয়া ঘুরে বেড়ানো যায় নাকি?' আমি গ্রামের একজন সাধারণ রাখাল আর সামান্য লজিং মাস্টার-ওরা ধমকে ঘাবড়ে না গিয়ে বরং অবাক হলো। বললো, 'কামান কান্ধে নেয় না মাথায় নেয় সেটা তুমি জানলা কি কইরা?' ধরা পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। আমার পাশে বসা মুক্তিযোদ্ধা লুকিয়ে আস্তে করে আমার উরুঁতে চাপ দিচ্ছে। চাপের মানে, 'স্যার যথেষ্ঠ বলা হয়ে গেছে। আর কিছু বলবেন না। উত্তেজনা কমান।' আমি দেখলাম যা বলে ফেলেছি তা যথেষ্ঠ। আর কিছু বলতে গেলেতো ধরা খেয়ে যাব নির্ঘাৎ। এখন ওরা আমাকে উল্টা ধমক দিচ্ছে, 'জীবনে কোনদিন কামান দেখছো? আমরা খুলনায় দেইখা আসছি, পাঞ্জাবীরা কামান কান্ধে নিয়ে ঘুইরা

বেড়াইতাছে।' আমার ততক্ষণে সেন্স ফিরে এসেছে যে, এ ব্যাপারে তর্কে যাওয়া এই মুহূর্তে একেবারেই অনুচিত। সুতরাং ওদের কথাই ঘাড় নীচু করে মেনে নিলাম। অস্ফুট স্বরে বললাম, 'হ্যাঁ, তা হতেও পারে। আমিতো দেখি নাই। হতেও পারে।' এ যাত্রা উৎরে গেলাম অভিনয় ক্ষমতার গুণে।

এই ঘটনার দু'দিন পরে খবর পেলাম আমরা, একদল মুক্তিযোদ্ধা পিরোজপুর এবং মোরেলগঞ্জের মধ্যবর্তী একটি স্থানে অবস্থান করছে। এদের খোঁজার জন্য আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ওদের খুঁজতে খুঁজতে আমরা এখন যে মংলা ঘোসিয়াখালী ক্যানেল (বঙ্গবন্ধুর সময়ে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়), এ ক্যানেলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বেশ কিছু গানবোটের আনাগোনা দেখতে পেলাম। আমাদের সে সময়কার পরিকল্পনা হচ্ছে মংলাপোর্ট থেকে সুন্দরবন হয়ে ভারত যাওয়া। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সিনিয়র কমান্ডারস এবং অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা তখন জরুরী হয়ে পড়েছিল। এই উদ্দেশ্যে মংলাপোর্টের দিকে হাঁটছি আমরা। মধ্যবর্তী স্থানে জিউধরা নামে একটা জায়গা আছে। জিউধরায় আমাদের সঙ্গে দেখা হলো আউয়াল নামের সক্রিয় একজন আওয়ামীলীগ কর্মীর। পরবর্তীতে তিনি মুক্তিযুদ্ধের একজন কমান্ডার হিসেবেও সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। জিউধরা বাজারেএকটা দোকানে তাকে বসা অবস্থায় পেলাম। আমরা ঐ দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সে আমাদের সালাম দিল। আমিও সালাম দিয়ে মোটামুটি চিনি-চিনি, চিনি না এমন একটা ভাব করে সরে পড়লাম। কারণ আমাদের পরিচয়টা তখন দিতে চাচ্ছি না। কিন্তু সে আমার পিছু পিছু কিছুদুর এসে আমাকে ডাক দিল। এলাকার লোক হিসেবে সে আমাকে মামা ডাকত। সে বলল, 'কেমন আছেন মামা? কোথায় যাচ্ছেন?' বললাম, 'আমি যাচ্ছি মংলা পোর্ট হয়ে ইন্ডিয়ান বর্ডারের দিকে। ইন্ডিয়ায় যাব।' বলল, 'মামা, মংলা পোর্টের অবস্থাতো খুব খারাপ। ধরপাকড় হচেছ। রাজাকার-আলবদরদের খুব চাপ। এক কাজ করেন, আজকের দিনটা এখানে বিশ্রাম টিশ্রাম করেন। আমরা দেখি কোন গাইড-টাইড পাওয়া যায় কিনা।' পথে বিপদ আছে এটা আউয়ালের কাছ থেকে জানতে পেরে আমরা তখন আর এগোলাম না। ভাবলাম, একদিন অপেক্ষা করাই যাক। জিউধরায় আউয়ালদের বেশ কিছু জমিজমা আছে। এগুলো দেখাশুনা করার জন্য আউয়াল এবং তার ভাইয়েরা মাঝে মাঝে জিউধরা এসে থাকতো। এ কারণে একটা বাড়িও আছে সেখানে ওদের। একদিন অপেক্ষা করতে গিয়ে বেশ কয়েকদিন থাকা হয়ে গেল ওদের ওখানে। আউয়াল এবং তার বড়ভাই আমাদের যথেষ্ঠ আদর-আপ্যায়ন করলেন এই কয়দিন। সেখানে থাকা অবস্থায় আউয়ালকে আমি বললাম, 'পিরোজপুরের একদল মুক্তিযোদ্ধা মোরেলগঞ্জ এবং ফুলহাতা-এই অঞ্চলটাতে অবস্থান করছে। কোনভাবে কি এদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়?' আউয়াল

বলল, 'ফুলহাতার কাছে মল্লিকের বেড় নামে একটা জায়গা আছে। ওখানে আমার খালুরা থাকেন। ওনাদের কাছে গেলে খবর পাওয়া যেতে পারে।' আউয়ালের কাছ থেকে আরও জানা গেল তার খালুরা সক্রিয় আওয়ামীলীগার এবং স্বাধীনতার কড়া সমর্থক। যাহোক, আমরা একদিন সকালে হাঁটা পথে রওনা দিয়ে মল্লিকের বেড়ে গিয়ে হাজির হলাম। আউয়ালের খালু বাড়িকে চৌকিদার বাড়ি বলা হতো। সেই খালুবাড়িতে একটা বন্দুক ছিল। আমরা সেই বাড়িতে পৌঁছলাম, থাকলাম একদিন। পরদিন সকাল এগারোটায় চারদিকে হৈ-চৈ, গোলমাল। আউয়ালের খালু বাড়িতে আক্রমণ হয়ে গেছে। স্থানীয় কিছু লোকজন ঘটিয়েছে ঘটনাটা। ওদের উদ্দেশ্য অস্ত্র সংগ্রহ। অস্ত্র দিয়ে এরা যে ঠিক মুক্তিযুদ্ধ করবে সেটাও বলা যাচ্ছে না, আবার লুণ্ঠন বা ডাকাতি করবে এমনও নয়। আসলে মুক্তিযুদ্ধের সেই পর্যায়ে সামনের দিনগুলোকে খুব অনিশ্চিত মনে করে তারা সম্ভাব্য সব অস্ত্র নিজেদের আয়ত্বে রাখতে চাইছে। এর আগেই তারা পিরোজপুর এবং মোরেলগঞ্জের কিছু অস্ত্র পেয়ে গেছে। এখন আউয়ালদের খালুবাড়িতে যে বন্দুক আছে সেটা তাদের নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা। এদিকে আমি ওদের সেই দোনলা বন্দুকটা নিয়ে ঘরের মধ্যে পজিশন নিয়ে বসে আছি। এর মধ্যে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি পিরোপজুরের ফজলু গ্রুপ করতো এক রিকশাচালক, নাম আলী, সেই আলীর কাঁধে একটা রাইফেল এবং সে এই গ্রুপের সঙ্গে। আমি ভেবে দেখলাম শুধু একটা দোনলা বন্দুক নিয়ে ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চাইতে যেহেতু আমি আলীকে চিনি সেহেতু নিজের পরিচয় দিয়ে ওদের মুখোমুখি হওয়া ভাল। আমি খুব সাহস নিয়ে দরজা খুলে আলীকে ডাকলাম। আলীতো আমাকে দেখে অবাক। একেবারে লম্বা সালাম ঠুকল। 'স্যার আপনি এহানে।' সেতো একেবারে সবাইকে ডেকে ডেকে বলতে লাগল, 'উনিইতো আমাদের কমান্ডার জিয়া সাহেব। স্যার আপনি এহানে আছেন জানলেতো আসতাম না। বন্দুক-টন্দুক লাগলে আমরাই দিতাম।' এইসব বলে টলে একেবারে অন্যরকম পরিবেশ তৈরী করে দিল আলী।

এখান থেকে আমরা পরবর্তী আট দশ দিনে মোরেলগঞ্জ এবং শরণখোলায় যে সম্মিলিত মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়েছিল তাদের কাছে গিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। মোরেলগঞ্জে কবির আহমদ মধু এবং রায়েন্দা শরণখোলার সামসুল আলম তালুকদারের নেতৃত্বে প্রায় চারশ'র মতো মুক্তিযোদ্ধা সংঘটিত অবস্থায় গ্রামে-গ্রামে অবস্থান নিয়ে আছে। আমরা এই দু'জনের খোঁজ পেয়ে যাওয়ার পরে ওদের কাছে খবর পাঠালাম। ওরা আমাদের জন্য গাইড পাঠিয়ে দিল। আমরা সসম্মানে তাদের ঠিকানামত জায়গায় হাজির হয়ে গেলাম। গ্রামের মধ্যে বিশাল এক বাড়ি। সেই বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান করছে। কবির আহমদ মধু এবং সামসুল আলম তালুকদার মোটামুটি আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে তাদের কমান্ডার পদে বরণ করে নিলো। এরপর আমরা আমাদের পরবর্তী কর্মসূচী, সমরকৌশল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করলাম। এবং বাহিনীকে একটা সংগঠিত রূপ দেয়ার চেষ্টা করলাম। এইসমস্ত আলোচনা করতে গিয়ে আমার মনে হলো এতোদিন মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামে-গ্রামে অবস্থান করেছে এবং মোটামুটি গ্রামের লোকদের সাহায্য সহযোগিতা নিতে হচ্ছে তাদেরকে বাস্তবতার কারণেই। সত্যি বলতে কি এই মুক্তিযোদ্ধাদের মূলত নির্ভর করতে হচ্ছে গ্রামের বিত্তশালী লোকদের ওপর, যারা সাহায্য করলেও প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি নয়। তারা সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে এদের খাওয়া-দাওয়া ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করছে। এই ধনী লোকগুলোর অধিকাংশই বড় বড় জোতদার এবং মুসলিমলীগ, জামাতে ইসলামীর দালাল। কিন্তু যেহেতু এলাকায় চার-পাঁচশ মুক্তিযোদ্ধার অবস্থান সে কারণে তাদেরকে না চটিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে রাখাই অধিক যুক্তিসংগত- এমন একটা অবস্থা। এই ব্যাপারটা উপলব্ধি

করতে পেরে আমি সিনিয়র কমান্ডারদের সঙ্গে আলোচনার এক পর্যায়ে বললাম, 'সমগ্র বাহিনী নিয়ে সুন্দরবনের ভেতরে চলে যেতে হবে। একটা গেরিলা যুদ্ধে পশ্চাৎভূমি না থাকলে গেরিলা যুদ্ধ করা যায় না। এই শিক্ষা আমরা চীনের লালফৌজের কাছ থেকে পাই। কাজেই আমাদেরও উচিত সুন্দরবনকে পশ্চাৎভূমি হিসেবে গ্রহণ করা। সেখানে আমরা ঘাঁটি গড়ে তুলবো।'

আমার এই ধারণাটা কিন্তু অধিকাংশ কমান্ডারই গ্রহণ করলেন না। তারা ভাবতেই পারছিলেন না এমন একটা প্রস্তাব আমি কিভাবে দিলাম। সুন্দরবনের বিপদ শংকুল জংগলে কি করে অবস্থান নেব, কি করে থাকব! কোথায় খাওয়া দাওয়া পাওয়া যাবে? এসমস্ত প্রশ্ন উচ্চারিত হলো। আমি বুঝতে পারছি সুন্দরবনে ঘাঁটি করতে গেলে খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা হবে ঠিকই, কিন্তু যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি নয় তাদের বাড়িতে খেয়ে দেয়ে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে লড়াকু একটি বাহিনী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করাও অসম্ভব। এদিকে কমান্ডারদের অধিকাংশই আমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেন। তারা বললো, 'স্যার, সুন্দরবনে গিয়ে কি করে আমরা অবস্থান করবো? আমাদের রসদ জোগাড় কি করে হবে? পাঁচ-ছয়শ'র মতো লোক। পিরোজপুর থেকে আরো মুক্তিযোদ্ধারা আসছে। এখন আমরা গ্রামের স্কুল-কলেজগুলোতে থাকছি। গ্রাম থেকে খাওয়া দাওয়া আসছে। এটাইতো ভাল।' আমি বললাম, 'এইভাবে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছানো যাবে না। যদি আমাদের উদ্দেশ্য থাকে লড়াকু মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা, তাহলে অবশ্যই পশ্চাৎভূমি সুন্দরবনে ফিরে যেতে হবে এবং শত্রু এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করার ব্যবস্থা নিতে হবে। এভাবে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে আমাদের লাভ নেই।'

চূড়ান্তভাবে আমি যখন জানিয়ে দিলাম সুন্দরবনে যেতেই হবে তখন কমান্ডারের আদেশ হিসেবে সবাই সেটা মেনে নিলেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে জনগণের সাহায্য নিয়ে প্রথমে আমরা জোগাড় করলাম প্রায় সত্তুরটার মতো নৌকা। তারপর রওনা দিলাম সুন্দরবনের গভীর অঞ্চলের দিকে। জনবসতি এবং সুন্দরবন-এর মাঝখানে ভোলা নদী। এই ভোলা নদী ধরে মাইল দেড়েক ভেতরে গিয়ে আমরা পার্শ্ববর্তী একটা খালে অবস্থান নিলাম। সুন্দরবনে যেদিন ঢুকেছি তার পরেরদিন থেকে প্রচন্ড বৃষ্টিপাত শুরু হল। যাকে বলে একেবারে অঝোর ধারায় বর্ষণ। আমরাতো খালের মধ্যে নোঙর করেই আছি। পাঁচদিন-ছয়দিন চলে যায়। বৃষ্টি আর থামছে না। সব মুক্তিযোদ্ধা নৌকার ভেতর অপেক্ষমান। দুর্যোগের মধ্যেই রান্না-খাওয়া-দাওয়া চলছে। ধোঁয়ায় সবার চোখ লাল। অবস্থা দেখে আমার নিজেরই শেষ পর্যন্ত খারাপ লাগতে শুরু করলো। ওদেরকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুন্দরবনে নিয়ে এসে বিপদের মধ্যে ফেললাম। ঝামেলার সৃষ্টি করলাম। সত্যি বলতে কি সুন্দরবনে কিভাবে থাকবো সেটা আমি নিজেও জানিনা। ষষ্ঠ দিনে আমি খুব দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লাম।

দুপুরে খেলাম। কিন্তু মনটা খুব ভারাক্রান্ত। মাথায় চিন্তা, মুক্তিযুদ্ধ এগোচ্ছে কোথায়? পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কোথায়? পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ কোথায়? পাঞ্জাবীদের ওপর অ্যাম্বুশ কোথায়? পাকিস্তানীদের ওপর রেইড এবং স্টকিং কোথায়? কিছুইতো হচ্ছে না। এই সমস্ত ভাবনায় মনটা আচ্ছন্ন। দুপুরের পর শুয়ে-শুয়ে ঝিমাচ্ছি আর চিন্তা করছি সুন্দরবনের মধ্যে কিভাবে ঘাঁটি করে বাহিনী গড়া যায়। আমরা থাকবো কি করে? ঝিমোতে ঝিমোতে হঠাৎ করে মাথার মধ্যে একটা চিন্তা খেলে গেল। একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম মুহূর্তের মধ্যে। আমি শোয়া থেকে উঠে বসে মাঝিকে বললাম, 'আমাদের নৌকাটা পাড়ে ভিড়িয়ে দাও।' মাঝি আদেশমত কাজ করল। নৌকা পাড়ে ভিড়ানোর পর মাঝিকে বললাম, 'তোমার কাছে কুড়াল-টুড়াল জাতীয় কিছু আছে? থাকলে দাও।' মাঝি বললো, 'হ্যাঁ,

কাছে একটা কুড়াল আছে।’ মাঝির কাছে থেকে কুড়াল নিয়ে আমি নেমে পড়লাম। রওনা দিলাম বনের দিকে। নৌকাতে যেসব মুক্তিযোদ্ধা ছিল তারা অবাক হয়ে কমান্ডারের কাজকর্ম দেখছে। দু’এক মিনিটের মধ্যে খবরটা সমস্ত নৌকায়–নৌকায় ছড়িয়ে পড়ল যে, তাদের কমান্ডার একটা কুড়াল নিয়ে সুন্দরবনে চলে গেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সামসুল আলম তালুকদার, কবির আহমেদ মধুসহ প্রায় সবাই এসে হাজির। ইতিমধ্যে আমি প্রায়–দু–আড়াইশ গজ ভেতরে ঢুকে একটা গাছ কাটতে আরম্ভ করেছি। সিনিয়র কমান্ডাররা এসে দেখল তাদের কমান্ডার নিজে কুড়াল দিয়ে গাছ কাটছে। ওরা বললো, ‘কি ব্যাপার, আপনি নিজে গাছ কাটছেন? দেন, আমাদের কাছে কুড়াল দেন। আমরা কেটে দিচ্ছি। আপনি গাছ কাটছেন–জ্বালানী কাঠের অভাব হলো নাকি?’ ওরা বেশ বিব্রত ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল। আমি বললাম, ‘যদি আপনাদের কিছু করতে ইচ্ছা করে, তাহলে আপনাদের নৌকাতে যে কুড়ালগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আসুন এবং আমি যা করছি তাই করুন।’ ওরা কেউ কেউ আমার কথা বুঝল, কেউ হয়তো বুঝল না কেন বলছি। তবে সবাই গিয়ে যায় যার নৌকা থেকে কুড়াল নিয়ে এল। প্রায় চল্লিশটার মতো কুড়াল জোগাড় হল। শুরু হলো গাছ কাটা। দু’ঘন্টার মধ্যে মোটামুটি তিনচার বিঘা জায়গার গাছ কেটে পরিষ্কার করা হলো। তারপর আমি ওদের জায়গা নির্দেশ করে দেখালাম, এই পাশে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ব্যারাক তৈরী হবে। এই পাশে রান্নাঘর তৈরী হবে। এই পাশে বাংকার তৈরী হবে। এখানে ট্রেনিং গ্রাউন্ড তৈরী হবে। এখানে ক্যাম্প ফায়ারের ব্যবস্থা হবে। এই ভাবে জায়গা ভাগ করে দিয়ে আমি ওখানেই বসলাম। শুরু হলো কাজ। রাত আটটার মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধাদের বাসযোগ্য একটা ব্যারাক তৈরী হয়ে গেল। এতো তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে যাওয়ার কারণ সমস্ত উপকরণের সহজলভ্যতা। কাঠ পাওয়া যাচ্ছে। লোহা কিংবা রশি পাওয়া না গেলেও জঙ্গলে খুব ভাল লতা আছে, সেগুলো পাওয়া যাচ্ছে। ওখানে চাল করার জন্য গোলপাতা পাওয়া যাচ্ছে। চারদিকে বেড়া দেয়ার উপকরণও আছে। কোন কিছুর জন্যই আমাদের শহরে–বন্দরে যেতে হবেনা। লোকসংখ্যাও প্রচুর। তরতরিয়ে কাজ এগিয়ে গেছে। একটা জঙ্গল যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে ধরনের ঘাঁটি প্রয়োজন সে ধরনের ঘাঁটি গড়ে তোলার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। বলতে গেলে দায়ে ঠেকে শিখলাম আমরা। কোন রকম পূর্ব প্রস্তুতিতো ছিলইনা। এই যে ঘাঁটি গড়ার পরিকল্পনা প্রথম দিনে আমি দিলাম, পরবর্তীতে এই ধারণার ভিত্তিতে সুন্দরবনে প্রায় একশ’র মতো ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে প্রায় চোদ্দহাজার মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান করেছে। আমাদের মুল ঘাঁটি ছিল তেতুলবাড়িয়ায়, একটা ছোট্ট নদীর মধ্যে। এই তেঁতুলবাড়িয়া জায়গাটা রায়েন্দা ও মোরেলগঞ্জ থেকে চার–পাঁচ মাইল অভ্যন্তরে। এই ঘাঁটি এলাকার প্রায় তিরিশ মাইল দুরে আমি বিকল্প আরেকটি ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলাম।

যাহোক প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমাদের ঘাঁটি স্থাপনতো হল। প্যারেড গ্রাউন্ড তৈরী হলো। রাতের বেলা ক্যাম্প ফায়ারের আয়োজন করা হলো। সবার মধ্যে যেন প্রাণ ফিরে এলো। এবার জঙ্গলযুদ্ধে আমাদের যাত্রা শুরু। আরো দুয়েকটা ছোট খাট ঘাঁটি আশে–পাশে আমরা গড়ে তুললাম। তখনো পর্যন্ত পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে ছোট–খাট সংঘর্ষ ছাড়া বড় ধরনের যুদ্ধ আমরা করিনি। আমাদের এই ঘাঁটি স্থাপিত হওয়ার পরেই সিনিয়র কমান্ডারস যারা ছিলেন তাদের একটাই বক্তব্য, ‘আপনি যথাশীঘ্র সম্ভব অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার মধ্যে দিয়ে অস্ত্রের জোগান নিশ্চিত করুন। নইলে পাকিস্তানীদের গানবোটের সামনে আমরা অসহায়ই হয়ে থাকব।’

ঘাঁটি স্থাপনের সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই আমরা সুন্দরবন হয়ে মুজিবনগর চলে যাব কিংবা অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের প্রয়োজনটা জানাব–এই সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললাম। সিদ্ধান্ত নেয়ার পর সে ধরনের লোক সংগ্রহ করতে লাগলাম ধীরে ধীরে। যারা এই সমুদ্র এলাকা দিয়ে ভারত যাওয়ার পথ চেনে এমন লোক এবং সমুদ্র পথের উপযোগী নৌকা এবং মাঝিও আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। কারণ সমুদ্রে যে কোন নৌকা এবং যে কোন মাঝি নিয়ে চলা সম্ভব নয়। এটা করতে গিয়ে আমার মনে পড়ল পিরোজপুরের রইজুদ্দিন নাইয়ার কথা। এই রইজুদ্দিন চোরাকারবারের সঙ্গে জড়িত ছিল। তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। ওকে খবর পাঠালাম, 'তুমি আমাকে গোপন সমুদ্র পথে মুজিবনগরে নিয়ে যাবে।' এই কাজে সে পারঙ্গম। সমুদ্রপথে চলার জন্য বিশেষ ধরনের হাল, বৈঠা ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। মাঝিকেও হতে হয় অভিজ্ঞ। যাহোক রইজুদ্দিন নৌকা তৈরী করল। সে এবং তার বিশ্বস্ত কিছু লোকজনও যোগ দিল আমাদের সঙ্গে। যদিও রইজুদ্দিন এক সময় চোরাকাররারের সঙ্গে যুক্ত ছিল কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের এই পর্বে মুক্তিবাহিনীকে যে সহযোগিতা সে দিয়েছে সেটা অবশ্যই স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। বিশেষ করে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল অবস্থায় মুজিবনগর থেকে তিনশ মাইল দূরত্বে ঘাঁটি গড়ে তোলার পেছনে যাদের ছোট বড় অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে রইজুদ্দিন অন্যতম। প্রায় পনেরো–বিশদিন ধরে রইজুদ্দিন গ্রুপ তৈরী হলো। বড় নদী ও সমুদ্রের মোহনা দিয়ে পাড়ি জমাতে হবে। তারপর সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে যেসব পথ দিয়ে তারা চোরাচালান করতো সেই সব পথ দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যাবে। এ কারণেই আমরা ওদের ওপর নির্ভর করলাম বেশী।

প্রস্তুতি নেয়ার পর, জুলাই মাসের শুরুতে আমরা গিয়ে হাজির হলাম জেনারেল ওসমানী সাহেবের হেড কোয়ার্টারে। প্রায় চল্লিশজনের মতো মুক্তিযোদ্ধা আমার সঙ্গে। ভারতের জনগণ এবং সরকার আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যথেষ্ঠ সহযোগিতা করেছে , এটা স্বীকার করতেই হবে। প্রায় এককোটি শরণার্থীকে তারা আশ্রয় দিয়েছে, খাইয়েছে। লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে তারা আশ্রয় দিয়েছে। আমরা প্রথমে গিয়ে হাজির হলাম ক্যানিং থানা বন্দরে। মুক্তিবাহিনীকে নৌকাতেই অবস্থান করতে বলে আমি সরাসরি ক্যানিং থানার অফিসার ইনচার্জের রুমে এসে ঢুকলাম। অফিসারের কাছে নিজের পরিচয় দিলাম। এবং তাকে বললাম উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তিনি আমার কথামতো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার পরিচয় এবং আগমন বার্তা জানিয়ে দিলেন। জানানোর পরে একজন কর্মকর্তা এসে আমাকে নিয়ে গেলেন ওসমানী সাহেবের ওখানে। মেজর জলিলের সঙ্গেও দেখা হলো।

ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের মিত্র হিসেবে প্রয়োজনীয় অস্ত্র এবং অন্যান্যভাবে আমাদের যথেষ্ঠ সহযোগিতা করেছে সেসময়, এটা অস্বীকার করার বিষয় নয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোন বাঙালী অফিসার যদি ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার জন্য সহযোগিতা চাইতো তাহলে প্রথমে তাদের ওপর একটা ইনভেস্টিগেশন করা হতো। আমার ওপর ইনভেস্টিগেশনের পালা শুরু হলো। প্রথমে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ঐতিহাসিক ফোর্ট উইলিয়ামে। বিভিন্ন খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য তারা জিজ্ঞাসাবাদের পদ্ধতি চালু করেছে সেখানে। এরপর তারা আমাকে এক বৃটিশ বৃদ্ধা মহিলা পরিচালিত একটা হোটেলে নিয়ে রাখল। বেশ দামী হোটেল বলতে হবে। এবং তারা সেখানে আমাদের যথেষ্ঠ আদর-আপ্যায়নই করেছে বলা যায়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা এ ব্যাপারে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেছে। মেজর করনা নামক একজন অফিসারের ওপর দায়িত্ব পড়ল আমার যাবতীয় দেখাশোনার জন্য। ওরা আমার কাছে জানতে চাইছিল মার্চ মাসের পরবর্তীতে বাংলাদেশের অবস্থা। পাকিস্তানীরা ঠিক কি ধরনের অত্যাচার আমাদের ওপর চালিয়েছে, তাদের সামগ্রিক শক্তি কি রকম, মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান, সাধারণ মানুষের মানসিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে জানতে তারা যথেষ্ঠ আগ্রহ প্রকাশ করল। আমি সম্ভাব্য ধারণা নিয়েই তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতাম। মেজর করনার বাড়ী উত্তর প্রদেশে। তিনি একজন নিরামিশাষী ব্যক্তি। আমাকে তিনি সবসময়ই ভাল খাওয়াতে চাইতেন। বলতেন, 'তুমি সুন্দরবনে থেকে বেশ দুর্বল হয়ে গেছ। ভালভাবে খাও।' এখানে কিছুটা অবান্তর হলেও একটা আশ্চর্য ঘটনা বলে নেয়ার লোভ সামলাতে পারছিনা। একদিন মেজর করনা আর আমি একটা রেষ্টুরেন্টে বসে খাচ্ছি। রেষ্টুরেন্টের ডেস্ক ম্যানেজারের মাথার ওপর নেতাজী সুভাষ বসুর একটি ছবি টাঙ্গানো। মেজর করনা আমার কাছে জানতে চাইলেন, 'এই ছবিটা কার সেটা তুমি জান?' বললাম, 'হ্যাঁ, জানি।' উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'বলোতো কার?' 'নেতাজীর ছবি।' আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, 'এটাতো সবাই জানে, সবাই চেনে। বাঙালীরা সবাই চেনে।' এরপর মেজর হঠাৎ করে তারা মানিব্যাগ থেকে একটা ছবি বের করে আমার সামনে ধরলেন। তার বর্ণনায় ছবিটি হচ্ছে, জওহরলাল নেহেরুর মরদেহ। মরদেহ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসা সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এই সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের মধ্যে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর হাতে একটা লাঠি। সারা শরীর শ্বেত শুভ্র কাপড়ে আবৃত। লোকটির দাঁড়ি এবং চুলও সব ধবধবে সাদা। মেজর করনা প্রশ্ন করলেন, 'এই ছবির মধ্যে যারা আছেন তাদের কাউকে তুমি চেনো?' আমাকে উত্তর দেয়ার সুযোগ না দিয়ে আবার জানতে চাইলেন, 'এই যে দাড়িঅলা সাধু, এঁকে তুমি চেনো?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাইতো। এটাতো নেতাজীর ছবি।' ম্যানেজারের মাথার ওপর টাঙ্গানো ছবি এবং মেজরের হাতের ছবিটির বৃদ্ধ একই ব্যক্তি। ব্যবধানটা বয়সের। তখন মেজর করনা বললেন, 'এটা আমাদের কাছেও বিরাট এক রহস্য। তুমি কি কখনো এধরনের কোন লোক পাহাড়ে জংগলে দেখেছ?' আমি বললাম, 'না, দেখিনি।' এই ছবি নিয়ে ভারত সরকার বেশ, বিপাকেই পড়েছিল বলে আমার মনে হয়। মেজর করনা বললেন, 'সোভিয়েত প্রতিনিধিদল এসেছে। কিন্তু তাদের প্রতিনিধি দলের সংখ্যা কিংবা পরিচয় কিছুই তারা প্রকাশ করেনি। তারা এসেছে, শেষকৃত্যে সম্মান প্রদর্শন করে আবার চলে গেছে। এবং আমাদের ধারণা সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের সঙ্গে নেতাজী এসেছিলেন। নেতাজীর হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় সেটার ভিত্তিতেও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, মঙ্গোলিয়া হয়ে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় চলে-গেছেন। কারণ, জানানো হয়েছে মঙ্গোলিয়ার ওপরে বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেছেন।' যাই হোক, আমি অত বুঝতে পারলাম না। মেজর করনা

আমাকে অনুরোধ করলেন যদি পাহাড়ে বা জঙ্গলে কোন সময় নেতাজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাত ঘটে তাহলে যেন তৎক্ষনাৎ তাদের সেটা জানিয়ে দেই। আমি বললাম, 'ঠিক আছে জানাব।' অবশ্য আমার সেই সৌভাগ্য হয়নি কোন সময়ই।

চোদ্দ-পনের দিন পরে ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ সালে আমাকে বললেন, 'আমি যাচ্ছি ব্যারাকপুরে এবং তোমাকে আমি মুজিবনগর হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে দেব।' আমরা রওনা দেয়ার প্রস্তুতি নিলাম। যাব জীপে করে। ব্রিগেডিয়ার সাহেব নিজেই গাড়ী চালাবেন। আমার জন্য নির্ধারিত দ্বিতীয় আসনটি। মেজর করনা বিদায় দেয়ার সময় আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন। তার চোখগুলি ছলছল করছে। তিনি আমাকে ইংরেজীতে বললেন, 'আমি জানি, প্রাণঘাতী যুদ্ধে তোমাকে জড়িয়ে পড়তে হবে। নিজের ওপর খেয়াল রেখো। যত্ন নিও। বেঁচে থাকতেই হবে জিয়া, তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে।'

আমার সঙ্গে চোদ্দদিনের পরিচয় আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছেন পাকিস্তানীদের সঙ্গে কোনরকম আপোষ করার মানসিকতা আমার মধ্যে নেই এবং পাকিস্তানীদের অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণের যথোচিত প্রতিউত্তর আমি দেব-এমন একটা দৃঢ় মানসিকতা আমার আছে। এই অল্প কয়দিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছেন আমার দেশপ্রেমের গভীরতা কতটুকু। আমার কথাবার্তা শুনে সম্ভবত আমার প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠেছে তার মনে। ভালবাসাও সে কারণেই। তাই বিদায়ের সময় অশ্রু ছলছল আঁখি। আমি তাকে ধন্যবাদ দিলাম। বললাম, 'আমার দেশ আক্রান্ত। এখন আমি কি করব আর করব না সেটা এতো আগে থেকে চিন্তা-ভাবনা করে ঠিক রাখা যাবে না। আপনি আশীর্বাদ রাখবেন।'

বিদায় নিয়ে আমি জীপে উঠে বসলাম। ব্রিগেডিয়ার সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন প্রথম সারির অফিসার। তাঁর সমস্ত আচরণে একটা বিশেষ নিজস্বতা ছিল। তিনি আমাকে প্রথমে নিয়ে এলেন ব্যারাকপুরে। তারপর জীপে করে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন হাসনাবাদ-টাকি এলাকায় যেখানে মেজর জলিল সাহেবের নবম সেক্টর হেড কোয়ার্টারের অবস্থান।

এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারত যাওয়ার পর প্রথমে যখন জেনারেল ওসমানীর হেডকোয়ার্টারে গেলাম তখন ওসমানী সাহেব আমাকে বলেছেন, 'সুন্দরবনে ঘাঁটি যখন করেই ফেলেছো তাহলে এটাকে জোরালো করতে হবে।' তিনি মেজর জলিলকেও এ ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের কথা বললেন।

আমি নবম সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছার পর মেজর জলিলের সঙ্গে রণকৌশলগত আলাপ-আলোচনা শুরু করলাম। আমি তাকে এটা বুঝাতে সক্ষম হলাম যে, সুন্দরবন একটা গেরিলা যুদ্ধের পশ্চাৎভূমি হিসেবে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। বললাম, 'আমরা যদি শুধুমাত্র বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করি তাহলে দেশের মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি করা সম্ভব নয়। আমাদের ঝুঁকি নিতে হবে। আমাদেরকে দেশের মধ্যে অবস্থান গড়ে তুলতে হবে। দেশের মধ্যে আমাদের পশ্চাৎভূমি গড়তে হবে। তাহলেই আমাদের মুক্তির যুদ্ধে অগ্রগতি সম্ভব।' জলিল সাহেবও অবশ্য আমার সমস্ত ধারণাগুলো সমর্থন করেছেন।

এরমধ্যে চলতে লাগলো আলোচনা। কোন বার আমি আর জলিল সাহেব, আবার কখনো ব্রিগেডিয়ার সালে ও জলিল সাহেব, আবার কখনোবা আমরা তিনজন মিলে আলোচনা করেছি। কেননা এত ভেতরে স্বতন্ত্র কমান্ড নিয়ে, জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে জঙ্গল যুদ্ধ পরিচালনা করে একটি আরণ্য এলাকাকে পশ্চাৎভূমি হিসেবে ব্যবহার করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ ঠিক তেমনি কষ্টকরও বটে। আমার মনে হচ্ছিল মুক্তিবাহিনী এবং মিত্র বাহিনীর হাই কমান্ডরা কেউই বিশ্বাস করতেন না যে, এত সহজে এই অবস্থানটা গড়ে

উঠতে পারে। ব্রিগেডিয়ার সালে, আমি এবং মেজর জলিল একদিন বসলাম আলোচনায়। ব্রিগেডিয়ার সাহেব বেশ চিন্তিত ছিলেন আমাদের ঘাঁটি গড়া সম্পর্কে। তিনি একদিন সকালবেলা আমাকে বললেন, 'মংলাপোর্ট সুন্দর বনের মধ্যে, কাছাকাছি, তাইনা?' আমি বললাম 'জি স্যার।' 'হিরন পয়েন্টে আউটার এনকোরেজ আছে?'

'জ্বি।'

তখন তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন–ন্যাভাল কমান্ডোদের সাহায্যে মংলা পোর্ট এবং হিরন পয়েন্টে পাকিস্তানীদের সামরিক সরবরাহ এবং তাদের সমুদ্রগামী জাহাজগুলোর ওপর হামলা চালানো সম্ভব কিনা। আমি বললাম, 'অবশ্যই সম্ভব।' সকালবেলাতেই ব্রিগেডিয়ার সাহেব জীপে করে আমাকে নিয়ে চললেন ঐতিহাসিক সেই পলাশীর আম্রকাননে, কীর্তিনাশার তীরে। এই আম্রকানন থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে বাংলাদেশের নৌ কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ শিবিরের অবস্থান। আম্রকাননের পাশে, রাস্তার ঠিক মাঝখানে নবাব সিরাজউদ্দৌলার স্মৃতিসৌধ। ব্রিগেডিয়ার সালে জানতেন বাঙালী হিসেবে নবাবের প্রতি আমাদের আত্মার টান আছে। তিনি নিজেই ড্রাইভ করছেন। স্মৃতি সৌধের ঠিক পাশে জীপ থামালেন। তারপর কিছুটা নাটকীয়ভাবেই আমাকে বললেন, 'এই হচ্ছে সিরাজের স্মৃতিসৌধ। বাঙালীর পরাজয়ের ইতিহাস এখান থেকেই শুরু।' আমি বিনীত এবং দৃঢ়ভাবে বললাম, 'স্যার, আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসও আবার শুরু হচ্ছে।' তিনি একটুকরো সম্মতিসূচক হাসি হেসে নীরবেই জানালেন যে, 'ঠিকই বলছো তুমি।' আমি সেই স্মৃতিসৌধের সামনে সামরিক কায়দায় দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। আমার মনে হয়েছিল আমাদের শেষ স্বাধীন নবাবকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানানোই উচিত। যাহোক, শ্রদ্ধা জানানোর পর আবার জীপে চড়ে রওনা দেয়া। ইঁট বিছানো রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম কীর্তিনাশার দিকে। কীর্তিনাশার তীরে গিয়ে দেখলাম বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি, কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ–এইসব শিক্ষাঙ্গণ থেকে বাছাই করা সাহসী ছাত্রদের নিয়ে গঠিত নৌ–কমান্ডো বাহিনীর প্রশিক্ষণ পুরোদমে চলছে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে অধিকতর শিক্ষিত এবং চৌকস সদস্যরা ট্রেনিং নিচ্ছে সেখানে। আমি ব্রিগেডিয়ার সাহেবের সঙ্গে পুরো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ঘুরে দেখলাম। তাঁবু খাটিয়ে বানানো হয়েছে প্রশিক্ষণ শিবির। এই শিবিরের প্রশিক্ষণ সার্বক্ষনিক। থাকা–খাওয়ার আয়োজন সব সে খানেই। কীর্তিনাশার তখন করুণ অবস্থা। তবে কিছু কিছু জায়গায় পানির গভীরতা তখনও ছিল। এই গভীর অঞ্চলগুলোতেই নৌ–কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। আগের কথা অনুযায়ী ব্রিগেডিয়ার সালে আমাকে বললেন, 'এদের মধ্য থেকে তুমি পছন্দ করো যতোজন নিতে চাও।' আমাদের সার্বিক পরিকল্পনা অনুযায়ী মূলতঃ দুটি জায়গায় আমার হামলা করার কথা। একটা হচ্ছে মংলা সামুদ্রিক বন্দর, আরেকটা হচ্ছে হিরন পয়েন্টের আউটার এনকোরেজ যেখানে জাহাজ থেমে থাকে এবং জোয়ারের পানির উচ্চতা বাড়লে তারপর বাংলাদেশের মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের পাইলট নিয়ে তারা সুন্দরবনের ভেতর থেকে মংলা পোর্টে চলে আসে। উক্ত দুটি জায়গায় হামলা করার জন্য আমি ৩৪ জন নৌ–কমান্ডো চাইলাম। মংলা পোর্টের জন্য ২০ জন, হিরন পয়েন্টে যেহেতু জাহাজ কম থাকে সেহেতু হিরণ পয়েন্টে আক্রমণ করার জন্য ১৪ জন। আমাকে চাহিদা অনুযায়ী ৩৪ জন নৌ কমান্ডো দেয়া হলো। তাদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করানো হলো। প্রশিক্ষকদের সঙ্গেও পরিচিত হলাম। যে সব সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহার করা হচ্ছে প্রশিক্ষণের জন্য সেগুলো আমাকে চিনিয়ে দেয়া হলো। এরপর দুপুরের লাঞ্চ। নির্ধারিত ৩৪ জন কমান্ডোকে বলে দেয়া হলো কোন জায়গায় আমার সঙ্গে মিলিত হতে হবে।

জায়গাটি হচ্ছে নবম সেক্টর হেডকোয়ার্টার। সেখানে যাওয়ার দিন–তারিখ, সময় নির্ধারণ করে দেয়া হলো।

জুলাই মাসের ২২ কি ২৩ তারিখ আমরা বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করার পরিকল্পনা নিলাম। এর আগে অবশ্য মুজিব নগরের অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে এবং নবম সেক্টরের কমান্ডার মেজর জলিলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা সেরে নিয়েছি। চলে আসার সময় মিত্রবাহিনীর পক্ষ থেকে আমাকে বেশ কিছু অস্ত্র দেয়া হয়। মেজর জলিল ও জেনারেল ওসমানীর মাধ্যমে আমি মিত্রবাহিনীর কাছে কিছু অস্ত্র চেয়েছিলাম। চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্রিগেডিয়ার সালের মাধ্যমে এর অনুমোদন পাওয়া গেল। যেহেতু ২২/২৩ জুলাই আমরা বাংলাদেশের সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পরিকল্পনা করেছি সেহেতু আমরা ভারতীয় সুন্দরবনের একটা অংশে অবস্থিত মিত্রবাহিনীর ব্রিগেড কমান্ডে গিয়ে হাজির হলাম আগেই। সি সেক্টরের ব্রিগেড কমান্ডার সেখানে। আমরা ব্রিগেডিয়ার সালের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। আমার সঙ্গে প্রায় সাতশ'র মতো মুক্তিযোদ্ধা। এই মুক্তিযোদ্ধারা এরই মধ্যে প্রশিক্ষণ পেয়ে গেছে।

মেজর ভট্টাচার্য ছিলেন উক্ত ভারতীয় ব্রিগেড কমান্ডের মেজর। তাকে আগেই বলা হয়েছিল যে আমার তিরিশটার মতো নৌকা দরকার। সাতশ'র মতো লোক নিয়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা দিয়ে সুন্দরবনের ভেতরে ঢুকতে হবে। সুতরাং ভাল পরিমাণে বাহন প্রয়োজন। মেজর ভট্টাচার্য এই সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করেছিলেন এবং নৌকা তিনি বানিয়েও রেখেছিলেন। কিন্তু সেই নৌকাগুলো দেখে একদিকে যেমন হতাশ হতে হলো, অন্যদিকে তেমনি হাসি চেপে রাখা দায়। কারণ, মেজর সাহেব যেসব নৌকা বানিয়েছিলেন–সেগুলো আমাদের দেশে বিলে কিংবা ছোট খালে চালানোর জন্য তিনকাঠের যে নৌকা বানানো হয় ঠিক সেইরকম। মনে মনে ভাবছি, পেরোতে হবে সমুদ্র আর নৌকা বানানো হয়েছে খালের। আমি ব্রিগেড মেজর ভট্টাচার্য সাহেবকে খানিকটা দুঃখের হাসি হেসেই বললাম, 'স্যার আপনি এই নৌকা কেন বানিয়েছেন, কী বানিয়েছেন? আমরাতো সাগর পাড়ি দেব।' আমার কথা শুনে বেচারা একটু বিচলিত হলেন। ভুলটা বুঝতে পারলেন। এখন কি করা? বাংলাদেশ থেকে ভারতে গমনকারীদের বেশ কয়েকটা বড় বড় নৌকা পাওয়া গেল ভাগ্যক্রমে। প্রায় সাত–আটটা নৌকা আমরা কিনলাম। সেগুলো আবার নিয়ে আসতে হলো ভারতীয় ব্রিগেড কমান্ডের অস্থায়ী নৌ বন্দরে। এবার আমাকে অস্ত্র দেয়ার পালা। আমাদের সুন্দরবন ও দক্ষিণাঞ্চলের সাবসেক্টর কমান্ডের জন্য বেশ কিছু অস্ত্র আমরা পেলাম মিত্রবাহিনীর কাছ থেকে। মেজর জলিলের কাছ থেকেও কিছু অস্ত্র পেলাম। নৌ কমান্ডোদের জন্য পাওয়া গেল প্রায় দুইশত লিম্পেট মাইন। অস্ত্রশস্ত্র হস্তান্তরের পরে ব্রিগেডিয়ার সালে আমাকে ডাকলেন

বিদায়ের আগে শেষবারের মতো প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়ার জন্য। আমি ব্রিগেডিয়ার সাহেবের জন্য অস্থায়ীভাবে নির্মিত অফিসে গিয়ে বসলাম। ব্রিগেডিয়ার সাহেব আলোচনার মাধ্যমে আমাকে বোঝালেন গেরিলা যুদ্ধের জন্য কি ধরনের আক্রমণ পরিচালনা করা দরকার। মংলা পোর্টে সমুদ্রগামী জাহাজগুলো লিম্পেট মাইনের সাহায্যে ধ্বংস করা এবং হিরন পয়েন্টের বহির্নোংগরে থেমে থাকা জাহাজগুলো ধ্বংস করাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনা শেষে তিনি আমাকে নিয়ে তার অফিস ও ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের ভেতর ঘুরলেন। ঘুরতে ঘুরতে একটা তাঁবুর সামনে এসে তিনি তার হাতের লাঠি দিয়ে তাঁবুর সামনের পর্দাটা সরালেন। তারপর বললেন, 'এইগুলো সব তোমাদের জন্য।' দেখলাম তাঁবু বোঝাই বিভিন্ন ব্রান্ডের হুইস্কী এবং অন্যান্য মদ। আমি তাকে বিনীতভাবে বললাম, 'আপনাকে ধন্যবাদ। তবে এগুলো আমাদের দরকার নেই। আমরা মদ খাইনা।' উনি বললেন, 'তুমি বুঝতে পারছ না, জঙ্গলযুদ্ধ পরিচালনা করা কত কঠিন। তোমাদের স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে। কাজেই এধরনের কিছু হুইস্কী এবং অন্যান্য শক্তিশালী জিনিস তোমাদের খেতে হবে।' আমি তাকে পাল্টা বুঝানোর ভঙ্গিতে বললাম, 'আমরা যে যুদ্ধ করছি এটা স্বাধীনতা যুদ্ধ। একই সঙ্গে জনযুদ্ধও বটে। এই জনযুদ্ধে আমাদের গেরিলা অবস্থান সম্পূর্ণভাবেই জনগণের সাহায্য সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান তারা এধরনের মদ্যপান মোটেই পছন্দ করে না। আমরা যদি মদ খাই তাহলে তারা মনে করবে যে আমরা বিপথগামী হচ্ছি। কাজেই এই মদ বা হুইস্কী আমরা নিতে পারবো না।' এরপর অবশ্য ব্রিগেডিয়ার সাহেব আমার কথার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, আমি বোধহয় ভুলই করেছি। দরকার নেই, এগুলো তোমরা নিওনা।'

এরপরে তিনি আমাকে পাশের তাঁবুর সামনে নিয়ে গেলেন। তাঁবুর পর্দা সরিয়ে দেখালেন তাঁবু বোঝাই সিগারেট। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এগুলো আমাদের দরকার। কারণ আমাদের অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা সিগারেট খায়।' এরপর বিদায় পর্ব। মেজর ভট্টাচার্য যেনৌকাগুলো বানিয়ে রেখেছিলেন সেগুলো নিলাম না। এখান-সেখান থেকে বারোটার মতো বড় নৌকা আমরা জোগাড় করেছিলাম। সেগুলোতে চড়ে ভারতীয় সুন্দরবন থেকে আমরা বাংলাদেশের সুন্দরবনের দিকে রওনা দিলাম।

কিন্তু একটি দিন অতিক্রান্ত হতে না হতেই, ভারতীয় সুন্দরবনের মধ্যে তখনো আমরা অবস্থান করছি এ অবস্থায় একটা বিরাট সামুদ্রিক ঝড় সৃষ্টি হলো। এগারো নাম্বার মহা বিপদসংকেত দেয়া হলো। আমরা বেশ বিপদের মধ্যেই পড়লাম। আমার নির্দেশে সমস্ত নৌকাগুলো ভারতীয় সুন্দরবনের ছোট ছোট খালের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে বড় বড় গাছের সঙ্গে কাছি, রশি ইত্যাদি দিয়ে বেঁধে রাখলাম। এভাবে থাকতে হলো চারদিন। চারদিনের মাথায় সামুদ্রিক ঝড় থামার পর আমরা আবার যাত্রা করলাম। কিন্তু আবারো সংকট। সঙ্গে করে আমরা যে খাবার এনেছিলাম তা প্রায় শেষ। এটা ঘটার কারণও আছে। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম মোটামুটি পাঁচশ'র মতো লোক আমরা নিয়ে আসব। কিন্তু দেখা গেল ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা কেউই ভারতের মাটিতে থাকতে চায় না। কাজেই আস্তে আস্তে সংখ্যাটা বাড়তে বাড়তে সাতশ'র ওপরে হয়ে গেল। কিন্তু পরে আর খাবার দাবার বাড়তি করে নেয়া হয়নি।

এছাড়া সামুদ্রিক ঝড়ের কারণে থেমে থাকতে হলো চারদিন। দু দিকের সমস্যায় খাদ্যাভাব দেখা দিল। শুধু চাল আছে কিছু, অন্য কোন তরিতরকারী নেই। আমরা ঝড় শেষের একদিন পরে রাতের বেলা বাংলাদেশ ও ভারতের সুন্দরবন এলাকায় যে সীমান্ত অঞ্চল সেটা অতিক্রম করলাম। সীমান্তটা হাড়িয়াভাঙা নদী বরাবর। হাড়িয়াভাঙার পুব পাড়ে রয়েছে

একটা দ্বীপ। দ্বীপটা বাংলাদেশেরই অংশ। এই দ্বীপটাতে আমরা রাতে আশ্রয় নিলাম। এই দ্বীপটার নাম হলো–আলগা পাকিস্তান। এই নামের একটা ইতিহাসও আছে। পাকিস্তান–ভারতের সীমানা নির্ধারণের সময় এই দ্বীপটি নিয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান ও ভারতের নৌবাহিনীর মধ্যে এই দ্বীপটার মালিকানা নিয়ে যুদ্ধ হয়। এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান এই দ্বীপটির মালিকানা পায়। সেইজন্য স্থানীয় জনগণের ভাষায় হয়ে যায় আলগা পাকিস্তান। এই আলগা পাকিস্তানে রাতের বেলায় আশ্রয় নিলাম আমরা। এই এলাকায় পাকিস্তানী গানবোটের বেশ আনাগোনা আছে। পাকিস্তানী বাহিনী মনে করতো সমুদ্র অঞ্চল, নিকট সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে শরণার্থী এবং মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে যাচ্ছে–আসছে। অবশ্য এই ধারণাটা ভাসা ভাসা। সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য হাতে না থাকায় তারা আমাদেরকে কোন বিপদে ফেলতে পারেনি। রাতটা কাটিয়ে সকালে সেই খ্যাতনামা মাগলার রইজুদ্দিন নাইয়ার সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলাম। ওকে বললাম, 'আমাদেরতো খাবার–দাবার–রসদের টানাটানি যাচ্ছে। এখন কি করা যায়?' ইতিমধ্যে খাবার পানির সংকটও দেখা দিয়েছে। পূর্ববর্তী চার পাঁচদিন বৃষ্টি যদিও হয়েছে, কিন্তু পানি ধরে রাখার মতো কোন পাত্র আমাদের কাছে ছিলনা। সুন্দরবনের একটা ম্যাপ আমার কাছে ছিল। বেশ ভাল ম্যাপই বলতে হবে, যেটা তৎকালীন বনবিভাগ ব্যবহার করতো।

রইজুদ্দিন নাইয়া আমাকে পরামর্শ দিলো, 'স্যার চলেন আমরা কয়লা বেহালায় যাই।' আমি বললাম, 'এই নামতো কখনো শুনিনি। কয়লা বেহালাটা কি?' রইজুদ্দিন বললো, 'স্যার, এইটা হলো দিয়া।' স্থানীয় ভাষায় দিয়া মানে দ্বীপ। রইজুদ্দিন বলে চললো, 'এইখানে গেলে স্যার বালু খুড়লে মিষ্টি পানি পাওয়া যায়।' আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, যদি দ্বীপটাতে যাওয়া যায় তাহলে ভালই হয়। ম্যাপে খুঁজে দেখলাম রইজুদ্দিন যেটাকে কয়লা বেহালা বলছে ম্যাপে সেটার নাম পুটনী আইল্যান্ড। একেবারে সমুদ্রের মুখে দ্বীপটার অবস্থান। উপায়ন্তর না পেয়ে রওনা দিলাম। সারাদিন নৌকা চললো। গোপন পথে কয়লা বেহালায় পৌছতে পৌছতে বিকেল হয়ে গেল। চারটার সময় পৌছলাম সেখানে। পৌছেই দেখলাম তীরের কাছে তিন–চারটা হরিণ দাঁড়িয়ে আছে। আমি কৌতুকবশতই একটা ঘটনা ঘটালাম সেখানে। ভারতীয় এস এল আর দিয়ে হরিণের ওপর গুলী করলাম। আমি দেখতে চাইলাম–এস এল আর অস্ত্র হিসেবে কতটা কার্যকর। পরীক্ষায় এস এল আর চমৎকার সাফল্য অর্জন করলো। এক গুলীতে মারা পড়লো দুটি হরিণ। এক লাইনে ছিল। গুলী একটাকে ভেদ করে দ্বিতীয়টাকে আঘাত হেনেছে। মুক্তিযোদ্ধারা মহাখুশী। তারা নৌকা থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ে হরিণ দুটো নিয়ে এলো। আমি কিন্তু সুন্দরবনে যতোদিন ছিলাম নিজেতো হরিণ মারিইনি, কাউকে মারতেও দেইনি। অফিসিয়াল অর্ডার ছিল কোন ক্যাম্প থেকেই হরিণ মারা যাবে না। কারণ আমার একটা অনুভূতি ছিল, এটা আমাদের জাতীয় সম্পদ। আজ মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনে আমাদেরই বনভূমি আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। যদি আমরা এই আশ্রয়দাতার অবমাননা করে হরিণ মারি তাহলে জাতীয় সম্পদের ক্ষতি হবে। একটা হরিণ জন্মানোর ক্ষমতাতো আমাদের নেই।

কিন্তু কয়লা বেহালায় পরিস্থিতিটা ছিল অন্যরকম। আমরা তখন খাদ্যাভাবে ভুগছি। সাতশ' লোক সঙ্গে। আরো তিনদিনের পথ বাকী। না খেয়ে এতোটা পথ পাড়ি দেয়া একেবারেই অসম্ভব। দায়েঠেকা অবস্থায় হরিণ মারাটা অন্যায় হচ্ছে না– এই যুক্তি দেখিয়ে মনটাকে প্রবোধ দিলাম। প্রথমে দুটো মারার পরে আরো তিনটা হরিণ মারলাম। এদিকে রইজুদ্দিন নাইয়ার কথা মোতাবেক বালু খুঁড়ে মিষ্টি পানি পাওয়া গেল। মিষ্টি পানি দিয়ে হরিণ রান্না

করা হলো। মহাধুমধাম। আনন্দ। ভরপেট খেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা উল্লসিত। জ্যোৎস্না রাত। জয়বাংলা শ্লোগানে কম্পিত হলো ছোট্ট দিয়া কয়লা বেহালা।
রাতের বেলাই রওনা দিলাম আমরা। তিনদিন পরে আমাদের ক্যাম্পে এসে হাজির হলাম। শরণখোলা মোরেলগঞ্জের ভোলা নদীর এক পাড়ে জনবসতি অন্য পাড়ে সুন্দরবন। সেখানেই আমাদের ক্যাম্প। ক্যাম্পে ফিরে আবার সিনিয়র কমান্ডারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করে মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, হ্যাঁ, এবার যুদ্ধ শুরু করতে হয়। অর্থাৎ সঠিক অর্থে, নিয়মিতভাবে গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করার সময় এসে গেছে-এটা আমরা বুঝতে পারলাম।
বাহিনীর মধ্যে কয়েকটা ভাগ করলাম। যারা নিয়মিত বাহিনীর সদস্য ছিল তাদের একটা বাহিনী, যাদেরকে শত্রু এলাকার গভীরে পাঠানো হবে তাদের একটা বাহিনী, যাদেরকে সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় সম্ভাব্য গেরিলা আক্রমণে পাঠানো হবে তাদের একটা বাহিনী, ছাত্রদের জন্য একটা বাহিনী-এরকম কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নিলাম, যাতে যখন যাদেরকে প্রয়োজন হবে তখন তাড়াতাড়ি সেই নির্দিষ্ট গ্রুপটাকে ব্যবহার করা যায়। তখন যাতে নতুন করে বাছতে না হয় সময় ব্যয় করে এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য।

আমার বাহিনীর একজন কমান্ডার, মোরেলগঞ্জের স. ম. কবির আহমেদ মধুর ইচ্ছা হলো-মোরেলগঞ্জে একটা আক্রমণ পরিচালনা করার। কারণ এর আগে তিনি একবার মোরেলগঞ্জ আক্রমণ করেছেন এবং সফল হতে পারেননি। সেবার দু'তিনজন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছে এবং এই ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েই তাদেরকে পিছু হঠতে হয়েছে। কাজেই কবির আহমেদ মধুর মনে একটা প্রচন্ড ক্ষোভ ছিল মোরেলগঞ্জের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির প্রতি। তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার সুযোগ খুঁজছেন তিনি। তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে আমরা মোরেলগঞ্জ আক্রমণের প্রস্তুতি নিলাম।
একদিন, বিকেলবেলা ভোলা নদীর পাড়ে চারটি কোম্পানীর মিলিত বাহিনী দাঁড়িয়ে থাকলো। কবির আহমেদ মধু সে বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে আমার সামনে এসে অ্যাটেনশন হয়ে স্যালুট করে আমাকে রিপোর্ট দিল, বাহিনী প্রস্তুত। প্রথম পূর্ণাঙ্গ, সশস্ত্র রূপে আমরা মুক্তিযুদ্ধের মাঠে, বাংলার মাটিতে পা ফেলার জন্য প্রস্তুত। বিকেল বেলা আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। মোরেলগঞ্জ আক্রমণ বাহিনীকে আমি দু'ভাগে বিভক্ত করলাম। একভাগ কবির আহমেদ মধুর নেতৃত্বে থানা এবং মূল বাজারে রাজাকারদের যে ঘাঁটি সেটার ওপর আক্রমণ করবে এবং দখল করবে। দ্বিতীয় গ্রুপের নেতৃত্ব হাবিলদার আব্দুল হাইকে দেয়া হলো। আব্দুল হাই মোরেলগঞ্জ হাইস্কুল ও কুঠিবাড়ির রাজাকার আলবদরদের অবস্থান দখল করবে। আমার দায়িত্ব মোরেলগঞ্জ কলেজে, দীঘির পাড়ে কমান্ড পোস্টের নেতৃত্ব দান।

আমার সরাসরি যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে কমান্ডাররা রাজী নয়। তারা বলছেন যে, এটা একটা থানার যুদ্ধ। এটা আমাদের করতে দিন। আপনি আমাদের সুপ্রীম কমান্ডার হয়ে থানার যুদ্ধও করবেন সেটাতো হয় না। বড় যুদ্ধ হলে আপনি করবেন। আমি ভাবলাম, ঠিক আছে কমান্ড পোস্টে বসে থাকি। দেখি খেলাটা কেমন জমে। পরদিন ভোরে ফজরের নামাজ শেষ হয়েছে এমন একটা সময়ে আমাদের বাহিনীর দুই গ্রুপ শত্রু ঘাঁটির সামনে অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। কবির আহমেদ মধুর বাহিনী প্রথম আক্রমণ শুরু করল। কিন্তু হাইয়ের নেতৃত্বে বাহিনী নিশ্চুপ। ওদিকে কোন গোলাগুলি হচ্ছে না। কিছুক্ষণ পরে আমি আমাদের সেকেন্ড ইন কমান্ড সামসুল আলম তালুকদারকে বললাম, 'আপনি কমান্ড পোস্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আমি যাচ্ছি। হাইয়ের বাহিনী কেন আক্রমণ শুরু করেনি দেখে আসি।'

আমি গিয়ে দেখলাম পরিস্থিতি ভজঘট। কবির আহমেদ মধুর নেতৃত্বে যখন একদিকে আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে তখন এদিককার রাজাকাররা সতর্ক অবস্থান নিয়ে নিয়েছে এবং তারা ব্লাংক ফায়ার করছে। এই ব্লাংক ফায়ারের সামনে হাবিলদার হাইয়ের বাহিনী খানিকটা ভড়কে গেছে। তারা আর এগোচ্ছে না। তারা মাটিতে পজিশন নিয়ে বসা। আমি গিয়েতো হাইকে প্রচন্ড গালাগালি শুরু করলাম। যুদ্ধের মাঠে সম্ভবত ভালো ভাষায় কোন কথাবার্তা হয়না। বলা যায়, এটাই যুদ্ধের নিয়ম। নিয়মিত বাহিনী সম্ভবত যুদ্ধের মাঠে এই নিয়ম ভাংতে পারে না। হাইকে তীব্র ভাষায় বকাবকি করার পরে আমি নিজেই বাহিনীর একটা অংশ নিয়ে মোরেলগঞ্জ স্কুলে অবস্থানরত রাজাকার বাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু করলাম। দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। দিনের আলোতে স্পষ্টতই বুঝলাম আমরা খুব খারাপ পজিশনে আছি। এ অঞ্চলটা আমার চেনার কথা নয়। যারা চেনে তাদেরকেই কমান্ড দিয়েছি। অথচ তারাই ব্লাংক ফায়ারের মুখে আক্রমণ বন্ধ করে বসে আছে। মোরেলগঞ্জ হাই স্কুলের সামনে দুটি কবর আছে। এর মধ্যে একটা মোরেল সাহেবের, যার নামে এই নাম–মোরেলগঞ্জ। এই মোরেল সাহেবের কবরের পাশে আমাদের অবস্থান এবং এটা শত্রুপক্ষের একেবারে সরাসরি গুলীর আওতার মধ্যে। রাজাকাররা স্কুলের দুটি জানালা দিয়ে গুলী করছে। আমি মুকুল নামের একজন স্কুল মাষ্টার, সাহসী মুক্তিযোদ্ধাও বটে, তাকে বললাম, 'আমি প্রথম জানালায় এলএমজির কভারিং ফায়ার দিচ্ছি। তুমি দ্বিতীয় জানালায় গিয়ে গ্রেনেড ছুঁড়ে দাও ভেতরে।' মুকুল গেল। গ্রেনেডও ছুঁড়ল। কিন্তু জানালার শিকে লেগে গ্রেনেড ফিরে এসে মুকুলেরই পায়ের কাছে বিস্ফোরিত হলো। মুকুল সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী। ও তখন চিৎকার করে বলছে, 'স্যার, আমার পা ভেঙ্গে গেছে। আমাকে বাঁচান।' খুব কষ্টে মুকুলকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হলো। সরাসরি ক্রস ফায়ারিংয়ের মধ্যে কেউ অগ্রসর হতে রাজী নয়। একজনকে ডাকলাম। মুক্তিযোদ্ধা। ক্যাম্পে খুব সাহসী হিসেবে পরিচিত। বিরাট আকারের গোঁফ। কথায়–বার্তায় সাংঘাতিক লড়াকু। ওকে ডাকলাম, 'আমি কভারিং ফায়ার দিচ্ছি। তুই ক্রলিং করে করে গিয়ে মুকুলকে টেনে নিয়ে আয়।' ও বললো, 'স্যার আমিতো সিভিলিয়ান। সেনাবাহিনীর কাউকে পাঠান।' যাকে বলে কম্পমান অবস্থা আমার প্রস্তাব শুনে। এমন উত্তর শুনে একটা লাথি মারা ছাড়া উপায় নেই। সেটা যথাযথভাবে পালন করলাম। এখন চিন্তা, কাকে পাঠানো যায় এই দুরূহ অবস্থান থেকে ছেলেটাকে উদ্ধার করে আনার জন্য। মুকুল এবং আমরা সবাই রাজাকারদের গুলীর মুখে এবং আমার কভারিং ফায়ারের নীচ দিয়ে ক্রলিং করে যেতে হবে মুকুলের কাছে। একজন হিন্দু মুক্তিযোদ্ধা আছে, আধপাগল। তার পাগল হওয়ার পেছনে কাহিনী হলো, পাঞ্জাবী ও রাজাকাররা যখন ওদের বাড়িতে আক্রমণ করে, তখন সে বাড়ির পুকুরে ডুবে কচুরিপানার মধ্যে নাক উচিয়ে লুকিয়েছিল। পাঞ্জাবীরা ওর বোন এবং মাকে পুকুর পাড়ে এনে ধর্ষণ করে মেরে ফেলে। এই

দৃশ্য দেখতে হয় তাকে এবং তখন থেকেই তার পাগলামী শুরু। প্রাণের মায়া বলতে কিছু নেই। ভয়ানক দুঃসাহসী এবং মরিয়া। আমি ভাবলাম, এই মুহূর্তে ওকেই প্রয়োজন। ও জীবনের তোয়াক্কা করবে না। ওকে বললাম, 'আমি উপর থেকে কভারিং ফায়ার করবো। তুমি নীচ দিয়ে ক্রলিং করে যাও। গিয়ে মুকুলকে উদ্ধার করে আনো।' সে তৎক্ষণাৎ রাজী এবং তৎপর। সাফল্যজনকভাবে উদ্ধার করা হলো মুকুলকে। আমরা আমাদের অবস্থান সুসংহত করলাম। এখন রাজাকার বাহিনী বেশ পর্যুদস্ত।

এদিকে কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী কুঠিবাড়ী আক্রমণ করা হয়নি। হাবিলদার হাইয়ের নেতৃত্বে যে বাহিনী তারা আক্রমণই করতে পারেনি। কুঠিবাড়ী এই অঞ্চল থেকে খুবই কাছে, চার–পাঁচশ গজ দূরে। কুঠিবাড়ীর তিনতলা দালানের ওপর থেকে ওরা আমাদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করছে। কিন্তু আমি বুঝলাম পাঁচশ গজ দূর থেকে গুলী করে আমাদের কোন ক্ষতি ওরা করতে পারবে না। লাগাতে পারবে না। অবস্থান সুসংহত বুঝতে পেরে আমি অন্যান্য অবস্থান পর্যবেক্ষণ করার জন্য ঐ এলাকা থেকে সরে এলাম। এদিকে দুজন মুক্তিযোদ্ধা আহত মুকুলকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে। দু' একদিন আগে চষা, হাঁটু পানি জমে থাকা মাঠের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি। আমার তৃষ্ণা পেয়েছে প্রচন্ড। থাকতে না পেরে আমি সেই মাঠের ঘোলা কাদাপানি আজলা ভরে উঠিয়ে উঠিয়ে খাচ্ছি। মুকুল চিৎকার করছে, 'স্যার, খুব কষ্ট হচ্ছে। পায়ের যন্ত্রণা স্যার। আমি মারা যাচ্ছি।' আমি ওকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করলাম। বললাম, 'তুমি মরে যাচ্ছ শুধু? আমরাওতো মরে যাচ্ছি। দেশকে মুক্ত করার জন্য আমরা সবাইতো প্রাণ বাজি রেখেছি। তুমি যেই পথে আমরাও তো সেই একই পথে। তোমার হতাশ হওয়ার কিছু নেই।' এই বলে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে আমি অন্যান্য পজিশনগুলোতে ঘুরতে শুরু করলাম। ধীরে ধীরে কাজ এগোচ্ছে। আমি চেষ্টা করছি সবগুলো পজিশনকেই আক্রমণাত্মক করে তুলতে।

ঘন্টাখানেকের মাথায় পাঞ্জাবীদের দুটো গানবোটকে মোরেলগঞ্জের দিকে আসতে দেখা গেল। গানবোটের আগমনে সব মুক্তিযোদ্ধাই বিচলিত। কিছুটা ভীতও হয়ে পড়ল। কারণ অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে তখন এমন–নদীতে পাঞ্জাবীদের গানবোট আর পেছনে রাজাকার বাহিনী, মধ্যখানে আমরা। আমি দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে সব পজিশনে গেলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের বললাম, 'গানবোট আমি ফেস করবো। গানবোটের সঙ্গে যুদ্ধ হবে আমার। পাঞ্জাবীরা যাতে নামতে না পারে সে ব্যবস্থা করবো আমি। তোমরা গানবোট নিয়ে চিন্তা না করে তোমাদের আক্রমণ চালিয়ে যাও।' এই বলে মাত্র সাত–আটজন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে দৌড়িয়ে গিয়ে নদীর পাড়ে কচুবনের মধ্যে চুপ করে ওঁত পেতে বসলাম। গানবোট এগিয়ে আসছে। আমি সঙ্গীদের বললাম, 'কেউ গুলী করবে না।' গানবোটের পাঞ্জাবীরা বুঝতে পারেনি মুক্তিবাহিনীর শক্তিশালী এবং সশস্ত্র একটা গ্রুপ এখানে আক্রমণ পরিচালনা করছে। তারা খুব নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে গানবোট নিয়ে একেবারে আমাদের সামনে চলে এলো। অবস্থাটা এমন যে আমাদের অবস্থানের দেড়শো গজের মধ্যে ল্যান্ডিং করবে ওরা। আমরা ওঁত পেতে বসা। নিশ্চুপ। পাঞ্জাবীরা বুঝতে পারছে, যুদ্ধটা হচ্ছে কয়েকশ গজ পেছনে। নদীর পাড়ে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে ওদের কোন ধারণা নেই। ওরা যখন একদম কাছে এসে গানবোট থামানোর উদ্যোগ নিচ্ছে, তখন আমরা দুটো এলএমজি ও অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে গুলী শুরু করলাম। গুলীর ফলাফল কি হয়েছে বলতে পারবো না, কিন্তু গুলী শুরু হওয়া মাত্র গানবোট দুটো ব্যাক গিয়ার দিয়ে ফিরে সোজা পালিয়ে গেল। ওদের এই আচরণ দেখেই ধারণা করেছি যে ওরা এরকম অভ্যর্থনার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলনা। এভাবে আরো একবার গানবোটের উপর হামলা হলো। তখন পাঞ্জাবীরা পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে গেলো।

এদিকে আমাদের লড়াই চললো বারোটা কি সাড়ে বারোটা পর্যন্ত। সকাল এগারোটা পর্যন্ত রাজাকারদের আমরা কিছুতেই বাগে আনতে পারিনি। সব মুক্তিযোদ্ধা ক্ষুধার্ত। সারারাত হেঁটেছে। সারারাতে আমরা প্রায় চৌদ্দ মাইলের মতো হেঁটেছি। হাঁটতে হয়েছে প্রচন্ড বৃষ্টি এবং হাঁটু সমান কাদার মধ্যে দিয়ে। ক্লান্তিতে সবার জিভ বেরিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। এখন কি করা? যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এখন একটা ফলাফল নিয়েতো ফিরে যেতে হবে। সোজা কথা আমাদের পাওনা নিয়ে ফিরতে হবে।

মোরেলগঞ্জ অঞ্চলের রাজাকার–আলবদর বাহিনী বেশ শক্তিশালী। স্কুলের দালানে তাদের অবস্থান। জানালায় জানালায় অবস্থান নিয়ে তারা বসে আছে। দরজাতেও কড়া পাহারা। এদের গুলী বর্ষণের মুখে কিছুতেই আমরা অগ্রসর হতে পারছি না। কাজের মধ্যে হচ্ছে কেবল গুলী বিনিময়। এগারোটার দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের একটু বিশ্রাম দিলাম। আমি কমান্ড পোস্টে চলে গেলাম। কবির আহমেদ মধুর নেতৃত্বে যুদ্ধ চলছে ঠিকই, কিন্তু তারাও অগ্রসর হতে পারছে না। বিশ্রাম নিতে গিয়ে হঠাৎ প্রকৃতির ডাক। কলেজের ল্যাট্রিনে গেলাম। আমাদের দেশে কৌতুক ছলেই লোকেরা একটা কথা বলে, ল্যাট্রিনে নাকি গভীর এবং সূক্ষ্ম চিন্তা মাথায় আসে। কতটুকু সত্যি এটা জানিনা। তবে ল্যাট্রিনের কাজ সারতে সারতে হঠাৎ করে আমি যুদ্ধের উত্তরটা পেয়ে গেলাম। খুব সূক্ষ্ম একটা কৌশল প্রয়োগ করলে যুদ্ধটা আমাদের পক্ষে চলে আসবে বলে মনে হলো। আমি তাড়াতাড়ি কাজ সেরে কমান্ড পোস্টে চলে এলাম। এসে সামসুল আলম তালুকদারকে বললাম, 'আমাদের কাছে রশিটশি আছে নাকি? রাজাকারদের পরাস্ত করার পর ওদেরকে তো বাধতে হবে। রশিতো দরকার।' সামসুল আলম তালুকদার একটু অবাক হলেন কথাশুনে। বললেন, 'কেন স্যার?'

'ওদেরকে তো আমরা আধাঘন্টার মধ্যে বেধে ফেলবো। আপনি রশি জোগাড় করেন।' এই নির্দেশের পর কলেজের আশেপাশের এলাকা থেকে গরুর রশি জোগাড় করা হলো অনেকগুলো। আমি একটা পজিশনে গিয়ে বসলাম। তারপর তিনচারজন মুক্তিযোদ্ধাকে ডাকলাম। এলএমজি আমার কাঁধে। ওদেরকে আমি কৌশলটা শিখিয়ে দিলাম। সেটা হচ্ছে, আমি গুলী করে জানালার বাংকারগুলো নিষ্ক্রিয় করে ফেলবো। ওরা একেবারে ত্বরিত গতিতে ছুটে চলে যাবে বিল্ডিংয়ের পাশে। ছুটে গিয়ে সানশেডের ঝুল ধরে জাম্প করে সানশেডের ওপরে উঠবে। উঠে ভেন্টিলেটার দিয়ে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারবে ভেতরে। ওরা পাঁচমিনিটের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে।

বাস্তবে ঘটলোও তাই। পাঁচ ঘন্টা যুদ্ধ করেও যা হয়নি সেটা আধাঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল। আমি বসে একেবারে হেভী কভারিং দিচ্ছি। জানালাগুলো একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম। আমার কভারিংয়ের নীচ দিয়ে ছুটে চলে গেল আসাদ, হেলাল, সুশান্তসহ চার–পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা। ওরা পরিকল্পনামতো সানশেডের ওপরে উঠে ভেন্টিলেটার দিয়ে একটার পর একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে দিতে লাগল ভেতরে। যখন গ্রেনেড বিস্ফোরিত হতে শুরু করল, বিল্ডিংয়ের মধ্যে তখন সমস্ত রাজাকার বাহিনী তটস্থ হয়ে গেল। আহত হলো প্রচুর। এই বিল্ডিংয়ে প্রায় সোয়াশ'র মতো রাজাকার ছিলো। এক পর্যায়ে আমি নিজে গিয়ে সানশেডের ওপরে উঠে গেলাম এবং কয়েকটা গ্রেনেড ছুঁড়ে মারলাম। রাজাকাররা এই রকম আক্রমণ আর দেখেনি। ভেতরে এক রাজাকার আরেক রাজাকারকে বলছে 'বিয়াই, বিয়াই, এ দেহি লোয়ার বোমা। আইজকা আর সারন নাই। আজকে মইরা যামু। ক্যান্ রাজাকার বানাইছিলা?' এইভাবে বিলাপ করছে তারা। এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা বিল্ডিংয়ে চড়াও হয়ে গেল। ব্রাশ করে, গ্রেনেড ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং রাজাকারদের পরাস্ত করে ফেললো।

স্কুল দখল করার সময়ে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল যেটা পরে জেনেছি। স্কুলের হেডমাস্টার খুব পরহেজগার এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক। তাকে রাজাকাররা জোর করে, বন্দী করে এনে স্কুলে রেখেছে। আমরা যখন গ্রেনেড চার্জ করে করে রাজাকারদের নাস্তানাবুদ করছি, তখন ঐ হেডমাস্টার সাহেবের রুমে তিনটা গ্রেনেড পড়েছে। কিন্তু একটাও বিস্ফোরিত হয়নি। অথচ অন্য সবগুলো গ্রেনেডই বিস্ফোরিত হয়েছে এবং ক্ষতি করেছে যথেষ্ট। ঘটনাটি আমাকে একদিকে চমৎকৃত করলো, পাশাপাশি স্বস্তিও দিলো। কারণ আমাদেরই হাতে যদি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক ক্ষতিগ্রস্থ হতেন ঘটনাচক্রে তাহলে অন্তত অনুশোচনা তো করতেই হতো। সেই দায় থেকে রক্ষা পাওয়ায় স্বস্তি পেয়েছিলাম। আমরা হেডমাস্টার সাহেবকে সসম্মানে ছেড়ে দিলাম। অন্যান্য শিক্ষকদেরও ছেড়ে দিলাম। পরীক্ষা চলছিল তখন। আমরা ছাত্রদেরকেও ছেড়ে দিলাম।

স্কুল দখল করার পর আমরা এখানে সোয়াশ'র মতো রাইফেল পেলাম এবং রাজাকারও বন্দী হলো প্রায় সমান সংখ্যক। এদিকে দুপুরের মধ্যে সেই কুঠিবাড়ীরও পতন হলো। সেখানে ছিলো প্রায় একশ'র মতো রাজাকার। সব মিলিয়ে রাইফেল এবং রাজাকার পাওয়া গেল সোয়া দুইশ'র মতো। গরুর রশি আগেই জোগাড় করে রাখা হয়েছিল। রাজাকারদের ভালমতো বেঁধে স্কুল থেকে আধামাইল দূরে একটি সদ্যপরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। এদিকে কবির আহমেদ মধুর নেতৃত্বাধীন বাহিনী তাদের খারাপ অবস্থানের জন্য তেমন একটা সুবিধা করতে পারলো না। তাদের কাছে খবর পাঠালাম একেবারে চলে আসার জন্য। অবস্থানগত দিক থেকে বিবেচনা করে আমার মনে হয়েছিল, গুলীর অপচয় করাই সার হবে সেখানে। যাহোক কবির আহমেদের বাহিনীও চলে এলো। আমরা রাজাকারদের যেখানে জড়ো করেছিলাম। সেটা একটা খালি বাড়ি। চারপাশে গাছপালা, ঘর-দুয়ারের অবস্থা খারাপ। বন্দীদের জড়ো করে এক জায়গায় বসানো হলো। সমস্ত বাহিনী ফলইন করা হলো। সোয়া দুই'শ রাজাকারের মধ্যে আমরা তিরিশজন আলাদা করে নিলাম, যাদের বিরুদ্ধে হত্যা, নারীধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও ডাকাতির অভিযোগ রয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা ফলইন করে দাঁড়িয়ে আছে। যথারীতি কবির আহমেদ মধু এসে সমস্ত বাহিনীকে অ্যাটেনশান পজিশনে এনে আমার কাছে রিপোর্ট করলো। আমাদের পক্ষে কোন ক্ষয়ক্ষতি নেই। দুজন মুক্তিযোদ্ধা বুলেটবিদ্ধ। এছাড়া গ্রেনেড বিস্ফোরণে পা ভাঙ্গা মুকুলকে উদ্ধার করে আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সুন্দরবনে, নৌকায় করে।

অভিযুক্ত তিরিশজন রাজাকার-আলবদরকে আমি মৃত্যুদন্ড দিলাম এবং বললাম, 'মৃত্যুদন্ডে বুলেট খরচ করা যাবে না। বেয়নেট চার্জ করে মারতে হবে।' মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে চার-পাঁচজন ভলান্টিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল। তারা বললো, 'স্যার, আমরা করবো এটা।' এরপর আমি চূড়ান্ত নির্দেশ দিলাম মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার জন্য। মুক্তিযোদ্ধারা বেয়নেট চার্জ শুরু করলো। রাজাকারদের মধ্যে কারো ভুড়ি বেরিয়ে পড়লো, কারো গলা কেটে গেলো বেয়নেট চার্জে। কারো চোখ উঠে গেল। আমি একটা নারিকেল গাছের গোড়ায় বসে আছি। গ্রামবাসী এরই মধ্যে আমাদের কিছু খাবার দিয়ে গেছে-নারিকেল, চিড়া, মুড়ি, গুড় ইত্যাদি। গাছের গোড়ায় বসে পিঠ হেলান দিয়ে একটু রিল্যাক্স মুডে নারিকেল খাচ্ছি। আমার অবস্থান থেকে দশ পনেরো গজ দূরে বেয়নেট চার্জিং হচ্ছে। আমি খুব শান্ত এবং নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে সেই বেয়নেট চার্জ দেখছি। একটু পরেই দেখা গেল সামসুল আলম তালুকদার দূরে সরে গেছেন। অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারাও সরে গেছে অনেক দূরে। বেয়নেট চার্জ চললো ঐ তিরিশজনের মৃত্যু হওয়ার আগ পর্যন্ত। একই পর্ব শেষে বাকী রাজাকারদের আমরা ছেড়ে দিলাম। যাতে তারা নিজের জাতির বিরুদ্ধে এরকম অপরাধ আর না করে সেটা বুঝিয়ে বক্তৃতা রাখলাম ওদেরকে

ছাড়ার আগে। এরপর কবির আহমেদ মধুকে বললাম, মুক্তিযোদ্ধাদের ফলইন করানোর জন্য। সারিবদ্ধভাবে তারা দাঁড়াল। আমি তাদের সবার উদ্দেশ্যে বললাম, 'বেয়নেট চার্জের সময় আমি দেখেছি যে তোমরা প্রায় সবাই অনেক দূরে সরে গেছো। এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে, আমি বেয়নেট চার্জ করে এতো নৃশংসভাবে রাজাকারদের শাস্তি দিলাম কেন? এর একমাত্র উদ্দেশ্য তোমাদেরকে বোঝানো যে, মুক্তিযুদ্ধের লড়াইটা ছেলেখেলা নয়। এর মারাত্মক একটা রূপ আছে। ভয়াবহ কিছু দিক আছে। চূড়ান্ত একটা নৃশংসতার মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হচ্ছে। এবং শত্রুদের নৃশংস আচরণকে ঠিক সেভাবেই, সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। এটা তোমাদের বোঝানোর জন্য, তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং তোমাদেরকে সাহসী করার জন্য এইভাবে আমি রাজকারদের শাস্তিটা দিলাম। ওদেরকে আমি গুলী করেও মারতে পারতাম। কিন্তু শত্রুর যে নৃশংস আচরণ তার বিরুদ্ধে আমাকেও নৃশংস আচরণ করতে হবে। মায়া–মমতা দেখিয়ে মানবতার অবস্থান নেয়া এখানে চলবে না। এই নরপশুদের সঙ্গে ব্যবহারটা পশুর মতোই করতে হবে।'

বক্তৃতা শেষ করার পর সমস্ত বাহিনীকে সুন্দরবন ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলাম। নৌকায় করে যাত্রা শুরু হলো সুন্দরবন অভিমুখে। আমি খুবই ক্লান্ত। অন্যান্যদেরও একই অবস্থা। আমাদের নৌকা যাচ্ছে একটা খালের মধ্যে দিয়ে। খালের দুপাশে গ্রামের হাজার হাজার মানুষ–নারী, পুরুষ, আবাল–বৃদ্ধ–বণিতারা দাঁড়িয়ে আছে। উৎসাহী কেউ কেউ খালের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে নৌকা টেনে ধরছে। 'আমরা আপনাদের জন্য এই মুড়ি–চিড়া নিয়ে এসেছি। এগুলো খেয়ে যেতে হবে।' আমরা বলছি 'আমরাতো খেয়েছি। আমাদেরকে মুড়ি–চিড়া দিয়েছে আগে' তবুও তারা নাছোড় বান্দা। 'না আমাদের এগুলো আপনাদেরকে নিয়ে যেতে হবে।' এভাবে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্যের প্রস্তাব আমাদের উদ্বেলিত করে তুললো। তারা জানে, মুক্তিযোদ্ধারা সারাদিন না খেয়ে আছে। যুদ্ধ করেছে। এখন না খেয়েই ফিরে যাচ্ছে। এটা তারা সহ্য করতে পারেনি। তাই যার ঘরে যা কিছু ছিল তা দিয়েই আমাদের আপ্যায়ন করার ব্যাকুল প্রয়াস। গণ মানুষের এই অকৃত্রিম আন্তরিকতাই মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস আমাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, উৎসাহিত করেছে।

সুন্দরবনে ফিরে আসার পর আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যাপারটা জরুরী হয়ে দাঁড়াল। আমরা আহত মুকুল এবং সোহরাবকে পাঠালাম মুজিবনগরের উদ্দেশ্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তারা যাওয়ার পথে ত্রিকোন আইল্যান্ডের কাছে পাকিস্তানী গানবোটের সামনে পড়ে গেল। নৌকায় যারা সুস্থ ছিল অর্থাৎ মাঝি–মাল্লাসহ অন্যান্যরা কোনরকমে সাঁতরে নদী পার হয়ে প্রাণে রক্ষা পেল। কিন্তু আহত মুকুল এবং সোহরাবের কোন উপায় ছিল না। মুকুলেরতো পা ভাঙ্গা আর সোহরাব জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য অবস্থায়। পাঞ্জাবীরা দু'জনকেই নৌকার মধ্যে গুলী করে মেরে ফেলে।

মোরেলগঞ্জ থানা অপারেশনে আমাদের সাফল্য ছিল, আমার মতে, শতকরা আশিভাগ। কারণ রাজকারদের দুটো আস্তানা আমরা দখল করতে পারিনি। কবির আহমেদ মধু ব্যর্থ হয়েছেন এবং মোরেলগঞ্জ থানায় রাজাকারদের একটা অবস্থান ছিল–সেটাও আমরা দখল করতে পারিনি। যাহোক, এরপরে আমরা একটি শক্তিশালী গেরিলা বাহিনী পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করলাম। মোরেলগঞ্জ অপারেশনের পর আমরা ভাণ্ডারিয়া ও কাউখালি থানা দখল করলাম। এই থানা দুটো বরিশাল ও পিরোজপুরে অবস্থিত শত্রুর ঘাঁটি থেকে খুবই কাছে। পাঁচ কিংবা সাত মাইলের দূরত্ব।

ভাণ্ডারিয়া থানা আক্রমণের মূল কৃতিত্ব সুবেদার আব্দুল লতিফের। কাউখালি থানা দখলের নেতৃত্বে ছিলেন হাবিলদার হাবিব। এরা দুটো কোম্পানী নিয়ে দুটো থানা আক্রমণ করলো।

ভান্ডারিয়া থানায় যুদ্ধ চলেছে মাত্র সাত–আট মিনিট। এরই মধ্যে সমস্ত রাজাকাররা আত্মসমর্পণ করে ফেললো। পিরোজপুর থেকে ভান্ডারিয়া থানার দূরত্ব আট মাইলের মতো। ভান্ডারিয়া থানা দখলের পর আমরা পুলিশ–রাজাকার–আলবদরদের কাছ থেকে প্রায় তিনশ'র মতো অস্ত্র পেলাম। কাউখালি থানায় রাইফেল পেলাম আড়াই'শ। কাউখালিতে প্রায় দেড়ঘন্টা যুদ্ধ চলেছে। এরপর শত্রুপক্ষ আত্মসমর্পণ করে। ভান্ডারিয়া এবং কাউখালি থানা দখলের মাধ্যমে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের গড়ে উঠা শক্তি সম্পর্কে জনগণকে একটা ধারণা দিতে সক্ষম হলাম। কিন্তু থানা দুটো বিজয়ের পর মুক্তিযোদ্ধারা যখন ক্যাম্পে ফিরে এলো তখন পাঞ্জাবী এবং জামাতে ইসলামীর রাজাকার–আলবদর বাহিনী ভান্ডারিয়া বন্দর এবং কাউখালি বন্দর পুড়িয়ে দিলো। রণনৈতিক চিন্তা করতে গিয়ে আমি বিবেচনা করে দেখলাম, গেরিলা যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী হিট এন্ড রান পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে জনগণকে যে ক্ষতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে সেটা মুক্তিবাহিনীর জন্য খুব একটা মঙ্গলজনক নয়। এভাবে এগোলে জনগণের সমর্থনও আমরা হারাতে পারি। এমনকি ভুক্তভোগী এলাকার জনগণের কাছ থেকে এধরণের খবর এলো যে, আমরা যদি দখল করে না থাকি তাহলে যেন আক্রমণ পরিচালনা না করি। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাকে রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্থায়িত্বকাল মাত্র নয়মাস হওয়ার কারণে যে রণনৈতিক অবস্থানটা আমি নিয়েছিলাম সেটা এক অর্থে ভুল এবং আমাদের সামগ্রিক শক্তির অযথা ব্যবহার। আমি হিট এন্ড রান পদ্ধতি পরিহার করে সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী দশ–বারো–পনেরো মাইল পর্যন্ত এলাকা সার্বক্ষণিক মুক্ত রেখে সুন্দরবন এবং এর আশেপাশে শত্রুকে ডেকে এনে তাদের ওপর হামলা চালানোর পদ্ধতি অবলম্বন করলাম। আমরা মনে করেছিলাম, যুদ্ধটা একটু দীর্ঘস্থায়ী হবে। সেকারণেই আমাদের শক্তি সংহত করা প্রয়োজন ছিল এবং গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত বাহিনীর মতো শক্তিশালী বাহিনী গঠন করা দরকার।

যতোটুকু সম্ভব কম শক্তি ব্যবহার করে শত্রুদের ঘায়েল করা প্রয়োজন বলে আমাদের মনে হয়েছিল। এরকম সিদ্ধান্ত আমি নিলাম এবং আমার সঙ্গে সিনিয়র কমান্ডাররাও একমত হলেন। সুন্দরবনের বাহিনীর নেতৃত্বে তিনটি থানা দখলের ঘটনা পাঞ্জাবীদের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তারা ভাবতে বাধ্য হলো যে, মুক্তিযোদ্ধারা ইতিমধ্যে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান বেশ সংহত। আগস্ট মাসে এসে সুন্দরবনে আমাদের বাহিনীর লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল পাঁচ হাজারের মতো। আমরা তৎকালীন বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলা, বরিশাল জেলা এবং খুলনা জেলার মাঝামাঝি সন্দরবনে অবস্থান করায় শত্রুর উপর হামলা চালানোর ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থানগত সুবিধা তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। ঢাকা থেকে খুলনা এবং ঢাকা থেকে মংলা যাওয়ার যে নৌপথ সেটাও তখন সুন্দরনের মধ্যেই ছিল। এ কারণেই শত্রুর নৌযান, সাধারণ পণ্যবাহী নৌযান যেগুলোতে পাঞ্জাবী সৈন্যদের পাহারা থাকতো সেগুলোর ওপরে আমরা প্রায় প্রত্যেক দিনই হামলা চালাতাম। বরিশাল, পটুয়াখালী, পিরোজপুর এবং বাগেরহাট–এই চার জায়গায় পাঞ্জাবীদের একটা করে বাহিনী মোতায়েন করা ছিল। ইপিকেপ অর্থাৎ পাঞ্জাবী মিলিশিয়াদের একটা ব্যাটালিয়ান এই চারটা কোম্পানীর সাথে ছিল।

পটুয়াখালীতে পাঞ্জাবী কোম্পানীর কমান্ডার ছিলেন মেজর নাদের পারভেজ, বরিশালের কমান্ডার ছিলেন কর্নেল আতিক। অন্য দুইজন কমান্ডারের নাম এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারছি না। এই চারটি জেলায় চার কোম্পানী পাঞ্জাবী সৈন্যের সঙ্গে মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীর দেয়া রাজাকার–আলবদর–আলশামস্ ছিল প্রায় সাত হাজার। এই সম্মিলিত বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা আমরা করছি। প্রতিপক্ষের শক্তি এবং গতিবিধির খবরাখবর

জানার জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করেছিলাম। খুব মুসুল্লী হিসেবে পরিচিত এমন ধরণের কিছু লোককে গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ করে রাজাকার-আলবদর-আলশামস্ এবং পাঞ্জাবীদের গতিবিধি, ভবিষ্যত পরিকল্পনার কিছুটা আঁচ পেতে চেষ্টা করতাম। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলতাও পেয়েছিলাম।
আমাদের পিরোজপুরে রাজাকারদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্দান্ত ছিল পুলহাটের আশরাফ চেয়ারম্যান, পিরোজপুরের সুলতান মাহমুদ, মানিক খোন্দকার, বাগেরহাটের রাজাকারদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল রজব আলী, অন্যান্য এলাকাতেও এরকম নেতৃত্বে একেকজন ছিল। আমরা রণনৈতিকভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে মনোযোগ দিলাম সাংগঠনিক কাজে। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের জনমত গঠন, গেরিলা বাহিনী সংগঠনের জন্য জোর প্রস্তুতির কাজ শুরু হলো।

ভারত থেকে ফিরে আসার সময় আমাকে ৩৪ জন ন্যাভাল কমান্ডো দেয়া হয়েছিল। আরো ছিল দুইশ লিমপেট মাইন। ভারত থেকে সুন্দরবনের ঘাটিতে ফিরে আসার সময় আমাদেরকে দুটো আধুনিক গান লিখে দেয়া হয়েছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এদুটো সঙ্গীতের যে কোন একটা বাজানো হবে। যদি প্রথম গান বাজানো হয় তাহলে ৭২ ঘন্টার মধ্যে মংলা পোর্ট এবং হিরণ পয়েন্টে হামলা চালাতে হবে। আর যদি দ্বিতীয় গানটা বাজানো হয় তাহলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে মংলা পোর্ট ও হিরণ পয়েন্টে হামলা চালাতে হবে। মোরেলগঞ্জ, ভান্ডারিয়া, কাউখালি দখলের পর এবং সুন্দরবনকে ঘিরে প্রায় প্রতিদিনের ছোটখাট যুদ্ধ, অ্যামবুশ, রেইড এইগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা খুব দ্রুত ন্যাভাল কমান্ডোদের প্রস্তুত করে নিলাম। ছিপনৌকা করে তাদেরকে যেন খুব দ্রুত মংলা বন্দর এবং হিরণ পয়েন্ট পৌঁছে দেয়া যায় সেই ব্যবস্থা করে রাখা হলো। ন্যাভাল কমান্ডোরা যে কোন সময় রওনা দেয়ার জন্য সদা প্রস্তুত। যে কোন দিন রাত পৌনে আটটায় গানটি বাজানো হবে। আমি যে কাজেই থাকি না কেন, যতোই ব্যস্ত থাকিনা কেন নির্দিষ্ট সময়ে রেডিও শুনতেই হতো। পনরই আগস্ট রাতে প্রতীক্ষার অবসান হলো। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বাজানো হলো দ্বিতীয় গানটি। এর অর্থ হচ্ছে ২৪ ঘন্টার মধ্যে মংলা পোর্ট এবং হিরণ পয়েন্টে হামলা চালাতেহবে।
মংলা পোর্টে আমাদের টার্গেট হচ্ছে সমুদ্রগামী জাহাজগুলো, যেগুলো পাকিস্তানী সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র-রসদ যোগাচ্ছে। সে গুলোর মধ্যে কয়েকটা পাকিস্তানের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য তখনো ব্যবহৃত হচ্ছিল। এই সমুদ্রগামী জাহাজগুলোই আমাদের লক্ষ্যবস্তু এবং হিরণ পয়েন্টে আমাদের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে বহির্নোংগরে যে জাহাজগুলো অপেক্ষা করে আছে সেই জাহাজগুলো। পনেরই আগস্ট রাতে গান বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি চূড়ান্ত নির্দেশ প্রদান করলাম। চারটা ছিপডিঙ্গি ২৪ জন ন্যাভাল কমান্ডো নিয়ে খুব দ্রুতগতিতে মংলা পোর্টের দিকে এগিয়ে গেল। হিরণ পয়েন্টে দিকে আরেকটা বাহিনী দুটো নৌকায় করে এগিয়ে গেল। প্রথম বাহিনী মংলা পোর্টের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ভোর হওয়ার আগেই। অবশ্য তখনই আক্রমণে গেল না তারা। শত্রুর গতিবিধি ও অন্যান্য ব্যাপারে খবরাখবর নেয়ার কাজে ব্যয় করল সারাটা দিন। দিনশেষে, ঠিক সন্ধ্যায় সেই চব্বিশজন ন্যাভাল কমান্ডো বুকে লিমপেট মাইন বেধে সাঁতার কাটতে শুরু করল সমুদ্রগামী জাহাজগুলোর দিকে। তারপর আগে থেকে নির্দিষ্ট করা একটা সময়ে কমান্ডোরা জাহাজের গায়ে মাইন বসাতে শুরু করল। মোট জাহাজ ছিল তেরটা। কোনটায় তিনটা, কোনটায় চারটা, কোনটায় পাঁচটা করে মোট চুয়ান্ন কি পঞ্চান্নটা মাইন বসানো হলো। এই কমান্ডোদের সঙ্গে আমরা ছোট্ট একটা গ্রুপ পাঠিয়েছিলাম কভারিং ফায়ার দেয়ার জন্য। অবশ্য কভারিং ফায়ারের প্রয়োজন হয়নি। তারা

খুব নিরাপদেই মাইনগুলো লাগাতে পেরেছিল। কারণ তারা যখন মাইন লাগানোর জন্য রওনা দিয়েছে তখন ঝড়ো হাওয়া আর বৃষ্টি–বাদল শুরু হয়েছিল। এজন্যেই নিরাপদে কাজ সারা কমান্ডোদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। মাইন লাগানোর পর সবাই ফিরে এলো, একজন ছাড়া। সুনীল বড়ুয়া নামের একজন ন্যাভাল কমান্ডো ফিরে এলো না। সম্ভবত ছেলেটি ছিল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। সুনীলের ঔৎসুক্য ছিল বেশি। সে জাহাজের গায়ে লিমপেট মাইন লাগানোর পরে শিকল বেয়ে উঠে পড়ল ওপরে জাহাজে কি আছে দেখার জন্য এবং সে ধরা পড়ে গেল। অবশ্য ধরা পড়ার আগে বুদ্ধি করে সে হাত পায়ে বাধা ফিন গুলো এবং বেয়নেটটা ফেলে দিয়েছিল। রাজাকার ও পাকিস্তানীদের কাছে যখন ধরা পড়ল তখন সে নগ্ন, একেবারে জন্মদিনের পোশাকে। জাহাজের রাজাকার এবং পাঞ্জাবীরা ওকে যথারীতি খুব শাসানো শুরু করল–তুমি মুক্তি আছ? এখানে কি করছ, এটা সেটা। ও একটা অভিনয় করল, খুব সুন্দর। ও কান্নাকাটি শুরু করল, 'আমরাতো হিন্দু। আমরা ভারতে পালায়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের বাড়ি ঘর সব পুড়ায়ে দিছে। এই যে ঝড় বন্যা হলো একটু আগে এই ঝড়ে আমাদের নৌকা ডুবে গেছে। আমার বাপ–মা সব মরে গেছে।' এটা বলার পরে দয়াপরবশ হয়ে পাঞ্জাবীরা ওকে লাথি মেরে জাহাজ থেকে আবার ফেলে দিল পানিতে। ও সাঁতার কেটে এগিয়ে মংলা পোর্টের কাছেই একটা খালের মধ্যে একটা স্পীডবোট পেল। স্পীডবোটে উঠে দেখতে পেল স্পীডবোটের ড্রাইভার ঘুমাচ্ছে। নড়াচড়ায় ড্রাইভারের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভেঙ্গেই সামনে জন্মদিনের পোশাকে দাঁড়ানো সুনীলকে দেখে হতভম্ব। একেবারে চিৎকার দেয়ার মতো অবস্থা। সুনীল তাকে আশ্বস্ত করল। বলল, 'আমি মুক্তিযোদ্ধা। ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিনের ক্যাম্প থেকে এসেছি। আমরা এইসব জাহাজগুলোতে মাইন লাগিয়ে দিয়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই এগুলো বার্স্ট হয়ে যাবে। তুমি আমাকে বাঁচাও।' ঘটনাক্রমে স্পীডবোটের ড্রাইভারটিও ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের একজন এবং সেও সুযোগ খুঁজছিল কিভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেয়া যায়। সুনীলের ঘটনাটা তার জন্যে শাপে বর হল। সে সুনীলকে লুকিয়ে রেখে স্পীডবোটটা চালাতে শুরু করল। অবশ্য ইঞ্জিন চালু করল না শব্দ হওয়ার ভয়ে। বৈঠা বেয়ে অনেক দূরে নিয়ে এলো স্পীডবোটটা আস্তে আস্তে। তারপর সুন্দরবনের ভেতর গা ঢাকা দিল। মংলা থেকে সুন্দরবন খুব কাছেই। কোথাও দূরত্ব একমাইলেরও কম, আবার কোথাও তিন চার মাইল। যাহোক সুনীলকে নিয়ে সেই স্পীডবোট চালক সুন্দবনের একটি খালে আশ্রয় নিল।

রাত সাড়ে দশটার সময় মাইন বিস্ফোরণ শুরু হলো। একেবারে মেদিনী কাঁপানো অবস্থা। প্রায় পঞ্চান্নটা মাইন গগণবিদারী আওয়াজ তুলে পাকিস্তানী হায়েনাদের বুঝিয়ে দিল– এদেশের মাটি দখলে রাখা সহজ হবে না। আমাদের সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পগুলো আনন্দ– উল্লাসে ফেটে পড়লো। হিরণ পয়েন্টে যে কমান্ডোদের পাঠানো হয়েছিল তারা কিন্তু অভিযানে সফল হতে পারেনি। আগেই বলেছি ঠিক সেই সময়টাতে সমুদ্র ছিল উত্তাল। তাছাড়া হিরণ পয়েন্টের বহির্নোংগরটা ছিল সমুদ্রের বেশ খানিকটা ভিতরে। ন্যাভাল কমান্ডোরা ছিপডিঙ্গিতে করে বহির্নোংগরের দিকে এগোতে গিয়ে দেখতে পায় পয়েন্টের কাছাকাছি সমুদ্রের পানিতে প্রচুর পরিমাণ হাঙ্গরের আনাগোনা। এটা দেখে তারা আর পানিতে নামার ঝুঁকি নেয়নি। আমার মতে সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল। কারণ হাঙ্গরের মুখে পড়ে অকারণে জীবন দেয়ার কোন অর্থই হয়না।

যাহোক, অভিযান শেষে সবাই ফিরে এলো, সেই সুনীল ছাড়া। আমরা সবাই বেশ উদ্বিগ্ন, কি হলো সুনীলের! তৃতীয় দিনের মাথায় ঐ স্পীডবোট ড্রাইভার সুনীলকে নিয়ে ক্যাম্পে এসে হাজির। দেরী হওয়ার অবশ্য কারণ ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পটা যে সুন্দরবনের মধ্যে

এটা সবাই বুঝলেও ঠিক কোন জায়গায় সেটার অবস্থান তা জানা ছিল না। এবং যারা এই অবস্থানটা চিনতো তারা কাউকে বলতো না নিরাপত্তার কারণে। একারণেই যারা জানতে চাইতো তাদের পক্ষে জানা খুব সহজ ছিল না। সুনীল যদিও ক্যাম্পের ছেলে তবু সুন্দরবনের বিস্তৃত অঞ্চল সম্বন্ধে তার জানা ছিল কমই। এজন্যেই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে তারা এসে ক্যাম্পে হাজির হলো তিনদিনের মাথায়। তাকে পেয়ে আবার আনন্দ উল্লাস। প্রচন্ড সফল একটি আক্রমণের এখানেই সমাপ্তি। মোরেলগঞ্জ, ভান্ডারিয়া ও কাউখালি থানা দখল এবং মংলাপোর্টের ১৩টি জাহাজ ধ্বংস করে দেয়ার ঘটনাগুলো ঘটেছে দুই সপ্তাহ সময়কালের মধ্যে। এত অল্প সময়ের ভেতর পাকিস্তানীদের ওপর এতো বড় বড় আঘাত পুরো এলাকায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করল। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারল, মুক্তিযোদ্ধারাও সংগঠিত, আঘাত হানতে প্রস্তুত এবং সক্ষম, এদেশ একদিন স্বাধীন হবেই। একপর্যায়ে সাধারণ মানুষ যতোটা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল সেই হতাশা কাটিয়ে উঠে আবারো মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করল। বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকা থেকে আমাদের এই অপারেশনগুলো ফলাও করে প্রচার করা হলো। বিশেষ করে মংলা পোর্ট অপারেশনটি প্রচার মাধ্যমের কাছে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। এরপর আমরা গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ চালিয়ে গেলাম। পাশাপাশি চলতে লাগল ঘাঁটি এলাকাগুলো বিস্তৃত করার কাজ। কবির আহমেদ মধুর কমান্ডের অধীনে দেয়া হলো মোরেলগঞ্জ ও রামপাল থানা দুটো। বাকি সাবসেক্টর আমি নিজের দায়িত্বেই রাখলাম। আমরা আমাদের ক্যাম্প অঞ্চল বিস্তৃত করে মোরেলগঞ্জ থেকে শরণখোলা পর্যন্ত প্রসারিত করলাম।

শরণখোলা ফরেস্ট অফিস থেকে মাত্র তিন মাইল ভেতরে আমি সাবসেক্টর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেছিলাম। এই অঞ্চলটাতে আমাদের ক্যাম্প ছিল একশ'রও বেশি। অঞ্চলটা ছিল হেডকোয়ার্টারের চারপাশে সাত মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে অবস্থান করে বরিশাল, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বাগেরহাটের একাংশ, শরণখোলা থানা, কচুয়া থানার একাংশে আমরা ছোট খাট গেরিলা অপারেশন চালাতে শুরু করলাম। অল্প কয়েকদিনের ভেতরেই আমাদের সাব সেক্টর হেড কোয়ার্টার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান ঘাঁটি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

একপর্যায়ে আমরা মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটমেন্ট শুরু করলাম। যেহেতু ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জের একাংশ–এসব অঞ্চল থেকে ভারতীয় সীমান্ত অনেক দূরে এবং পথ দুর্গম। সেহেতু এসব অঞ্চলের ছাত্র, যুবক, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সক্রিয় শক্তি অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সরাসরি সুযোগটা পাচ্ছিল না। কিন্তু তারা যখন জানতে পারল যে আমরা এই অঞ্চল মুক্ত ঘোষণা করে, স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে এখানে অবস্থান করছি তখন সমস্ত এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করল এবং তারা দলে দলে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিল। একদিন আমাদের হতবাক করে দিয়ে প্রায় দশ হাজার ছাত্র, যুবক, কৃষকের ছেলে, শ্রমিক, নৌকার মাঝি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য ক্যাম্প এবং শরণখোলা এসে হাজির হলো। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের ঘটনা এটা। আমিতো রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। দশহাজার লোককে একদিনে রিক্রুট করে এদের খাওয়া–দাওয়ার রসদ, এদের থাকার ব্যবস্থা কিভাবে করবো? তখন নিরুপায় হয়ে আবার সেই পুরোনো কৌশল অবলম্বন করলাম। ঘোষণা দিলাম মুক্তিযোদ্ধা হতে চাইলে ছাতির মাপ চৌত্রিশ হতে হবে এবং উচ্চতা হতে হবে সাড়ে পাঁচ ফিট। যদিও আমি জানি মুক্তিযোদ্ধা হতে গেলে এসবের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই দশহাজার লোকের মধ্যে কাকে বাদ দেব। সবাই নাছোড়বান্দা। কান্নাকাটি শুরু করে এমন অবস্থা।

যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবে বলে বেরিয়েছে তাদের আর বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয়। তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি। তারা ছাত্র রাজনীতি করেছে, তারা যুব রাজনীতি করেছে, তারা ছয়দফা আন্দোলন থেকে শুরু করে, উনসত্তুরের গণ আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। তারা চিহ্নিত। কাজেই তারা এমনিতেই আর নিজের বাড়িতে থাকতে পারছে না। সবারই একই কথা। সকলেরই আকুতি যে আমাদের রাখতেই হবে। আমরা বাড়িতে ফিরে যেতে পারবো না। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে অবস্থান করে, যেখানে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার সদস্যের বাহিনী এরই মধ্যে আমাদের সঙ্গে অবস্থান করছে তাদের ভরণ-পোষণ, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি জোগাড় করাই দুরূহ হয়ে পড়েছে। সেখানে আরো দশ হাজার লোক রিক্রুট করে পরিস্থিতিটা কি করে সামাল দেবো এটা ভাবতে আমার হিমশিম খাওয়ার দশা। এজন্যেই ভিন্ন সেই কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মুক্তিযোদ্ধা একদিনে রিক্রুট করা হলো।

নতুনভাবে সাড়ে তিনহাজার লোক রিক্রুট করার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলাম ওদের জন্য ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলার। আমাদের মধ্যে বাঙালী সৈনিক যারা ছিলেন একটু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সুবেদার এবং হাবিলদার তাদেরকে দিয়ে ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তুলে সেখানে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলো। পরবর্তীতে আমরা ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে নিয়মিতভাবে এক হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে এককেবারে ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। সুন্দরবনের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ভোলা নদী। ভোলা নদীর উত্তর পাড়ে জনবসতি, দক্ষিণ পাড়ে গভীর বন। এই বনের তিন মাইল অভ্যন্তরে আমাদের অবস্থান। ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছিল এই তিন মাইল দূরত্বে। প্রতিদিন দেশী নৌকায় করে এই দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে হতো আমাদের। প্রতিদিন এইভাবে আসা-যাওয়া করা দুরূহ কাজ হয়ে দাঁড়াল। একদিন সামসুল আলম তালুকদার এবং শরণখোলার কিছু মুক্তিযোদ্ধা আমাকে এসে বললো, 'স্যার, আমরা একটা জিনিস করতে চাই।' আমি জানতে চাইলাম 'কি সেটা?' ওরা বললো, 'আমরা একটা খাল কাটতে চাই।' বললাম, 'খাল কাটা কিভাবে সম্ভব?' ওরা বললো, 'নদীপথে প্রতিদিন যে মাইল তিনেক রাস্তা আমাদের অতিক্রম করতে হয় সেটা কমে যাবে যদি আমরা সোজাসুজি একটা খাল কাটি। তখন দূরত্বটা হবে এক মাইলের চেয়ে একটু বেশি।' আমি জানতে চাইলাম, 'কি করে এটা সম্ভব?' ওরা বললো, 'এখানে একটা খাল আগেই ছিল। আস্তে আস্তে সেটা মজে গেছে। এখন আমরা যদি এটা পরিষ্কার করি এবং কিছু কিছু জায়গা কেটে দেই তাহলে জোয়ারের পানি এটাতে ঢুকবে। ধীরে ধীরে এমনিতেই এটার গভীরতা বাড়বে।' সবকিছু শোনার পরে ওদেরকে অনুমোদন দেয়া হলো। পুরো মুক্তিযুদ্ধটাইতো একটা সাহসের কাজ। সুতরাং সাহস করে ওদেরকে বললাম, 'চল খালই কাটি।' আমাদেরকে প্রায় আধ মাইলের মতো জায়গা পরিষ্কার করতে হলো, মাটি কাটতে হলো। খাল চালু হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে এটার নাম দেয়া হলো জয় বাংলার খাল। এই খালটা এখনো ঐ এলাকার লোকজনের কাছে জয় বাংলার খাল হিসেবে পরিচিত। জয় বাংলার খাল কাটার পরে জনবসতির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা সহজতর হলো। খুব অল্প সময়েই আমরা তখন আমাদের ফ্রন্টলাইনে পৌঁছে যেতে পারতাম।

বগি ফরেস্ট অফিস এবং শরণখোলা ফরেস্ট অফিস আমাদের কমান্ড পোস্ট হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল। এখনকার দুটো অবস্থানে প্রায় পনের'শ মুক্তিযোদ্ধা সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত ছিল। তাদের জন্য বাংকার গড়ে তোলা হয়েছিল প্রথমেই। সমগ্র সুন্দরবনের পাড় ঘিরে জনবসতিতে, হাটগুলোতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছে। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা, গ্রুপ, কোম্পানী, কোন কোন সময় একাধিক কোম্পানী মুক্ত এই এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং

উপযুক্ত টার্গেট বুঝে খতম করা হচ্ছে শত্রুপক্ষের লোকজন। দূরবর্তী কোন শত্রুর অবস্থানে গেরিলা কায়দায় আক্রমণ চালানো থেকে আমরা তখন নিবৃত্ত। তবে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের ঘটনা ঘটতো সুন্দরবনের ভিতরে। ঢাকা-মংলা, ঢাকা-খুলনা রুটে প্রায়শই বেধে যেতো তুমুল লড়াই। পাঞ্জাবীরা সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে বেশ কয়েকটা হামলা পরিচালনা করলো সুন্দরবনে। তাদের ধারণা ছিল, সুন্দরবনে একই সঙ্গে বিমান এবং নৌ হামলা চালানোর মাধ্যমে তারা সাফল্য অর্জন করতে পারবে। কিন্তু ওদের এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। প্রতিটি আক্রমণই পাঞ্জাবীদের সফলতার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছে। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমাদের শক্তি, আমাদের সুদৃঢ় অবস্থান পাঞ্জাবীদের জন্য একটা বিরাট মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঞ্জাবীরাতো বটেই, জামাত-মুসলিম লীগের রাজাকার-আলবদর-আলশামসরাও আমাদের অবস্থানের কারণে পুরো সময়টা অস্বস্তিতে কাটিয়েছে। তাদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। তাদের আরাম, আনন্দ, পশুত্বের আনন্দ পরিণত হয়েছে নিরাশার অন্ধকারে। কারণ হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান ছিল তাদের খুব কাছাকাছি। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পর্যুদস্ত করা তাদের জন্য খুব জরুরী হয়ে পড়েছিল এবং সে চেষ্টাও তারা করেছে প্রাণপণে। আগে থেকেই ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছিলাম আমি। তাই আমাদের ঘাঁটি এলাকার প্রতিটি প্রবেশমুখে একটি করে চৌকি বসিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। এই চৌকিগুলোর প্রত্যেকটাই ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। চৌকি আক্রমণ করলে অন্ততঃ কয়েকদিন লড়াই করার মতো যাবতীয় রসদ এবং লোকবলের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। পাকিস্তানীরা যদি আক্রমণ করে তাহলে তারা যাতে মনে করে এই চৌকিগুলোই আমাদের মূল ঘাঁটি এটাও ছিল একটা উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সফল করার জন্য প্রতিটি চৌকিতে ক্যাম্প, বাংকার এসবতৈরী করা হয়েছিল। খুব বেশি মুক্তিযোদ্ধা ছিল না। একেকটাতে হয়তো দুই প্লাটুন যোদ্ধা। কিন্তু আয়োজন ছিল বিরাট। পাকিস্তানীদের ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর জন্যেই এতোসব আয়োজন। এবং কৌশলটা খুব কাজে লেগেছিল। পাকিস্তানীরা বারবার এই চৌকিগুলোর ওপর বিমান এবং নৌ হামলা চালিয়েছে। তারা একবারও আমাদের মূল ঘাঁটিতে বিমান হামলা চালাতে পারেনি যেখানে অবস্থান করেছে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা। যেখানে ছিল শত শত ঘর, ক্যাম্প। চৌকিগুলোকেই তার মনে করেছে মূল ঘাঁটি। এই সমস্ত বিবেচনা করে আমাদের কৌশলটা সফল হয়েছিল বলা যায়।

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রস্তুতিতে নিজস্ব শক্তি সংগঠিত করা এবং শত্রুকে যথাসাধ্য নাজেহাল করার কৌশল আমাদের নিতে হয়েছিল। কিন্তু কোন থানা কিংবা বন্দর আক্রমণ করে সেখানে অবস্থান করার কৌশল পরিত্যাগ করা হলো। শরণখোলা, বগী, তাফালবাড়ী (এটা হচ্ছে বাগেরহাট জেলায়), মোরেলগঞ্জের নিম্নাঞ্চল, গোপখালি, চালতাবুনিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে অনেকগুলো বড় বড় বাজার এবং গ্রামীণ হাটের অবস্থান। এই অঞ্চলগুলো ছিল আমাদের দখলে। বগী এবং শরণখোলায় নিয়োজিত ছিল আমাদের প্রায় দুই ব্যাটালিয়ান মুক্তিযোদ্ধা। আমাদের শক্তি ততোদিনে এতটোই সুসংহত যে, পুরো দক্ষিণাঞ্চল বুঝতে পেরেছে মুক্তিযুদ্ধ এগিয়ে চলেছে। মুক্তিযোদ্ধারা ভালোভাবেই প্রস্তুত হচ্ছে দেশকে স্বাধীন করার জন্য। মুক্তিযোদ্ধারা এখন সক্ষম। মুক্তিযোদ্ধারা এখন লড়াকু। মুক্তিযোদ্ধারা এখন লড়াই করতে জানে। আক্রমণ করতে জানে। শত্রু হনন করতে জানে। শত্রুকে পরাজিত করতে জানে। এমন একটা আস্থা, বিশ্বাস সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছিল আমাদের বাহিনী।

একদিন আমি শরণখোলা ফরেস্ট অফিসে থেকে আমাদের মূল ঘাঁটির দিকে রওনা দিয়েছি। এমন সময় দেখি নদীর পাড়ে একজন জেলে বসে আছে তার নৌকায়। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কাছে মাছ আছে?' উত্তর দিল, 'হ্যা, মাছ আছে।' আমরা নৌকা নিয়ে ওর নৌকার কাছে গেলাম। দেখলাম অনেক মাছ। চিংড়ি প্রচুর, অন্যান্য মাছও আছে। আমরা দরদাম ঠিক করে ওকে টাকা দেয়ার পর মাছগুলো নিয়ে ফিরে এলাম ক্যাম্পে। এই ঘটনর সপ্তাহ খানেক পরে আমি আবার ঐ পথ দিয়ে ফিরে যাচ্ছি, হঠাৎ করে শুনি একটা লোক নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে ডাকছে। অনুরোধ জানাচ্ছে আমরা যেন কাছে গিয়ে তার কথা শুনি। আমার প্রথমে একটু সন্দেহ হলো। তারপরেও আমার নৌকার মাঝিকে বললাম, 'নৌকা থামান। শুনি কি বলে।' কাছে গিয়ে দেখি সপ্তাহখানেক আগে যার কাছ থেকে মাছ কিনেছিলাম সেই জেলে। আমি বললাম, 'কি ব্যাপার, আপনি এখানে।' বললো, 'স্যার আপনাদের কাছে সেদিন মাছ বিক্রি করেছি। এইটা জানতে পাইরা রাজাকার আলবদররা আমার বাড়ীঘর সব পুড়ায়া দিছে। আমার বউ বাচ্চা দূরে এক আত্মীয় বাড়িতে গিয়ে পালায়া আছে। আমিও লুকায়া লুকায়া আপনাদের খুঁজছি।' ওর কথা শুনে আমার মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। বললাম, 'আপনার নৌকায় জাল কোথায়?' জেলে বললো, 'স্যার ওইগুলো আছে। ওইগুলো লুকায়া রাখছি।' আমি বললাম, 'সেইগুলো নিয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে আসেন। আপনি মাছ ধরে আমাদের কাছে বিক্রি করবেন। তাহলে আপনার কামাইও চলবে, মুক্তিযোদ্ধারাও মাছ খেতে পারবে।' তাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গার কথা বলে দিলাম। দু'দিন পরে সে ঐ জায়গামত এসে হাজির হয়ে গেল। সঙ্গে তার ছেলে, বেশ ছোট। ওরা দু'জন মিলে মাছ ধরতে শুরু করল। আমি লক্ষ্য করলাম ওরা বাপ ছেলে মিলে প্রচুর মাছ ধরছে। আমি একদিন তাকে ডেকে পাঠালাম। বললাম, 'আপনি একা এতো মাছ ধরেছেন?' জেলে বললো, 'স্যার ভোলা নদীতে প্রচুর মাছ আছে। পাকিস্তানীদের ভয়ে অনেকদিন এখানে কেউ মাছ ধরেনি। জেলেরা নদীতেই নামে না। এইজন্য মাছ অনেক বেড়ে গেছে।' আমার চিন্তা হলো, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পগুলোতে খাবারের খুব অভাব। মাছ দিয়ে এই অভাব পূরণ করা যেতে পারে। এই চিন্তা করে আমি জেলেকে বললাম, 'আপনি যদি আপনার এলাকায় ফিরে গিয়ে আরো জেলেদের নিয়ে আসেন তাহলে কেমন হয়? আপনার আত্মীয়-স্বজন আছে না যারা মাছ ধরে?' ও বললো, 'হ্যাঁ আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে। আপনার কথা বললে ওরা আসবে।'

ঐ জেলে তার এলাকায় গিয়ে কিছুদিন পরে ফিরে এলো। তার সঙ্গে চৌদ্দ-পনেরোটা নৌকায় প্রায় সত্তুরজন জেলে। ওদেরকে নিয়ে গঠন করা হলো মাছ ধরা কোম্পানী। শুরু হলো মাছ ধরা। ওদের সঙ্গে এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধাও দেয়া হলো ওদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা দেখার জন্য। তাছাড়া ওদের মধ্যে থেকে কেউ আবার শত্রুপক্ষের কাছে গিয়ে আমাদের খবরাখবর জানায় কিনা সেটা লক্ষ্য রাখার ব্যাপারও ছিল। জেলেদের আমরা এলাকা নির্ধারণ করে দিয়ে বললাম, এর বাইরে তোমরা যাবে না। ওরা মাছ ধরতে শুরু করলো। প্রচুর মাছ। প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার। প্রতিদিন সকালবেলা এতো এতো মাছ এনে জড়ো করা হতো হেডকোয়ার্টারের সামনে যা ভাবা যায় না। আট ডিঙ্গি, দশ ডিঙ্গির খোল বোঝাই মাছ। সবই ভাল ভাল মাছ-চিংড়ি, পাঙ্গাস, কোরাল, মাগুর, বাইন ইত্যাদি। একদিন সকালে হেড কোয়ার্টারে আমি বসে আছি। এমন সময় আট ডিঙ্গি বোঝাই করে মাছ এলো। দেখে আমি খুব বিস্মিত হলাম। ভাবলাম, আমাদের দেশে এতো সম্পদ। দেশ স্বাধীন হলে একদিন হয়তো এই সম্পদটা আমরা কাজে লাগাতে পারবো। প্রাসঙ্গিকভাবেই বলা যায়, সেদিনের সেই সুপ্ত বাসনা থেকেই হয়তো আজ আমি একজন মৎসজীবী এবং মাছ রপ্তানীকারক।

যাহোক মাছের অভাবটা আমাদের পূরণ হলো, প্রোটিনের অভাবটাও পূরণ হলো। সুন্দরবনে আমাদের খাদ্যের প্রচন্ড অভাব ছিলো। অধিকাংশ সময় আমরা শুধু ডাল ভাত খেয়েই থাকতাম। জেলেদের কল্যাণে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলো।

মোরেলগঞ্জ এবং আশে পাশের এলাকার নদীতে পাকিস্তানীদের গানবোট বেশ চলাফেরা করতো। একদিন কবির আহমেদ মধু এসে গানবোট অ্যাম্বুশ করার অনুমতি চাইল আমার কাছে। আমি বললাম, 'ঠিক আছে। অনুমোদন দেয়া হলো।' অ্যাম্বুশ করা হলো মোরেলগঞ্জের ফুলহাতা নামক একটি জায়গায়। এই জায়গাতে নদীটা খুব সরু। পরিকল্পনা নেয়া হলো ফুলহাতাতেই অ্যানার্গা গ্রেনেড এবং অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের মাধ্যমে গানবোটের ওপর হামলা চালানো হবে। কবির আহমেদ মধুর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রস্তুত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেদিন গানবোট আর এলোনা ফুলহাতায়। পাওয়া গেল তিনটা পাট বোঝাই কার্গো এবং একটি যাত্রীবাহী লঞ্চ। পাটবোঝাই কার্গো তিনটি ডুবিয়ে দেয়া হলো এবং যাত্রীবাহী লঞ্চটিও হলো আক্রমণের শিকার। এটাও গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে আমাদের রণনৈতিক অবস্থানের মধ্যেই পড়ে। পাট বিদেশে যাচ্ছে। এই পাটের সূত্রে আয় করা ফরেন কারেন্সী যাবে পাকিস্তানীদের পকেটে। আর যাত্রীবাহী লঞ্চ আক্রমণের মাধ্যমে যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা যায় তাহলে সেটাও পাঞ্জাবীদের একধরনের পরাজয়ই বটে। এ জন্যেই এই অ্যাম্বুশটিকে আমি চিহ্নিত করতে চাই ছোটখাট একটি সাফল্য হিসেবে।

এরপরে আমরা ঘাঁটি এলাকা সুদৃঢ় করা এবং একটা বিকল্প ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার কাজে গুরুত্ব সহকারে আত্মনিয়োগ করলাম। পশুর নদীর পুব পাড় থেকে শুরু করে বলেশ্বর নদীতীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় গেরিলা ঘাঁটি স্থাপনের সুদূর প্রসারী একটি পরিকল্পনাও আমরা নিয়েছিলাম। এ অঞ্চলের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তাদের প্রায় সবগুলো অফিসই ছেড়ে চলে গিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর। দু'একটি অফিসে যারা রয়ে গিয়েছিল তখনো তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র আমাদেরকে দিয়ে চলে গেল। ওদের কাছ থেকে পাওয়া জিনিসগুলোর মধ্যে আমরা বিরাট প্রমোদতরীর মতো একটা নৌকাও পেলাম। ওটাতে ছিল তিনটা কেবিন, অ্যাটাচড বাথরুম এবং এই তরীতে করে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা যখন ভ্রমণ করতে যেতেন তখন এটি আঠাশ জন মাঝিমাল্লা চালাত। এই বিষয়টা আমাদের কাছে কৌতুক এবং হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়াল। আঠাশজন মাঝিমাল্লার প্রয়োজনটা কি ছিল সেটাই আমরা বুঝতে পারিনি। যদিও খুব বড় নৌকা তবুও পাঁচ সাত জন কি খুব বেশি হলে দশ জন মাঝিই এর জন্যে যথেষ্ঠ হওয়া উচিত। যাহোক এই নৌকাটাকে আমরা আমাদের ঘাঁটি এলাকায় এনে এটাকেই সাব-সেক্টর কমান্ড পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলাম। পোস্টটা নৌকার মধ্যে করলাম এইজন্যে যে, যদি আমাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে হয় শত্রু আক্রমণের মুখে তাহলে যেন আমরা সহজেই জায়গা বদলাতে পারি। এটাকে বলা যেতে পারে, আমাদের ভ্রাম্যমান সাব-সেক্টর হেড কোয়ার্টার।

আমাদের খুব বেশি আশংকা ছিল যে, পাকিস্তানী হানাদার গোষ্ঠী এবং জামাত ইসলাম-মুসলিম লীগের মীর জাফররা এক পর্যায়ে আমাদের ওপর নাপাম বোমার আক্রমণ পরিচালনা করবে এবং আমাদের সমগ্র বাহিনীকে আমি এই নাপাম বোমার আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য আমার ধারণা এবং জ্ঞান অনুযায়ী যতোটা সম্ভব প্রস্তুত রেখেছিলাম প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে। এছাড়া বাড়তি প্রস্তুতি হিসেবে সম্ভাব্য নাপাম বোমা আক্রমণের সময় যাতে আশ্রয় নেয়া যায় সেজন্য মূল ঘাঁটি থেকে তিরিশ পঁয়তিরিশ মাইল দূরে বিকল্প একটি ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের একটা কোম্পানী পাঠানো হলো এই ঘাঁটি গড়ে তোলার জন্য। ওরা প্রায় দেড় মাস উদয়াস্ত পরিশ্রম করে এই ঘাঁটি নির্মাণ করে।

আমি আগেই বলেছি, মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে আমরা গেরিলা কায়দার হিট এন্ড রান পদ্ধতি বাদ দিয়ে যে সব এলাকায় কর্তৃত্ব ধরে রাখা সম্ভব সে সব এলাকাতেই আক্রমণ পরিচালনা করছিলাম। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে সুন্দরবনের মধ্যে একটা অ্যাম্বুশ অপারেশন চালাই আমরা। আমাদের যেসব পাহারা চৌকি ছিল সেগুলোর মধ্যে একটা ছিল ঢাকা-মংলা, ঢাকা-খুলনা নৌপথের মাঝামাঝি, সুন্দরবনের মধ্যে। ঢাকা থেকে মংলা এবং খুলনাগামী লঞ্চ সুন্দরবনের বগী ও সুপতি হয়ে নদী অতিক্রম করে মংলার দিকে আসতো। সেলা নদীর মোহনায় আমাদের একটা চৌকি ছিল। এই চৌকি থেকে আমাদের জানানো হলো যে, রকেট স্টীমারে করে পাঞ্জাবীরা ঢাকা থেকে খুলনার দিকে যাচ্ছে। প্রতিদিন রকেটে প্রায় পাঁচ সাতশ পাঞ্জাবী থাকে। এই রিপোর্টটা জানার পরে আমি পাঞ্জাবীদের এই যোগাযোগ বিধ্বস্ত করার জন্য নির্দেশ দিলাম।

মুক্তিবাহিনীর একটি কোম্পানী সেলা নদীর উত্তর পাড়ে অ্যাম্বুশ নেয়ার জন্য পাঠালাম। নদীর উত্তর পাড়ে নির্ধারিত লাইনে ট্রেঞ্চ করে মুক্তিবাহিনী অবস্থান নিলো। নিয়মিত সময়ে স্টীমার রকেট এবং আমাদের অ্যাম্বুশ পার্টি গুলী চালালো। গুলী চালিয়েই অ্যাম্বুশ পার্টি এক অর্থে নীরব হয়ে গেল। কারণ পাকিস্তানীরা রকেট স্টীমারগুলোর ছাদের ওপরে বালুর বস্তা দিয়ে বাংকার করে নিয়েছিল। এবং এই বাংকারে হেভী মেশিনগান বসিয়েছিল পাকিস্তানীরা। আমাদের অ্যাম্বুশ পার্টি যখন ট্রেঞ্চ থেকে গুলী ছুড়তে আরম্ভ করল তখন রকেটের ছাদের ওপর অবস্থিত বাংকার থেকে পাকিস্তানীরা হেভী মেশিনগানের ফায়ার ওপেন করল। যেহেতু ওপর থেকে নীচে গুলী করছে ওরা, সেহেতু দু'এক মিনিটের মধ্যেই আমাদের কোম্পানী নিজস্ব আক্রমণ বন্ধ করতে বাধ্য হলো। রিপোর্ট চলে এলো আমার কাছে যে আমরা সফল হতে পারিনি।

আমি খানিকক্ষণ চিন্তা করলাম, তাহলে কি করা যায়। উত্তরটা পেয়ে গেলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই। স্থানীয় কমান্ডারদের মধ্যে দু'একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম 'সুন্দরবনের আশেপাশের অঞ্চলে কোন কোন বারে হাট বসে?' ওরা জানাল অমুকবারে অমুক জায়গায় হাট বসে, অমুকবার আরেক হাট ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি লোক পাঠালাম হাট থেকে দেড়শ গামছা কিনে আনার জন্য। গামছা কিনে নিয়ে আসা হলো। এছাড়া অতিরিক্ত রশিও আমাদের কাছে ছিল। আমরা প্রায় শ'দেড়েক মুক্তিযোদ্ধা গামছা দিয়ে নিজেদের গাছের সঙ্গে বেধে সেলা নদীর উত্তর পাড়ে নতুন করে আবার অবস্থান নিলাম। গাছের এমন উচ্চতায় আমাদের অবস্থান যেন সেখান থেকে রকেট স্টীমারের ছাদে গুলী করা যায়। গামছা আর রশি দিয়ে কোমর গাছের সঙ্গে বেধে নদীর মুখোমুখি পজিশন নিলো দেড়শ'র মতো মুক্তিযোদ্ধা, হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। নীচের বাংকারে আগের দিনের মতোই মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিলো। পরদিন আবার রকেট স্টীমারে পাঞ্জাবীরা সদলবলে খুলনার দিকে আগুয়ান। পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক প্রথমে নদীর পাড়ে ট্রেঞ্চে যে মুক্তিযোদ্ধারা পজিশন নিয়ে বসেছিল তারা গুলী করতে শুরু করলো। প্রতিক্রিয়া আগের মতোই। পাঞ্জাবীরা স্টীমারের ছাদ থেকে হেভী মেশিনগানের গুলী ছুড়তে শুরু করলো। ঠিক সেই মুহূর্তে যে দেড়শ মুক্তিযোদ্ধা গাছে বসেছিল হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে তারা স্টীমারের ছাদের ওপর আক্রমণ করে বসল। পাকিস্তানীদের জন্য ব্যাপারটা ছিল অপ্রত্যাশিত। ঘটনাটা তাদেরকে চূড়ান্তভাবে হতাশ এবং ভীত সন্ত্রস্ত করে তুললো। হেভী মেশিনগান যে চালাচ্ছিল সে মারা গেল, আরো দুইজন আহত হলো এবং স্টীমারের সারেং, সুকানী হুইল ছেড়ে দিয়ে ভাগল। স্টীমারটি সোজা গিয়ে নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পূর্ণ গতিতে। স্টীমারের প্রথম শ্রেণীর অবস্থান একেবারে সামনের দিকে। গোলাগুলীর আঘাতে এবং পূর্ণ গতিতে গিয়ে পাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ায়

প্রথম শ্রেণীর কামরাটি ভেঙ্গে একেবারে চুরমার হয়ে গেল। এখানে আমাদের কিছুটা ভুল হয়েছিল। আমরা অ্যাম্বুশটিকে দীর্ঘমেয়াদী এবং বিস্তৃত অঞ্চলে না করে স্বল্প মেয়াদী এবং অল্প জায়গায় করেছিলাম। এই ভুল না হলে আমরা সেদিন অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্যসহ স্টীমারটি নিজেদের দখলে নিয়ে নিতে পারতাম। যে জায়গাটায় স্টীমার গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেই জায়গাটি অ্যাম্বুশ পার্টির অবস্থান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরত্বে। সুন্দরবনে এমন গভীর জংগল যে অস্ত্র নিয়ে দৌড়াতে গিয়ে সেই আধমাইল জায়গা অতিক্রম করে কাউকে ধরা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সেই জঙ্গল ভেঙ্গে দৌড়াতে শুরু করল যাতে রকেট ধরা যায় কিংবা পুনরায় আক্রমণ শুরু করা যায়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা ব্যর্থ হলো। পাঞ্জাবীরা স্টীমারের ওপর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে পালিয়ে গেল। আমি এই রিপোর্ট পেলাম একদিন পরে। আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি নতুন ধরনের সেই অ্যাম্বুশ আক্রমণে পাকিস্তানী বাহিনীর কতটুকু ক্ষতি হয়েছে। অবশ্য চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পরে আমি একটা হিসাব পেয়েছিলাম। ২৩ শে ডিসেম্বর খুলনায় আমি এবং মেজর জলিল বসে আছি খুলনা সার্কিট হাউজে। মেজর জলিল কিছুটা অসুস্থ। কিছুক্ষণ পর খুলনায় সিভিল সার্জেন সাহেব এলেন মেজর জলিল সাহেবকে দেখতে। মেজর জলিল তাকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি তো আমার পরিচয় পেয়ে উল্লসিত। 'হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার নাম তো আমি শুনেছি। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে হাসপাতালে ভর্তি হতে এলো ৭০ জনের মতো পাঞ্জাবী সৈন্য। প্রত্যেকে বুলেটবিদ্ধ। ওরা কাতরাচ্ছে আর বলছে, সুন্দরবন কা সারা দ্রাকমে মুক্তি (অর্থাৎ সুন্দরবনের প্রত্যেক গাছে গাছে মুক্তিযোদ্ধ)'। আসলে সব গাছে মুক্তিযোদ্ধা ছিল না। মাত্র দেড়শ মুক্তিযোদ্ধা ছিল। তবু আতংকগ্রস্ত, আহত পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছে মনে হয়েছে গাছে গাছে মুক্তিযোদ্ধা। আমি অবশ্য কতজন পাঞ্জাবী মারা গিয়েছিল সে হিসাব পাইনি। তবে অনুমান করা যায় বেশ কয়েকজন পাঞ্জাবী সৈন্যই নিশ্চয়ই নিহত হয়েছিল। যাহোক পুরোপুরি সাফল্য না পেলেও এই অ্যাম্বুশটা আমাদের বেশ আনন্দ যুগিয়েছিল, প্রেরণা হিসেবেও কাজ করেছে।

এরপরে আমরা নিজস্ব শক্তি আরো সংগঠিত করবার জন্য এবং সুন্দরবনে আমাদের অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্য পাকিস্তানী টহল গানবোট কব্জা করার কৌশল খুঁজতে লাগলাম। আমাদের মূল উদ্দেশ্য–ক্ষতিগ্রস্থ না করে সৈন্যসহ পাকিস্তানী গানবোট আয়ত্বে আনা। শেষ পর্যন্ত একটা কৌশল আবিষ্কার করেছিলাম আমরা। এই আবিষ্কারের পিছনে কয়েকজন সিনিয়র মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারসহ আমার ভূমিকাই ছিল প্রধান। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো কৌশলটা আমরা শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারিনি। তার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ভিয়েতনাম গেরিলা যুদ্ধের ওপর লেখা একটি বই পড়ে আমার ধারণা হয় আমাদের আবিষ্কৃত সেই কৌশলটা একশ ভাগ সাফল্য অর্জন করতে পারতো। এখানে কৌশলটার বর্ণনা আমি দিচ্ছি না যেহেতু সেটা কাজে লাগানোর সুযোগ আমরা পাইনি। এখনও পর্যন্ত জামাতে ইসলামী এবং মুসলিম লীগের বংশধররা যে রকম অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে দেশের ভেতরে তাতে আমার আশংকা হয় সেই কৌশল হয়তো আবারো কাজে লাগাতে হতে পারে। সুতরাং গোপন ব্যাপারটা গোপনই থাক।

যাহোক, যুদ্ধ এগিয়ে যাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেকদিন আমরা বগী এবং শরণখোলা অফিসে নতুন নতুন মুক্তিযোদ্ধা দলভুক্ত করছি। সমগ্র এলাকায় ছোট–খাট গেরিলা আক্রমণ এবং মাঝে মাঝে অ্যাম্বুশ করার কৌশল নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তখনও কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না, ভারত আমাদের ঠিক কতটা সাহায্য করবে। আমরা বুঝতে পারিনি মিসেস গান্ধীর মস্কো সফরের মধ্য দিয়ে এমন একটা অবস্থানের সৃষ্টি হবে যে ভারত মিত্রবাহিনী হিসেবে

মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধের ফলাফল এতোটা ত্বরান্বিত করে দেবে। বরং চেয়ারম্যান মাও সে তুং, ফিদেল ক্যাস্ট্রো, চে গুয়েভারা, রেজিস দ্য ব্রে–এদের বই পুস্তকের মধ্য দিয়ে আমরা যে জ্ঞান পেয়েছিলাম সেটা গেরিলা যুদ্ধকে সুসংহত করা, আত্মশক্তি সংরক্ষণ এবং শত্রুর নিধন–এই কৌশলটাই আমরা আমাদের মূল কৌশল হিসেবে মনে করেছিলাম। যদি আমরা বুঝতে পারতাম যে মিত্রবাহিনীর সহযোগিতা পেয়ে ডিসেম্বরের মধ্যেই পাকিস্তানীদের ওপর মরণ আঘাত হানতে সক্ষম হবো, তাহলে আমাদের কৌশল অবশ্যই ভিন্ন হতো। কিন্তু যেহেতু বুঝতে পারিনি সেহেতু বিরাট একটা গ্যাপের মধ্যে আমরা পড়ে গিয়েছিলাম স্বাভাবিকভাবেই। বিরাট শক্তির একটা অবস্থান আমাদের ছিল। কিন্তু প্রকৃত অর্থে আমরা আমাদের শক্তি কাজে লাগাতে পারিনি। অনেক শহর আর বন্দর আমরা দখল করতে পারতাম, করিনি।

বগী, তাফালবাড়ী, মাছুয়া, তুষখালী, চরদুয়ানী এবং সুপতি–এগুলো বরিশাল এবং বাগেরহাটের মাঝখান দিয়ে বহমান বলেশ্বর নদীর দু'পাশে অবস্থিত ছোট ছোট বন্দর। এসব বন্দরে প্রায়ই গানবোটের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতো। আর এই গানবোটের সঙ্গে গোলাগুলীর শব্দ আমাদের পিরোজপুরের গ্রামের বাড়ী থেকেও স্পষ্টই শোনা যেতো। এরকম একটা গানবোট সংঘর্ষের সময় আমার মা পড়েছিলেন খুব বিপাকে। যুদ্ধের প্রথম তিন মাস আমার বাবা–মা বিভিন্ন আত্মীয়–স্বজনের বাড়িতে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। এরপরে তারা আবার ফিরে এলেন আমাদের নিজস্ব বাড়িতে। অবশ্য যুদ্ধের শুরুর দিকেই আমাদের বাড়িটি জামাত–মুসলিম লীগের পান্ডারা গান পাউডার দিয়ে পুড়িয়ে একেবারে ছারখার করে দিয়েছিলো। তরপরও ব্যাকাত্যাড়া টিন আর খুটিটুটি ভাঙ্গাচোরা যা ছিল সেসব যতোটা সম্ভব ঠিকঠাক করে বস্তির কায়দায় বাড়িটি কোনরকমে দাঁড় করিয়ে তারা আবার থাকতে লাগলেন সেখানে। প্রাসঙ্গিক হিসেবে বলা যায়, স্বাধীনতার পরে বারো বছর পর্যন্ত বাবা–মা এই বস্তির মধ্যেই ছিলেন। যাহোক, বাবা–মা পিরোজপুরে অবস্থান করছেন এবং প্রায় প্রতিদিনই গানবোটের সঙ্গে গুলী বিনিময়ের শব্দ তারা শুনতে পান। একদিন আমাদের এলাকারই মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী টাউট শ্রেণীর এক লোক পিরোজপুর শহরে একটা গুজব ছড়িয়ে দিলো। সে বললো, সে নিজে দেখে এসেছে গানবোটের সঙ্গে গোলাগুলী বিনিময়ের সময় আমির একটা পা উড়ে গেছে এবং পাকিস্তানীরা আমাকে বন্দী করে হাত পা বেঁধে গানবোটে ফেলে রেখেছে। এই খবরটা শুনে একজন উকিল বাবাকে বলল। বাবা তখন ছিলেন উকিল লাইব্রেরীতে। বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলেন। বাবা ফেরার আগেই মা'র কাছেও ঐ গুজবটি চলে এসেছে। বাড়ি ফিরে বাবাতো চুপ করে বসে আছেন। মা বললেন, 'কি খবর?' বাবা বললেন, 'নাহ, কোন খবর নেই।' মা আবার বললেন, 'না, খবর আছে। আমি জানি। জিয়া যুদ্ধের মাঠ থেকে গ্রেফতার হয়েছে–এইতো খবর।' বাবা বুঝলেন যে আর গোপন করে লাভ নেই। মা খুব অস্থির হয়ে গেলেন। প্রচন্ডরকম ভেঙ্গে পড়লেন। বাবারও

একই অবস্থা। অন্যান্য আত্মীয়রাও শোকাহত। মা বললেন, 'জিয়া পাকিস্তানীদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে মারা যাক। এটা আমার জন্য কোন দুঃখের খবর নয়। কিন্তু জিয়া আহত হয়ে বন্দী হবে কেন? পাকিস্তানীদের অত্যাচারের মুখে তাকে মরতে হবে কেন? সে বীরের মতো লড়বে, এটা আমি চাই। কিন্তু সে পাকিস্তানীদের হাতে বন্দী হলো কেন? সে কি করে আহত অবস্থায় সারেন্ডার করতে পারে?' খুব অস্থির ভাবে মা প্রলাপের মতো এসব বলে যাচ্ছিলেন। আমার বাবা-মা দুজনেই খুব পরহেজগার লোক ছিলেন। পিরোজপুরে তাদের আধ্যাত্মিক হিসেবে বেশ ভাল একটা অবস্থান ছিল। এক পর্যায়ে মা নিজেই সবাই কে বললেন, 'তোমরা যে যাই বলো অস্থির হয়ে তো লাভ নেই। তোমরা যার যার কাজ কর।' এই বলে তিনি কোরান শরীফ নামিয়ে পড়তে শুরু করলেন। পড়তে পড়তে হঠাৎ মায়ের মনে একটা বিদ্রোহ হলো। তিনি আবার কোরান শরীফ বন্ধ করে ফেললেন। আল্লাহর সাথে তাঁর অভিমান পর্ব শুরু হলো। তিনি আল্লাহকে বললেন, সারাজীবন এতো বন্দেগী করলাম। আর আমার ছেলে আহত হয়ে নির্যাতন সইবে কেন? আমার ছেলে শহীদ হবে । এটা কেন হলো? এ অবিচার আমার ওপর কেনো? এই সব বলে বলে আল্লার কাছে ফরিয়াদ করতে শুরু করলেন। এর মধ্যে আবার তিনি বাড়ীর সামনে রাস্তায় চলে এসেছেন ছোট্ট একটা কাজের মেয়েকে নিয়ে। কাজের মেয়েকে তিনি বললেন, 'চল আমরা ঐ লোকটার বাড়ী যাই যে খবরটা দিয়েছে।' আমার আম্মা ছিলেন পরহেজগার মানুষ। রাস্তায় বেরোতেন না খুব একটা। পর্দা মেনেই চলতে হতো। মা কাজের মেয়েটাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন সেই গ্রামে, যে গ্রামের টাউট প্রকৃতির লোকটা গুজব ছড়িয়েছিল। গ্রামের লোকজনের কাছে তিনি জানতে চাইলেন কি ঘটেছে। যা শোনা যাচ্ছে তা সত্য কিনা ইত্যাদি। ওরা মায়ের সামনে খুব খুশি খুশি ভাব দেখালো। মায়ের প্রশ্নের সরাসরি জবাব তারা দিচ্ছে না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলছে। মূল উদ্দেশ্য মাকে মানসিকভাবে অত্যাচার করা। মা আবার ফিরে এলেন। ফিরে এসে থম ধরে বসে রইলেন আমাদের বস্তির মতো সেই ঘরটায়। বসে থাকতে থাকতে তাঁর মনের মধ্যে আবার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল। মা বাবাকে ডাকলেন, 'শোন আমি একটা কথা বলি।' বাবা বললেন, 'কি, বলো।' মা বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি জিয়া আহত অবস্থায় গ্রেফতার হয়নি। জিয়া ভাল আছে।' তখন বাবা বুঝতে পারছেন মায়ের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাবা বললেন, 'তুমি কি বলছো এসব? কি হয়েছে তোমার?' মা বললেন, 'না, আমি ঠিকই বলছি। যদি জিয়া গতকাল আহত অবস্থায় গ্রেফতার হয়ে থাকে পাকিস্তানীদের কাছে, তাহলে এই খবরটা আমাকে অন্যের কাছ থেকে শুনতে হবে কেন? মা হিসেবে আমার নিজেরই তো সবার আগে সেটা জানার কথা। গত রাত্রে আমি খুব আরামে ঘুমিয়েছি। জিয়ার যদি সেরকম কিছু হয় তাহলে সেই খবরতো আমার মনে চলে আসবে। এই খবরতো আমার রাস্তার লোকদের গুজব থেকে নিতে হবে না। তুমি দুঃচিন্তা করো না। জিয়া সুস্থ আছে। ভাল আছে।' বাবাও মায়ের কথায় বেশ আশ্বস্ত হলেন এবং মা'ও আবার অজু করে তওবা সেরে কোরান শরীফ পড়তে বসলেন। পরবর্তীতে, ৮ই ডিসেম্বর মায়ের কাছ থেকে ঘটনাটি আমি জেনেছিলাম।

পিরোজপুরে পাকিস্তানী বাহিনীর কমান্ডার ছিলো ক্যাপ্টেন এজাজ। ক্যাপ্টেন এজাজ বেশ কয়েকবার আমাদের বাড়িতে হামলা করেছে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে। মাঝে মধ্যেই তার বাঙালী দোসর অর্থাৎ স্থানীয় মুসলিম লীগ ও জামাতের পান্ডারা তাকে গিয়ে খবর দিতো যে, আজকে জিয়া বাড়িতে এসেছে তার বাবা–মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। এটা শুনেই সে এক প্লাটুন কি দু' প্লাটুন পাঞ্জাবী সৈন্য নিয়ে আমাদের বাড়িটা ঘিরে ফেলে তারপর জোর তল্লাশী চালিয়ে চলে যেতো। কিন্তু হঠাৎ একদিন সে নিজে মাত্র দু'জন গার্ডসহ আমাদের বাড়িতে চলে এলো। বাবা–মা চুপচাপ ভঙ্গিতে বসে আছেন। ক্যাপ্টেন এজাজের কণ্ঠে সেদিন শোনা গেল ভিন্ন সুর। খুব মোলায়েম কণ্ঠে সে বাবা–মা'কে নানারকম কুশল জিজ্ঞাসা করতে লাগল। বাবা–মা ভাবলেন এটা হয়তো আসলে একটা কৌশল। ক্যাপ্টেন সাহেব হয়তো আসলে জানতে চাইছে, জিয়ার সঙ্গে তাদের কোন রকম যোগাযোগ আছে কিনা। ক্যাপ্টেন এজাজ বাবা–মা'র কাছে আমার খুব প্রশংসা করল। লড়াইয়ে তাদেরকে খুব জব্দ করছি এসব কথাও বলল। আমার মা আবার তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ওর কথা আর বলবেন না। ওতো দেশের শত্রু। ওর কথা বলে লাভ কি?' তখন ক্যাপ্টেন এজাজ মাকে বলল, 'না, না, আপনি ভুল বলছেন। ও আসলে দেশকে ভালবাসে। ও এদেশের খাঁটি সন্তান। আমরাও দোয়া করি ও বেঁচে থাকুক। আমরা এখানে যা করছি এটা ন্যায় নয়। এটা অন্যায়। আমি নিজেই আপনাদের বাড়িতে বহুবার হামলা করেছি। যদিও জানি এটা অন্যায় তবু আমি নিরুপায়। ওপরের নির্দেশ আমাকে মেনে চলতে হয়।' ক্যাপ্টেন এজাজ ছিলেন পাঠান অফিসার। পাঠান এবং পাঞ্জাবী সৈন্যদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করতো। সম্ভবত এই কারণেই ক্যাপ্টেন এজাজ একজন মুক্তিযোদ্ধার সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন। বাবা–মা সেই অফিসারের কথা শুনে তো একেবারে হতবাক–একজন পাকিস্তানী অফিসার আমাদের ছেলেকে খাঁটি দেশপ্রেমিক বলছে, এটা কি ধরনের ঘটনা। যাহোক ক্যাপ্টেন এজাজ শেষে বললো, 'আপনাদের কোন অসুবিধা হলে আমাকে বলবেন। টাকা–পয়সা দরকার পড়লে বলবেন।' বাবা বললেন, 'না, আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। আমরা মোটামুটি ভালই আছি।' বাবা ভাবছিলেন পাকিস্তানীদের কাছ থেকে টাকা নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া আমি যখন মুজিবনগরে গিয়েছিলাম তখন প্রবাসী সরকার আমাকে মার্চ,এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই–এই পাঁচ মাসের বেতন দিয়ে দিয়েছিল। আমি সেই টাকাটা কোনভাবেই খরচ করিনি। কারণ, জানতাম বাবা–মা খুব অর্থকষ্টে আছেন। ফিরে আসার পরে পুরো টাকাই বাবা–মা'র কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। দু'হাজার টাকা ছিল। তখন দু'হাজার টাকার তো বেশ মোটা অংকেরই বলা যায়। সুতরাং ছয়মাস এক বছরের জন্য তাদেরকে আর অন্নচিন্তা করতে হয়নি। তদুপরি ক্যাপ্টেন এজাজের এই সহানুভূতিশীল ব্যবহার বাবা–মাকে খুব আশ্চর্যান্বিত করল। একজন মুক্তযোদ্ধার প্রশংসা একজন পাকিস্তানী অফিসারের মুখে শুনলে আশ্চর্য হওয়ারই কথা।

সেই সময় আমরা পিরোজপুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কারণ পিরোজপুরে পাকিস্তানী সৈন্য এবং তাদের এদেশীয় জামাত-মুসলিম লীগের দোসররা বেশ তান্ডব চালিয়েছিল। আমি ভাবছিলাম পিরোজপুরে পাকিস্তানীদের উপযুক্ত একটা শিক্ষা দেয়া দরকার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে ছয়-সাত মাস হলো। মোটামুটি বেশ কিছু আক্রমণ আমরা পরিচালনা করেছি। সফলতা অর্জন করেছি কোথাও। কোথাও আবার ব্যর্থও হয়েছি। সতীর্থদের কয়েকজনকে হারিয়েছি। দুঃখ-বেদনা-আনন্দের মধ্যেও পিরোজপুর আক্রমণ করতে না পারাটা আমার মনে কাঁটার মতো খচখচ করে বিধতো। অনেকবারই পিরোজপুর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু একটার পর একটা ঘটনা এমনভাবে ঘটে গেছে যে পিরোজপুরে আর আক্রমণ পরিচালনা করা হয়নি। হয়তো দেখা গেছে পিরোজপুর আক্রমণ করার জন্য দু'হাজার মুক্তিযোদ্ধা প্রস্তুত। দুই-তিন-চারদিন যাবৎ প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। এমন সময় দেখা গেল পরিস্থিতির কারণে অন্য এক জায়গায় এমনভাবে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে যে ওই দু'হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে উক্ত যুদ্ধক্ষেত্রেই পাঠাতে হলো। এভাবেই বারবার পিছিয়ে গেছে পিরোজপুর আক্রমণের বিষয়টি।

আমার ছোট ভাই কামালও ছিল অত্যন্ত সক্রিয় একজন মুক্তিযোদ্ধা। সে ওই সময় মঠবাড়িয়া-বামনা এলাকায় অবস্থান করছিল। সে দুঃসাহসিকভাবে পিরোজপুর থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার কাজ সম্পন্ন করল। সে হঠাৎ করে একদিন আগস্ট মাসের শুরুর দিকে পিরোজপুরে গিয়ে হাজির। আমাদের পড়শী এ্যাডভোকেট এম,এ সামাদের বাসায় গিয়ে সে হাজির হলো। সামাদ সাহেবের ছেলে ওবায়দুল কাইয়ুম হারুনসহ অন্যান্য মানুষের মানসিক অবস্থান ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। পাঞ্জাবীরা আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার পর বাবা-মা তাদের বাড়িতেই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কামাল তো সেখানে গিয়ে হাজির। কামালকে দেখে সবাই প্রথমে ঘাবড়ে গেল। চারদিকে পাঞ্জাবীদের এতো সন্ত্রাস, জামাত-মুসলিম লীগের এতো সন্ত্রাস-এর মধ্যে কামালের এই পিরোজপুরে আসাতো মোটেই নিরাপদ নয়। কামাল এসেছে অস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য। সে লুকিয়ে রাখা তিনটা রাইফেল নৌকার নীচে বেঁধে পিরোজপুর থেকে মঠবাড়িয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। যাওয়ার পথে রাজাকাররা তাকে ধরল। কিন্তু তার সৌভাগ্য, এ যাত্রা সে বেঁচে গেল। তার কাছে কিছুই পায়নি তারা (রাইফেলগুলো নৌকার নীচে বাধা)। সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো তাকে রাজাকাররা চিনতে পারেনি। প্রথমত সে একজন মুক্তিযোদ্ধা, তার ওপর সে আমার ছোট ভাই। কাজেই তার রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নাই। কিন্তু ঐ সময়টাতে যেসব রাজাকার উক্ত স্থানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল সৌভাগ্যক্রমে তারা কেউই ব্যক্তিগতভাবে চিনতো না। তাই ওরা যখন নৌকা তল্লাশী করে কিছু পেল না তখন ওকে ছেড়ে দিল। কামাল ফিরে গিয়ে মঠবাড়িয়া এবং বামনায় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করল।

আগস্টের মাঝামাঝির দিকে আমরা যখন মঠবাড়িয়া, কাউখালি ইত্যাদি স্থানে অপারেশন চালাচ্ছি তখন খোঁজ পেয়ে কামাল তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে সুন্দরবনের ঘাঁটিতে এসে হাজির।

বৃহত্তর বরিশাল জেলা, ফরিদপুরের একাংশ, বাগেরহাটের একাংশ, পটুয়াখালি জেলা-এসব অঞ্চল ভারতীয় সীমান্ত থেকে অনেক দূরে থাকার কারণে এসব অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ছাত্র-যুবক এবং সাধারণ মানুষ যারা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে যোগ দিতে চাচ্ছিল তাদের পক্ষে মনের সেই আশা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। মুজিব নগরে গিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা তাদের জন্য ছিল কষ্টকর। যে কারণে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা এসে আমাদের

যোগ দিতে শুরু করল। আমরা একদিকে আমাদের রণকৌশল হিসেবে গেরিলা যুদ্ধ গুলো চালিয়ে যাচ্ছিলাম আবার সঙ্গে সঙ্গে রিক্রুটিংয়ের কাজও চলছিল।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমরা পরিকল্পনা করলাম মঠবাড়িয়া থানা আক্রমণের। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় পাঁচশ মুক্তিযোদ্ধার দুটি কোম্পানী নিয়ে আমরা ঘাঁটি এলাকা থেকে খুব সকালবেলা যাত্রা করলাম। ঘাঁটি এলাকা ছেড়ে আমরা শরণখোলা ফরেস্ট অফিসের কাছে এসেছি, ঠিক এই সময়ে (সুবহে সাদিকের একটু পরেই) আমরা দেখতে পেলাম তিন চারটা গানবোট ছুটে আসছে আমাদের দিকে। আমরা তখন নদীর মাঝখানে। অবস্থানটা সুবিধাজনক নয় মোটেই। আমরা একটু হতবিহ্বলই হয়ে পড়লাম। কি করণীয় তা চট করে কারো মাথায়ই আসছিল না। আমি তাৎক্ষণিক নির্দেশ দিলাম, 'নদী অতিক্রম করো! পাড়ে চলে যাও, নৌকাগুলোকে ডুবিয়ে দাও এবং নদীর পাড়ে যে ভেড়িবাঁধ আছে সেগুলোর পিছনে গিয়ে তোমরা অবস্থান গ্রহণ করো। আগে বুঝতে হবে ওরা আমার অবস্থান জেনে এখানে এসেছে নাকি এটা তাদের সাধারণ পেট্রোলিংয়ের অংশ।' আমরা তাড়াতাড়ি করে নৌকার গতি বাড়িয়ে দিয়ে পাড়ের কাছে গেলাম। তারপর নৌকাগুলো ডুবিয়ে দিয়ে উঠে পড়লামপাড়ে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা যেখানে নৌকাগুলো ডুবিয়ে ছিলাম সেখানে গানবোটগুলো এসে হাজির হলো। তারা বুঝতে পারলো যে, মুক্তিবাহিনীর একটা ইউনিট এখান দিয়ে মুভ করছে। তারা নদীর মাঝামাঝি অবস্থান নিলো। এবং এক পর্যায়ে তারা ভেড়িবাঁধের পেছনে অবস্থানরত আমাদের বাহিনীর উপর গুলী বর্ষণ করতে শুরু করল। মধ্যবর্তী যে সময়টুকু পেয়েছিলাম এরই মধ্যে আমি মুক্তিবাহিনীকে পৌনে এক মাইল পেছনে সরিয়ে আনতে পেরেছি। দুই বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। চারটা গানবোট থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণ চলছে এবং আমাদের অটোমেটিকসগুলোও মাঝে মাঝে সময় বুঝে সক্রিয় হয়ে উঠছিল। আমি বুঝলাম, যেহেতু যুদ্ধ শুরু হলো একেবারে সকাল বেলাতেই, সারাদিন গোলাবারুদের সরবরাহ আমরা পাব না। কাজেই এ অবস্থায় বেশি গোলাবারুদ খরচ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। ফায়ার কন্ট্রোল করা দরকার। গানবোটগুলো অবস্থান করছে নদীর মাঝখানে। ওদের অতিক্রম করে আস্তানায় ফিরে গিয়ে অস্ত্র বা গোলাবারুদ নিয়ে আসা যাবে না। আমি নিজে পুরো বাহিনীর কাছে দিয়ে তাদেরকে এটাও বললাম যে পাকিস্তানীরা যতই গুলী করুক আমরা ভেড়িবাঁধের পেছনে যে অবস্থানে আছি তাতে আমাদের কোন ক্ষতি তারা সহজে করতে পারবেনা।

যে ভেড়িবাঁধের পেছনে আমরা অবস্থান নিয়েছি সেটার উচ্চতা প্রায় তিরিশ ফুট। বলা চলে বেশ সুদৃঢ় অবস্থান। বেশ কয়েক ঘন্টা যুদ্ধ চলল। অবস্থানের কোন পরিবর্তন নেই। তারপর হঠাৎ করেই একটা গানবোট আমাদের অবস্থান থেকে প্রায় একমাইল দূরে গিয়ে নদীর পাড়ে থামল। পাকিস্তানী সৈন্যদের নামিয়ে দিয়ে গানবোট আবার ফিরে এল এবং নামিয়ে দেয়া সৈন্যদের গানবোট থেকে কভারিং ফায়ার দেয়া হলো। যেখানে সৈন্যরা নামল সেখান থেকে কিছুটা দুরে ছিল স্লুইস গেটের অবস্থান। এই স্লুইস গেটের কংক্রিটের থামের পেছনে মুক্তিবাহিনীর একটা প্লাটুন অবস্থান করছিল।

পাকিস্তানী গানবোট থেকে কয়েকজন সৈন্য নেমে যাওয়ার পর গানবোটটা যখন খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে কভারিং ফায়ার দিতে শুরু করল তখন ঐ পিলারের আড়ালে অবস্থান নেয়া মুক্তিযোদ্ধারা একটু বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়ল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা তাদের অবস্থানটাকে কৌশলগতভাবে সুসংহত করে গানবোট থেকে নেমে আসা পাঞ্জাবীদের ওপর

আক্রমণ চালালো। সেখানে তৎক্ষণাৎ তিন কি চারজন পাঞ্জাবী সৈন্য নিহত হল। এর পরেই ঐ জায়গায় বাকি দুটি গানবোটও চলে এলো মৃতদেহগুলো তুলে নেয়ার জন্য। তারা এসে ঐ স্লুইস গেটের ওপরে সাঁড়াশি কায়দায় গোলা নিক্ষেপ করতে শুরু করল। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা টিকতে পারল না সেখানে। মুক্তিবাহিনী খানিকটা সরে যাওয়ার পর ওরা মৃতদেহগুলো উঠিয়ে নিল গানবোটে। নিয়ে আবার তারা ফিরে এল নদীর মাঝামাঝি জায়গায় এবং চারটা গানবোট থেকে শুরু হল বোমাবর্ষণ। আগের চেয়ে এবারে আরো প্রচন্ড গতিতে এবং দ্রুতবেগে। আমাদের সঙ্গে পাঞ্জাবীদের এই যুদ্ধ হচ্ছিল আমাদের মুল ঘাঁটি থেকে মাত্র দেড় দুই মাইল দূরে। তবে এই দেড় দুই মাইল জায়গাটুকু ছিল গভীর অরণ্য। যুদ্ধের অবস্থা বুঝে আমাদের একজন সহযোদ্ধা সুবেদার গাফফার একটা কোম্পানী নিয়ে এসে ভোলা নদীর অপর পাড়ে সুন্দরবনের মধ্যে অবস্থান নিল এবং সে চুপচাপ বসে থাকল জায়গা মতো। সে যে সেখানে অবস্থান করছে এটা কিন্তু আমরা জানিনা।

আমরা একেকটা গানবোটের ওপর সুযোগ বুঝে হামলা চালাচ্ছি। মাঝে মাঝে গানবোটগুলি সুবিধা করতে না পেরে পিছিয়ে যাচ্ছে। নদীর মাঝখান থেকে আরো সরে নদীর একেবারে প্রান্তে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ করে এরকম একটা গানবোটা থেকে আগুন ধরলে যেমন ধোঁয়া বেরোয় সেরকম ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। এবং সেই সময়ই পিছন দিক থেকে সুবেদার গাফফারের বাহিনী আক্রমণ করে বসল। নদীর অপর পাড় থেকে ধ্বনি উঠল–জয় বাংলা। এই ধ্বনি দিয়ে তারা বোঝাতে চাইল যে তারা গানবোটে হিট করেছে। গানবোটে আক্রমণ করার জন্য আমাদের কাছে অস্ত্র ছিল অ্যানার্গা গ্রেনেড যেটার রেঞ্জ খুব অল্প এবং এটা রাইফেল থেকে গুলীর মতো করে ছুঁড়তে হয়। এটা ছোঁড়ার জন্য লাঞ্চারও আছে। এস এল আরের মুখে লাগিয়ে ঘোড়া টানলে এ গ্রেনেডটা রকেটের মতো গিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে হিট করবে। এই গ্রেনেডটা অ্যান্টি ট্যাংক উইপন। সুবেদার গাফফার এই গ্রেনেডই ছুঁড়েছে গানবোট লক্ষ্য করে। তবে তার দূর্ভাগ্য গ্রেনেডটা বোটের যে অংশে গিয়ে লেগেছে সেটা পানির স্তর থেকে দু'ফিট উপরে অবস্থিত। ফলত গানবোটটা ক্ষতিগ্রস্থ হলেও নিমজ্জিত হল না এবং হঠাৎ করে যখন অপ্রত্যাশিত দিক থেকে একটা গানবোটের ওপর আক্রমণ করা হলো তখন অন্য তিনটা গানবোট প্রাণ ভয়ে মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালাল সুবেদার গাফফারের বাহিনীর ওপর। আমাদের দিকে ইতিমধ্যেই পেছন ফিরেছে গানবোটগুলি। আমাদের সুবিধা হলো আক্রমণে। কারণ সেই অবস্থায় আমরা গানারদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এর আগে একবারও ওদেরকে সরাসরি দেখা যায়নি। তুমুল যুদ্ধ চলছে। এর মধ্যে আরো দুটো গানবোট চলে এল। আমরা বুঝালাম যে, ওয়ারলেস মেসেজ পেয়ে ঐ দুটো এসেছে অন্যদের উদ্ধার করার জন্য। এখন ছয়টা গানবোটের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ চলছে। এরমধ্যে একটা বিকল। এ অবস্থায় আমরা আরো গানবোটের শব্দ শুনতে পেলাম বগীর দিক থেকে। শরণখোলা ফরেস্ট অফিস থেকে বগীর দূরত্ব প্রায় দু'মাইল। সম্মুখ সমরে যেহেতু পারছে না সেহেতু ওরা পাশ থেকে আমাদের ওপর আক্রমণ করার ফন্দি এঁটেছে। বগীতে আরো দুটো গানবোট ছিল মোতায়েন করা। গানবোটের শব্দ পেয়েই আমি কৌশলগত অবস্থানটা বুঝে নিলাম। দুটো গানবোটকে দিয়ে তারা সম্মুখ যুদ্ধটাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চাচ্ছে এবং এই ফাঁকে বগীতে সম্ভবত পাকিস্তানী সৈন্যদের নামানো হচ্ছে আমাদের ওপর পিছন দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য। এটা বুঝে আমি সামসুল আলম তালুকদার ও কবির আহমেদ মধু– এই দুজনকে শরণখোলার দায়িত্ব বুঝিয়ে প্রায় দুই প্লাটুন সৈন্য নিয়ে বগীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। হাঁটাহাঁটির সময় তখন নেই। আমরা দৌড়াচ্ছি। কাঁধে ঝুলছে অটোমেটিক রাইফেল। অ্যানার্গা গ্রেনেডও সঙ্গে আছে। তবে এখনো ব্যবহার করা হয়নি রেঞ্জের মধ্যে গানবোট পাওয়া যায়নি

বলে। যাহোক আমরা বগী পৌছালাম কিছুক্ষণের মধ্যেই। বগীতে আমাদের যে কন্টিনজেন্ট ছিল তারা আসলে ব্যাপারটা আগে থেকেই অনুমান করে নিয়েছিল এবং তারা প্রস্তুত হয়েই বসেছিল। আমরা এসে দেখলাম নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দুটো গানবোট এবং তারা বুঝতে পারছে না কি করবে।

লড়াইটা শুরু হয়েছে একেবারে ভোরে। আর আমরা যখন বগীতে পৌছলাম তখন সাড়ে এগারোটার মতো বাজে। যুদ্ধের পরিণতি কি হতে যাচ্ছে, কি এখন করা উচিত এসব বুঝতে না পেরে পাকিস্তানী গানবোট দুটো চুপচাপ বসে আছে বলেশ্বর নদীর মাঝামাঝি। আমাদের যেসব বাংকারস এবং ট্রেঞ্চগুলো ছিল সেগুলোতে আরো বেশী মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগ করলাম। এবং অপেক্ষা করতে থাকলাম কি ঘটে সেটা দেখার জন্য। প্রায় আধাঘন্টা পরে গানবোট দুটো চলতে শুরু করল। কোন গুলী তারা খরচ করল না। তারা চলে গেল সুপতির দিকে। সুপতি এবং বগীর মাঝখানে আমাদের একটা কোম্পানীর অবস্থান ছিল। ওদের সঙ্গে গানবোট দুটোর সংঘর্ষ বাধল ওরা সুপতির দিকে যাওয়ার সময়। যাহোক আমি আবার দুই প্লাটুন সৈন্য নিয়ে ফিরতি পথে রওনা দিলাম শরণখোলা ফরেষ্ট অফিসের দিকে, যেখানে মুল যুদ্ধটা চলছে। শরণখোলা পৌছে দেখলাম গানবোট থেকে নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে আহত কয়েকজন যুবক এসেছে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। ঐ যুবকরা এসেছিল বরগুনা অঞ্চল থেকে, মুক্তিযুদ্ধেই যোগ দেয়ার জন্য। ওরা যে আসছে সেই খবর কিংবা ওরা কোথায় আছে, তার কিছুই আমরা জানতামনা। সবার অজ্ঞাতে গানবোট থেকে নিক্ষিপ্ত একটি কামানের গোলা ওদের পাশে এসে বিস্ফোরিত হয়েছে। চারজন গুরুতর আহত। ওদের চিকিৎসার জন্য নির্দেশ দিয়ে আমি চলে এলাম মূল যুদ্ধক্ষেত্রে। শরণখোলা থেকে বগীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার আগে আমি শরণখোলার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ডেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার তৈরী করার অনুরোধ করেছিলাম। এছাড়া উপায়ও ছিল না। ভোর থেকে যুদ্ধ চলছে। না খেয়ে কতক্ষণ আর চালানো যায়? আবার পাঁচ–ছয়শ লোকের খাবার তৈরী করাওতো দূরূহ ব্যাপার। গ্রামের মাতব্বররা বলল, 'স্যার আমরা গ্রাম থেকে কয়েকটা খাসি জোগাড় করতে পারি। রান্না হবে কয়েকটা বাড়িতে।' আমি সম্মতি দিলাম। সামসুল আলম তালুকদার এই এলাকার একজন জনপ্রিয় নেতা। গ্রামের সবাই তাকে চেনে–মানে। তার বাড়িও শরণখোলায়। তিনিও সবাইকে ডেকে সেভাবে বললেন। ওরা দুই তিনটা খাসি জোগাড় করল। রান্নাও হয়ে গেল। বগী থেকে ফিরে এসে দেখি খাবারের আয়োজন সম্পন্ন। এরই মধ্যে আরেক বিপত্তি। শুরু হয়েছে মূষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টির মধ্যেই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি এবং একেকটা গ্রুপ খাবারের জন্য বিরতি নিচ্ছে। তাদের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর আরেকটা গ্রুপ এসে খাচ্ছে, পুর্বোক্তরা গিয়ে যোগ দিচ্ছে যুদ্ধে। ভেড়ীবাঁধের ওপরে একটা জায়গা যেটা জঙ্গলের পেছনে এবং সেখানে পাঞ্জাবীরা সরাসরি গোলাবর্ষণ করতে পারে না– এমন একটা জায়গায় আমি বসে পড়লাম খাওয়ার জন্য। আমার সঙ্গে প্রায় সত্তুর–আশিজন মুক্তিযোদ্ধা খেতে বসল। ভাত, খাসির মাংস, ডাল এবং বৃষ্টির পানি–এই হচ্ছে মেন্যু। বেশ ভালই ভোজ। একজন মুক্তিযোদ্ধা বলল, 'স্যার, বৃষ্টির পানি পড়ে আপনার থালাতে ছিটকে যাচ্ছে।' আমি বললাম, 'এটা কোন বিষয় নয়। আমরাতো গোলার মুখে। একটু পরে যে আমরা মরবো না তারও তো নিশ্চয়তা নেই। সেই তুলনায় কাদাতো সামান্য। আসুক ছিটে।'

মধ্যাহ্ন ভোজ শেষ হলো। আক্রমণ পাল্টা আমক্রণ চলছে। বিকেল চারটার দিকে হঠাৎ করে দুটো গানবোট ঐ আঘাত প্রাপ্ত গানবোটটাকে টেইল করে পিছু হঠতে শুরু করল। বাকী গানবোটগুলিও কভারিং ফায়ার দিয়ে দিয়ে আমাদের কাছ থেকে পিছিয়ে যেতে লাগল। আমরা বুঝলাম যেহেতু বিকেল হয়ে গেছে, সেহেতু ওরা আর এখানে অবস্থান করতে ইচ্ছুক

নয়। কারণ রাতে এখানে থাকাটা ওদের জন্য অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এজন্যই ওরা এখন পালাচ্ছে। পাঞ্জাবীরা পিছু হঠছে বুঝে আমরা আমাদের আক্রমণের মাত্রাটা আরো বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু দূরত্ব বাড়ার কারণে এবং আমাদের কাছে মূলত স্মল আর্মস (ছোট রেঞ্জের অস্ত্র) থাকার কারণে আমরা তাদের খুব একটা ক্ষতি করতে পারিনি। তাদের ক্ষয়ক্ষতি যা হবার সেটা সকাল থেকে বিকেল চারটা–এই সময়টুকুতেই হয়েছে। এরপর ওদের পালিয়ে যাবার পালা। আমরা বীর পাকিস্তানী সৈনিকদের সম্মানজনক পশ্চাদপসরণ লক্ষ্য করে জয় বাংলা ধ্বনিতে এলাকা প্রকম্পিত করে তুললাম। এরই মধ্যে শরণখোলার আবাল–বৃদ্ধ–বণিতা নেমে এসেছে ভেড়িবাঁধের ওপর। মুক্তিযোদ্ধাদের জয় বাংলা ধ্বনির সঙ্গে ওরাও কণ্ঠ মেলাল। শ্লোগান উঠল–বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর। শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিতচারপাশ।

আমরা শরণখোলা ও বগী অফিসে আমাদের অবস্থান আরো সুসংহত করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তবে এই যুদ্ধের পরে মঠবাড়িয়া থানা আক্রমণের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত করা হল। শরণখোলায় পাকিস্তানী গানবোটের সঙ্গে সেই তুমুল সম্মুখ যুদ্ধের পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম শরণখোলা ও বগী ফরেস্ট অফিসে আমাদের ঘাটি দুটোকে যথেষ্ট সংহত এবং শক্তিশালী করা হবে। কারণ গেরিলা যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে এ দুটো ঘাঁটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। পাকিস্তানীরা যদি সুন্দরবনে আমাদের বাহিনীকে ধ্বংস করতে চায় তাহলে এই দুটো ঘাটি আক্রমণ করাই তাদের প্রাথমিক এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে দাঁড়াবে। বলা যেতে পারে সুন্দরবনে মুক্তি বাহিনীর অবস্থানে এই শরণখোলা এবং বগী ছিল একেবারে প্রাণ কেন্দ্র স্বরূপ।

এজন্যই আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম কিছুটা। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঘাটি দুটোর সামনে নদীর পাড় ঘেঁযে অনেকগুলো বাংকার তৈরী করা হলো। এক বাংকার থেকে গোপন পথে আরেক বাংকারে যাওয়ার জন্য মাটি খুঁড়ে ট্রেঞ্চ বানানো হলো। এই প্রস্তুতি পরবর্তী সময়ে খুবই উপযোগী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের দোসর জামাত–শিবির–মুসলিম লীগের রাজাকার বাহিনী বহুবার শরণখোলা ও বগীতে আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু কোনবারই তারা সুবিধা করতে পারেনি। প্রত্যেকবার মুক্তিবাহিনী তাদের এমনভাবে নাজেহাল এবং নাস্তানাবুদ করেছে যে তাদেরকে লেজ গুটিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে। আমি অবশ্য এই সাফল্যের জন্য একশভাগ কৃতিত্ব শুধু মুক্তিবাহিনীকে দেবো না। এই এলাকার জনগণের সমর্থন এবং সক্রিয় ভূমিকা এর পেছনে জোরালো কারণ হিসেবে কাজ করেছে। প্রত্যেকটি ঘর আমাদের জন্য দুর্গ হিসেবে চব্বিশ ঘন্টা আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রতিটি মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে, যে কোন পরিশ্রমে, যে কোন আয়োজনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে এসেছে। সে এক অকল্পনীয় ব্যাপার। এই এলাকার মানুষ আমাদের ঘাঁটি এলাকাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য ঘরে ঘরে যে মনুষ্য দুর্গ গড়ে তুলেছিল সেটা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য।

মুল ঘাঁটি এলাকার কাজগুলো সমন্বিতভাবে এগোচ্ছিল। নতুন নতুন ঘাঁটি গড়ে তোলা, ঘাঁটি এলাকা সম্প্রসারণ এবং সমান্তরালভাবে যুদ্ধ পরিচালনার কাজও চলছিল প্রয়োজন মোতাবেক। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরে যাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দায়িত্ব দেয়া হলো তাদের সমন্বিত পরিশ্রমে কেন্দ্রটি আধুনিক সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমতুল্যতা অর্জন করেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল দায়িত্বপ্রাপ্তদের দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রমে। যদিও এক একটি ব্যাচকে বাস্তবতার চাপেই মাত্র দুই সপ্তাহের সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং দেয়া হতো, তবুও আমার দৃষ্টিতে সেই ট্রেনিংয়ের মান ছিল যথেষ্ট উন্নত। তাদের মধ্যে শৃংখলাবোধ সৃষ্টি করার জন্য আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। আমি নিজে আরাম–আয়েশ, ভোগ–বিলাস ত্যাগ করে, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একটা আদর্শ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি প্রাণপণে। এবং আমার বিশ্বাস সে কাজে আমি সফলও হয়েছি।

সেপ্টেম্বর মাসে নবম সেক্টরের আরেকজন সাবসেক্টর কমান্ডার মেজর মেহেদী আলী ইমাম বীর বিক্রম সুন্দরবনে, আমাদের ঘাটিতে আসেন। তার এলাকা ছিল পাথরঘাটা–মঠবাড়িয়া–বামনা। আমাদের সেন্ট্রিরা আমাকে খবর দিলো যে একটা ছোট্ট নৌকাতে করে মেজর মেহেদী সাহেব এসেছেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে অভিবাদন জানালাম। তিনি আমাদের ক্যাম্পে দু'দিন অবস্থান করলেন। তার আগমনের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য পাওয়া। আমি তাকে যথাসাধ্য সহায়তা করলাম। এল এম জি, অটোমেটিক রাইফেলস, এস, এম, জি, গ্রেনেডস, অ্যানার্গা গ্রেনেডস–এগুলো তাকে দেয়া হলো। তিনি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তার ঘাটি এলাকায় ফিরে গেলেন। পরবর্তীতে তার সঙ্গে তেমন একটা যোগাযোগ আর হয়নি। যুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে একবার দেখা হয়েছিল।

সম্মুখবর্তী অবস্থান, গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা, ঘাঁটি এলাকা পরিচালনা, বিকল্প ঘাটি এলাকা গড়ে তোলা–এসব কাজের দায়িত্বে আমি একশ আশিজন কমান্ডারকে নিয়োগ করলাম। কমান্ডারদের মধ্যে যারা মুখ্য ভুমিকা পালন করেছিল তারা হলেন সামসুল আলম তালুকদার, মোরেলগঞ্জ–রামপালের দায়িত্বে নিয়োজিত কবির আহমেদ মধু, হাবিলদার শহীদ আলাউদ্দিন, হাবিলদার সামশুল হক, হাবিলদার হাবিব, মোরেলগঞ্জের ছাত্রনেতা মোহাম্মদ আজিজ, মোহাম্মদ আবু, ক্যাপ্টেন আলতাফ (পরবর্তীতে সেনাবাহিনীতে ছিলেন), আবুল কালাম মহিউদ্দিন, এম, এ, আউয়াল, ডক্টর জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ আফজাল, হেমায়েত উদ্দিন বাদশা, বগীর নুরুল ইসলাম, মুজিবুল হক মজনু, শহীদ আসাদ, হেলাল, টিপু সুলতান, আমার ছোট ভাই কামাল, অ্যাডভোকেট সামশুল হক, হাবিবুর রহমান শিকদার, বাবুল গাজী, হাবিলদার হাই, সুবেদার লতিফ, মোহাম্মদ হাবিব, সুবেদার গাফফার, সুবেদার ফুলু, মোহাম্মদ শহীদ খন্দকার,বাবু পরিতোষ, শহীদুল আলম বাদল, হাবিলদার ফজলুল হক প্রমুখ।

সুন্দরবনে সাবসেক্টর হেডকোয়ার্টারে আমার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করতেন মোহাম্মদ হেলাল। এখন তিনি সেনাবাহিনীতে চাকরি করছেন একজন কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে। আর সুন্দরবনে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন জনাব সামসুল আলম তালুকদার। তিনি ছিলেন সব অর্থেই আমাদের বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড। হেলাল এবং শহীদ আসাদ ছিল পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওরা ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে আমার সাথে দেশে ফিরে এসেছিল। আমি ভারতে যাওয়ার পর যখন ফিরে আসি তখন অনেক মুক্তিযোদ্ধাই আমার সঙ্গে আসার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়। এদের মধ্যে ছিল ওরা দুজন। পরবর্তীতে কয়েকটা যুদ্ধে শহীদ আসাদ এবং হেলাল কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পর আমি হেলালকে আমার ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে নিয়োগ করি। সুন্দরবনের মূল ঘাটিতে আমার মাঝে মাঝে থাকা হতো। প্রায় সময়ই বিভিন্ন ঘাটিতে ঘুরে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা, যেসব ঘাটি এলাকায় আক্রমণ হয়েছে কিংবা সামনে হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেসব ঘাটিতে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ, কোন কোন যুদ্ধে নিজে অংশগ্রহণ–এগুলোই ছিল আমার মুল কাজ। সে হিসেবে মূল ঘাটিতে খুব বেশিদিন একনাগাড়ে অবস্থানের সুযোগ ভাগ্যে জুটতো না। তবু মাঝে মাঝে থাকা হতো। আমি থাকতাম বনবিভাগের সেই প্রমোদতরীটাতে যেটা আমরা যুদ্ধের সময় নিয়ে নিয়েছিলাম ভ্রাম্যমাণ হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। সেই তরীতে সামসুল আলম তালুকদার, হেলাল, হাবিলদার আলাউদ্দিন, বাবু পরিতোষসহ বেশ কয়েকজন সহযোদ্ধাও থাকতো আমার সঙ্গে। এছাড়াও আমাদের হেডকোয়ার্টার পাহারায় বেশ কয়েকজন স্পেশাল গার্ডও থাকতো, যারা ছিল বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। আমাদের ভাবনা ছিল, পাকিস্তানীরা আমাদের ঘাটি অঞ্চলে কমান্ডো হামলাও পরিচালনা করতে পারে যে কোন সময়। এজন্য সতর্কতা ছিল বেশি। নিজেরাও সব সময়ই সতর্ক অবস্থায়ই থাকতাম।

আমাদের সেকেন্ড ইন কমান্ড সামসুল আলম তালুকদার ছিলেন তৎকালীন ভাসানী ন্যাপের জেলা পর্যায়ের একজন নেতা। ছাত্র জীবনে তিনি বাগেরহাটের পিসি কলেজের নেতা ছিলেন। একাধিকবার তিনি নির্বাচিত হয়েছেন কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস এবং ভিপি হিসেবে। সামসুল আলম তালুকদার এই এলাকার একজন কৃষক নেতা হিসেবেও বরেণ্য। আইয়ুবের সময় যখন প্রথমবার লবণ পানি ঠেকানোর জন্য ভেড়িবাঁধ দেয়া হয় তখন জলাবদ্ধতায় সমগ্র অঞ্চলের ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তখনও স্লুইস গেটগুলি নির্মাণ করা হয়নি এবং পানি অপসারণ কিংবা ঢুকানোর কোন পদ্ধতিই সে সময় ছিল না। এজন্য সমগ্র এলাকায় পানি পচে যাওয়ায় সমস্ত ফসল নষ্ট করে দিচ্ছিল। তালুকদারের নেতৃত্বে তখন ছোট্ট একটা কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল এই এলাকায়। হাজার হাজার কৃষককে ঐক্যবদ্ধ করে তিনি ভেড়িবাঁধ কেটে দিয়েছিলেন। এই ঘটনার ফলশ্রুতিতে সামসুল আলম তালুকদারের ওপর হুলিয়া জারী করা হয়েছিল। সেই থেকে তিনি এই এলাকার কৃষকদের কাছে, খেটে খাওয়া মানুষদের কাছে একজন বরেণ্য নেতা হিসেবে পরিগণিত।

সুন্দরবনে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠার পেছনে সামসুল আলম তালুকদারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সংগঠনে, মুক্তিযুদ্ধে, শত্রুর মোকাবেলায়, আমাকে সহাযোগিতা করার ব্যাপারে তার ভূমিকা ছিল অদ্বিতীয়। আমরা দ'জনে এমন একটা সমন্বিত, যৌথ নেতৃত্বের অবস্থান সৃষ্টি করেছিলাম যেটা সব সময়ই অবিচ্ছেদ্য ছিল। যদিও তিনি ছিলেন বয়সে আমার চাইতে অনেক বড়, তবু যুদ্ধের কমান্ডার হিসেবে আমাকে মেনে নেয়া, আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন প্রশ্নের উর্ধে। নিবেদিত প্রাণ কর্মী এবং নিবেদিত প্রাণ নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন আদর্শ। একত্রে যুদ্ধ করেছি, কাজ করেছি, সংগ্রাম করেছি, মোকাবেলা

করেছি জঙ্গল যুদ্ধের সমস্ত প্রতিকূলতা। যতই দিন যাচ্ছে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ততই বাড়ছে। সুন্দরবনের নৈসর্গিক দৃশ্য এবং এর অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের মাঝে আমরা হাজার হাজার মায়ের হাজার হাজার সন্তান একসাথে লড়ছি মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার জন্য। ভবিষ্যৎ এক অর্থে অনিশ্চিত। কারণ আমরা জানি না এর শেষ পরিণতি কি। আমাদের মুক্তির লড়াই কবে সফল হবে কিছুই জানা নেই। এর মধ্যে তালুকদার ছিলেন আমার প্রতিটি কাজের নিত্য সঙ্গী। তিনি বুঝতেন যে আমার তারুণ্য, আমার জঙ্গলযুদ্ধের পরিকল্পনা, দুঃসাহসিকতা, রোমান্টিক অবস্থান এই সবকিছুর পেছনে কাজ করছে একটি তরুণ–তাজা প্রাণের এক ধরনের ভাবালু ভালোবাসা। এসব বুঝেই আমাকে সঙ্গ দিতেন তিনি আসনে–ব্যসনে। মাঝে মাঝে যখন আমাকে খুব পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত দেখতেন তখন রাতে বলতেন, 'স্যার, চলেন আমরা নৌকা ভ্রমণ করে আসি।' হেডকোয়ার্টার বোট থেকে আমরা ছোট্ট ডিঙ্গিতে করে হেলাল, আসাদ কিংবা শহীদ আলাউদ্দিন কিংবা হাবিব, আলী, খন্দকার শফিক, আবুল কালাম আজাদ, এম,এ আউয়াল –এদের মধ্যে থেকে দু'একজনকে নিয়ে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে ভ্রমণ করতে বেরোতাম। জ্যোৎস্না রাত। সমগ্র সুন্দরবন নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ। অবর্ণনীয় এক অনুভূতি। কাল বেঁচে থাকবো কিনা তাও জানিনা। যে কোন ভ্রমণই হতে পারে শেষ ভ্রমণ। যে কোন দেখাই হতে পারে শেষ দেখা। আমাদের দেশ, দেশের ভবিষ্যত, দেশের সম্পদ, আমরা কি করে আবার এই সোনার বাংলাকে গড়ে তুলবো, কতোটা আত্মত্যাগ আমাদের করতে হবে, কতোটা নিবেদিত প্রাণ আমাদের হতে হবে এই রোমান্টিক আলোচনাই সেইসব নৌকাভ্রমণের সময় আমাদের আলাপের বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়াতো। সামসুল আলম তালুকদার, আমি কিংবা অন্য কোন মুক্তিযোদ্ধা কখনো দেশাত্মবোধক গান, কখনো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গান, কখনো ভাটিয়ালী, নজরুল গীতি কিংবা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতাম। কখনো একা, কখনো সম্মিলিত কণ্ঠে। অবসর বিনোদন বলতে এটুকুই ছিল আমাদের সুন্দরবনের মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র অবলম্বন। খুব একটা সুযোগ পাওয়া যেতো না। তারপরেও হয়তো একটু কম ব্যস্ত দিনগুলোর আগের সন্ধ্যায় অথবা গভীর রাতে আমরা কজন সহযোদ্ধা, ভাই, বন্ধু মানসিক ভার থেকে হালকা হওয়ার জন্য এরকম ভ্রমণের সুযোগ পেতাম। প্রত্যেকবারই এধরনের কর্মসূচীর উদ্যোগ নিতেন সামসু তালুকদার। খন্ড যুদ্ধ শেষে আমরা যখন ভারাক্রান্ত, ক্লান্ত তখন আমাদেরকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করে তোলার জন্যই তিনি এটা করতেন এবং টনিক হিসেবে এটা ভাল কাজ দিতো। আজও আমার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে, সেই রাত গুলোর কথা মনে পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সুন্দরবনে আমাদের খাদ্য এবং রসদ জোগানো সবসময়ই বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ত। সৃষ্টি হতো সংকটময় অবস্থা। প্রতিদিন এবং প্রতি সপ্তাহে আমাদের বিপুল পরিমাণ খাবার এবং রসদের প্রয়োজন পড়ত স্বাভাবিক কারণেই। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে

এই সংকটটা আরো তীব্র আকার ধারণ করল। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা। জংগলে থাকতে গিয়ে পরিশ্রমও করতে হয় তাদেরকে প্রচুর। সেপ্টেম্বরের শেষে হিসেব করে দেখলাম, খুব শিগগীরই কিছু একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে অচিরেই না খেয়ে থাকার দশা হবে। এমন অবস্থায় আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাকে কাজে লাগালাম। ওদের ওপর দায়িত্ব পড়ল কাছাকাছি কোন সরকারী গুদামে খাদ্য মজুদ আছে কিনা সেটা খোঁজ নেওয়া। কয়েকদিনের মধ্যেই খবর এল যে, মঠবাড়িয়া থানার তুষখালি গুদামে প্রায় ছ'হাজার মণের মতো খাদ্য মজুদ রয়েছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম–এই ছয় হাজার মণ চাউল যে কোন প্রকারে নিয়ে আসব আমাদের ক্যাম্পে। এ সিদ্ধান্তের পেছনে আদর্শগত বিশ্লেষণটা এরকম ছিল যে, দেশের জন্য, মাতৃভূমির মুক্তির জন্য সংগ্রামে নিয়োজিত মুক্তিযোদ্ধাদের ভরণ–পোষণের জন্য সরকারী গুদামের খাদ্য হস্তগত করা কোন অবস্থাতেই অন্যায় নয়। এই খাবারতো সেই মাটি থেকে জন্মেছে যে মাটির স্বাধীনতার জন্য আমরা লড়ছিলাম। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সরকারী খাদ্য গুদামের মালামাল সুন্দরবনে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। সময়টা সেপ্টেম্বরের একেবারে শেষ অথবা অক্টোবরের প্রথমে।

তুষখালি গুদাম থেকে মজুদ খাদ্য নিয়ে আসতে হলে আমাদেরকে যে বেশ বড়সড় রকমের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কারণ তুষখালিতে শত্রুর অবস্থান বেশ শক্তিশালী। তুষখালি থেকে মাত্র ছয় মাইল দূরে হচ্ছে মঠবাড়িয়া থানা। সেখানেও শত্রুর অবস্থান এবং ঘাঁটি মোটামুটি শক্তিশালী। তুষখালি, মঠবাড়িয়া, সুন্দরবন, বগী, শরণখোলা–এই এলাকাগুলোতে প্রায়শই পাকিস্তানীরা গানবোট থেকে আমাদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করছে। এরকম যখন পরিস্থিতি সেক্ষেত্রে তুষখালি আক্রমণের জন্য আমাদের দিক থেকে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল জোর প্রস্তুতির। এই অপারেশনের জন্য একযোগে কয়েকটা কাজ করা দরকার। প্রথমত, তুষখালি গুদামে দখল করা ও সেখানে অবস্থিত জামাত–মুসলিম লীগের দালাল, রাজাকার–আল সামস্–এদেরকে নিরস্ত্র করা। দ্বিতীয়ত, মঠবাড়িয়া থানায় অবস্থানরত শত্রুদেরকে নিষ্ক্রিয় করা। তৃতীয়তঃ মঠবাড়িয়া ও তুষখালির মধ্যবর্তী স্থানে অ্যাম্বুশ বাসানো। যাতে কোনভাবেই মঠবাড়িয়ার শত্রুবাহিনী তুষখালির সঙ্গে অপারেশন চলাকালীন সংযোগ ঘটাতে না পারে। চতুর্থত, গুদাম দখল এবং মালামাল সুন্দরবনে নিরাপদে নিয়ে আসার পথে পাকিস্তানীদের গানবোট যেন বাধা দিতে না পারে সেজন্য কিছু কিছু জায়াগায় অ্যাম্বুশ বসানো। জায়গাগুলো হচ্ছে তুষখালি এবং পিরোজপুরের মাঝখানে তেলিখালি, চরখালি, চরদুয়ানী এবং সুপতিসহ সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সেলা নদী। এছাড়া ছোট্ট একটা অ্যাম্বুশ বসানো হলো বগী এবং শরণখোলা থানার মাঝখানে তাফালবাড়ী নামে একটি জায়গায়। হিসেব করে দেখা গেল, সর্বমোট আড়াই হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী পরিস্থিতি মূল্যায়নে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তুষখালি গুদাম আক্রমণ করতে গিয়ে পাকিস্তানী বাহিনী এবং রাজাকার–আলবদরদের সঙ্গে যে সর্বাত্মক যুদ্ধে আমরা জড়িয়ে পড়েছিলাম সেটা ছিল সুন্দরবনের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ।

আমরা তুষখালি ও মঠবাড়িয়া আক্রমণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করলাম। সামসুল আলম তালুকদার, বাদল, শহীদ আসাদ, হেলাল, আলী, ক্যাপ্টেন আলতাফ প্রমুখ সিনিয়র কমান্ডারদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিকল্পনার রূপরেখা ঠিক করা হলো। বগী ফরেস্ট অফিসের পেছনে একটা বিরাট মাঠ ছিল। জায়গাটা অবশ্য এখন নদীতে ভেঙ্গে গেছে। ফরেস্ট অফিসের পাশেই ছিল সেরিকালচার গবেষণাগার, বেশ সুন্দর একটা বাংলো। এখানে সুন্দরবনের ম্যাংগ্রোভ ফরেস্ট্রির ওপর গবেষণা চালানো হতো। এই

বাংলোর পেছনেই সেই বিরাট মাঠ। এই মাঠে আড়াই হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হলো। সামরিক ভাষায় এটাকে বলে ফলইন করানো।

মুক্তিযোদ্ধারা ফলইন হয়ে আছে। সামনে দন্ডায়মান সিনিয়র কমান্ডাররা। এখনো পর্যন্ত সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা জানেনা কোথায় বা কি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ গোপনীয়তার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ কোনভাবে যদি আক্রমণের আগেই শত্রুপক্ষের কাছে সেই সংবাদ পৌছে যায় তাহলে সমস্ত প্রস্তুতিই ভেস্তে যাবে। এ কারণেই গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। বাহিনী প্রস্তুত। সম্মুখ সমরে একটু পরেই ঝাপিয়ে পড়তে হবে তাদের। অথচ সিনিয়র কমান্ডাররা ছাড়া কেউই জানে না কোথায় আমরা আক্রমণ পরিচালনা করতে যাচ্ছি। এই সংবাদটা এখন আমার কাছ থেকে সমগ্র বাহিনী শুনবে। কর্দমাক্ত মাঠে সারিবদ্ধ দাঁড়ানো মুক্তিযোদ্ধারা। আক্রমণ, অ্যাম্বুশ, গানবোটের হামলা ঠেকানো ইত্যাদির জন্য আলাদা আলাদাভাবে গ্রুপ ভাগ করেই মুক্তিযোদ্ধাদের দাঁড় করানো হয়েছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে আমি সেই মাঠে প্রবেশ করলাম। সবাইকে সামরিক কায়দায় অ্যাটেনশন পজিশনে রেখে সেকেন্ড–ইন–কমান্ড সামসুল আলম তালুকদার এসে চূড়ান্ত প্রস্তুতির রিপোর্ট জানাল। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে পাশে সরে আসতে বললাম। তিনি পাশে এসে দাঁড়ালেন।

এবার আমি বাহিনীর উদ্দেশে তাদের করণীয় কর্তব্য এবং উদ্দেশ্য খোলসা করে বললাম। এরপর আমি প্রত্যেকটি যুদ্ধে যাওয়ার আগে যেরকম বলি সেভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের জিজ্ঞেস করলাম,'আপনাদের কারো কিছু দরকার আছে?' কারো টাকা পয়সা প্রয়োজন কিনা, ঘড়ি দরকার কিংবা কাপড় চোপড় প্রয়োজন কিনা এসব জানতে চাইলাম। এই জিজ্ঞাসার কারণ হলো, আমার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল কোন অবস্থাতেই জনগণের কাছ থেকে কিছু নেয়া যাবে না। জনগণ যদি আমাদেরকে কিছু দেয় সেটা একটা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু কোন মুক্তিযোদ্ধা কোন অবস্থাতেই জনগণের কাছ থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না। আমরা জনগণের সেবক, জনগণের সৈনিক। কাজেই যদি কারো কিছু প্রয়োজন থাকে তাহলে সেটা আমাকে জানাতে হবে। এবং আমি সেটা যথাসাধ্য পূরণ করব। যাহোক এই প্রসঙ্গের পরে মুক্তিযোদ্ধাদের বললাম, 'আপনাদের কারো কোন প্রশ্ন থাকলে আমার কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমরা এখন যুদ্ধ যাত্রা করছি।' একজন মুক্তিযোদ্ধা হাত তুলে বলল, 'স্যার, আমার কিছু বলার আছে'।

তাকে বলার অনুমতি দিলাম। সে বলল, 'আমরা চাই এ যুদ্ধে আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন না।' এ বক্তব্য এর আগেও বহুবার তারা পেশ করেছে। যুদ্ধের শুরুতে কিংবা যুদ্ধ চলাকালীন কিংবা ঘাটি এলাকায় বসে। অনেক মুক্তিযোদ্ধা এবং সিনিয়র কমান্ডাররা প্রায়শই আমাকে এই অনুরোধ জানাত। কারণ ছিল মূলত দুটি। প্রথমত, যুদ্ধের মাঠে আমি খুব আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতাম। মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে এগিয়ে যেতাম বারবার। দ্বিতীয়ত, এসব যুদ্ধ দেখে সিনিয়র কমান্ডাররা ভয় পেত। ভাবত, যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কোন দুর্ঘটনা ঘটেই যায় তাহলে সুন্দরবনে মুক্তিযোদ্ধাদের এতবড় বাহিনীর কি হবে? এই আশংকা তাদেরকে ভীত করে তুলেছিল। এসব কারণেই তারা চাইত আমি যেন সব যুদ্ধে সশরীরে উপস্থিত না হই। কিন্তু আমার আবার মনের খোরাকটা ঠিক এর উল্টো। বড় একটা যুদ্ধ হতে যাচ্ছে অথচ আমি থাকব না, যুদ্ধ পরিচালনা করব না, এটা কল্পনাও করতে পারতাম না। এছাড়া অন্য কারো ওপর দায়িত্ব দিলে মনটাও হয়ে থাকত দুর্বল। কারণ প্রতিটি যুদ্ধেরই রয়েছে আলাদা আলাদা কৌশল। মাথা খাটানোরও প্রয়োজন পড়ে। এ সমস্ত ব্যাপারে আমি নিজের ওপর যতোটা আস্থাশীল অন্যের ওপর ততোটা কখনোই হতে পারিনি। হওয়া সম্ভবও নয়। সেই কারণেই প্রায় সমস্ত যুদ্ধে আমি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছি। সিনিয়র কমান্ডাররা চাইত আমি যেন

সব যুদ্ধেই সরাসরি অংশগ্রহণ না করি। তবে তাদের সেসব ওজর– আপত্তি কখনোই কানে তুলিনি। মুক্তিযোদ্ধাটি যখন দাবী তুলল, আমার যুদ্ধে যাওয়া চলবে না তখন কৌশলগত ভাবে একটা ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দেয়া ছাড়া আমার আর কোন পথ নেই। তাই করলাম। ভারিক্কী স্বরে বললাম, 'যুদ্ধে যাওয়ার ঠিক আগে এসব কথা বা আলোচনার সুযোগ নেই। পরবর্তীতে এটা নিয়ে আলাপ করা যাবে'।

ধমক দিলাম, কিন্তু কাজ কিছু হয়েছে বলে মনে হলো না। সৈনিকটি যে আপত্তি তুলেছে এ ব্যাপারে যোদ্ধাদের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত একটি ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল বলে মনে হলো। আমার গম্ভীর উত্তর শুনেও ছেলেটি দমে গেল না। প্রতি উত্তরে বলল, 'স্যার, প্রতিটি যুদ্ধের আগেই আমরা এই কথাটা বলি। আপনি ধমক দিয়ে আমাদের থামিয়ে দেন। পরে আলোচনা করবেন বলেন। কিন্তু ঠিকই আবার পরের যুদ্ধেই অংশ নেন। একইভাবে ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ পরিচালানা করতে থাকেন। যদি আজকে আপনি যুদ্ধ করতে যান তাহলে আমরা আপনার সঙ্গে যুদ্ধে যাব না।' এই কথাগুলো বলে সেই মুক্তিযোদ্ধাটি নুয়ে তার রাইফেল গ্রাউন্ড আর্মস করে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং কমান্ডাররাও মাটিতে অস্ত্র নামিয়ে দিয়ে তার পেছনে পেছনে দাঁড়িয়ে গেল।

বুঝলাম, ভালবাসার একটি বিদ্রোহ ঘটে গেল। নিরুপায় অবস্থা আমার। বুঝতে পারছি, পুরো ঘটনার পেছনে সিনিয়র কমান্ডারদের মদদ রয়েছে। বিশেষ করে তালুকদার যে এই ঘটনার প্রধান পান্ডা তা আমার কাছে পরিষ্কার। যাহোক, এত মুক্তিযোদ্ধার ভালবাসাকে ঠেকাই কিভাবে? পাশে দাঁড়ানো তালুকদারের দিকে তাকিয়ে যখন তাকে বোঝাতে চাইলাম যে আপনিই এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতা তখন তিনি আর আমার দিকে তাকাচ্ছেন না। অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে রাখলেন। সকলেই নিরব এবং দৃঢ়চিত্ত। তারা যেন শপথ করেছে আজকে আমাকে কিছুতেই যুদ্ধে যেতে দেবে না। আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, আজকে যে যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে সেটা আমাদের যাবতীয় যুদ্ধের মধ্যে ব্যাপকতম এবং এর প্রতিক্রিয়া হবে বেশ মারাত্মক। সারাদেশের মুক্তিযুদ্ধেই এটা একটা ভূমিকা রাখবে। এবং আমার ধারণা, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এই যুদ্ধের একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এসব বোঝানোর অবকাশ কিংবা সময়, কিছুই আমার নেই। খুব অসহায়ভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হলো।

শেষ পর্যন্ত সিনিয়র কমান্ডারদের ডেকে আবার আমি আলোচনায় বসলাম। ওরাও সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের দাবীর ব্যাপারে একজোট ও দৃঢ়চিত্ত। ওরা বলল, স্যার আপনি কেন আমাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছেন না? আমরা এখন লড়াই করতে শিখেছি। গত কয়েকমাস আপনার সঙ্গে থেকে লড়াই করে করে আমরা এখন যুদ্ধ করতে জানি। এটা আপনি বিশ্বাস করতে চান না কেন? কথাটা যদিও অনেকাংশেই ঠিক, তবুও নিজের ওপর যে বিশ্বাস সেটা কি আরেক জনের ওপর স্থাপন করা যায়? এই সংশয়, এই মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কি আর করা। শেষে সামসুল আলম তালুকদারকে এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কমান্ডার নিযুক্ত করা হলো। আমি একটু ভারাক্রান্ত এবং উপায়হীন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধারা সবাই হাজির। কিছুক্ষণ পর রাতের খাবার পরিবেশন করা হলো। সবার সঙ্গে বসে খাবার খেলাম। এবার রওনা দেয়ার পালা। প্রায় তিরিশটা নৌকায় করে মুক্তিযোদ্ধারা গন্তব্যের দিকে যাত্রা করল। রাত সাড়ে দশটা। সুন্দরবনের গভীর অরণ্য বাংলা মায়ের হাজারো সন্তানকে তার কোলে নিয়ে ঘুমানোর আয়োজন করছে। হাজারো যোদ্ধার মধ্যে নির্বাচিত আড়াই হাজার সন্তান রওনা দিয়েছে লক্ষ্য সাধনে। জানিনা সবাই ফিরে আসবে কিনা। জানিনা পরদিন সকালে বিজয়ীর বেশে তারা ফিরে আসতে পারবে কিনা। আমি

সেই যুদ্ধে অনুপস্থিত। কাজেই অনেক কিছুই আমি জানিনা। অনেক কিছুই জানব না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বিজয়ের বার্তা না পাব। তবুও সেই বগীর সম্মুখ ঘাঁটি থেকে আড়াই হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে বিদায় অভিবাদন জানালাম। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। গেরিলাদের আরেকটি সুন্দর, কৌশলগত অবস্থান হলো রাত্রের অন্ধকার। সেই অন্ধকারে তারা হারিয়ে গেল।

আমি নিশ্চুপ, নির্বাক হয়ে বসে থাকলাম বগীর ফরেস্ট অফিসের সামনে সুন্দর করে সাজানো একটি মঞ্চে, নদী এবং খালের সংযোগস্থলে। সেই মঞ্চের ওপর বসে থাকলাম অনেকক্ষণ। সারারাত ঘুম নেই। চোখের পাতা এক করতে পারছি না। জোর করে চোখ বুজলেও ঘুম আসছে না। বগী, শরণখোলা অঞ্চলে আরো প্রায় দু'হাজার মুক্তিযোদ্ধার অবস্থান। তারা সকলেই যেন নির্বাক হয়ে আছে। উত্তেজনা, অনিশ্চয়তা, সাফল্যের এবং বিজয়ের আশা তাদেরকেও করে তুলেছে নির্ঘুম। আমাদের খুব প্রয়োজন খাদ্য। এই অপারেশন যদি কোনভাবে ব্যর্থ হয় তা হলে দেখা দেবে অস্তিত্বের সংকট। এই আশংকাও ঘুম কেড়ে নেয়ার অন্যতম কারণ। সবকিছু মিলিয়ে আমরা নিশ্চল, নিশ্চুপ।

আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী সিনিয়র কমান্ডাররা তাদের কর্তব্য পালন করলেন। ক্যাপ্টেন আলতাফ, শহীদুল আলম বাদল, সুবেদার গাফফার–এদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল মঠবাড়িয়া থানা আক্রমণ করার, কিন্তু দখল করার প্রয়োজন নেই। মঠবাড়িয়া থানার পুলিশ রাজাকার, আলবদর তথা স্বাধীনতা রিরোধী শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়াই তাদের উদ্দেশ্য, যেন তারা তুষখালিতে অবস্থানরত রাজাকার আলবদরদের সাহায্য করার জন্য এগোতে না পারে। তারা ঠিকমতোই তাদের দায়িত্ব পালন করল। শহীদুল আলম বাদলের ওপর দায়িত্ব ছিল মঠবাড়িয়া ও তুষখালির মাঝামাঝি জায়গায় অ্যাম্বুশ বসানো। সেটাও তিনি সুষ্ঠুভাবে পালনকরলেন।

সামসুল আলম তালুকদার, শহীদ আসাদ, হেলালসহ অন্যান্য কমান্ডাররা দায়িত্বে আছে মূল আক্রমণ পরিচালনা করার। তুষখালিতে সাড়ে তিনশত রাজাকার আলবদরের সশস্ত্র অবস্থান ছিল। আমাদের যে বাহিনী তুষখালি আক্রমণ পরিচালনা করল তারা সংখ্যায় প্রায় আটশতের মতো। রাত তিনটার সময় সামসুল আলম তালুকদারের নেতৃত্বে আমাদের বাহিনী তুষখালিতে অবস্থিত রাজাকার–আলবদরদের ক্যাম্পে আক্রমণ করে বসল। সামসুল আলম তালুকদার আমার সঙ্গে অনেকগুলি যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশল তিনি জানতেন। কিন্তু সেসব চেনা পথে না গিয়ে তুষখালিতে তিনি এক অভিনব ও বিপজ্জনক কৌশল অবলম্বন করলেন। মুক্তিবাহিনী শত্রুর ক্যাম্প ঘিরে ফেলে এলএমজির ব্রাশফায়ার চালাল। কিছুক্ষণ পরেই ব্রাশ ফায়ার বন্ধ করে মেগাফোন দিয়ে ঘোষণা দেয়া হলো, সুন্দরবনের মুক্তিযোদ্ধারা এসে গেছে। তোমরা দাঁড়িয়ে আছ আমাদের অস্ত্রের মুখে। এই ঘোষণা দিয়েই সামসুল আলম তালুকদার আসাদ ও হেলালকে সঙ্গে নিয়ে স্টেনগান দিয়ে ব্রাশফায়ার করতে করতে রাজাকার–আলবদরদের ব্যারাকের মধ্যে ঢুকে পড়েন। তৎক্ষণাৎ প্রায় সাড়ে তিনশ রাজাকার অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করল। সাফল্য যদিও অর্জিত হয়েছে,কিন্তু আমার মনে হয়েছে কৌশলটা ছিল খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এ কারণেই পরবর্তীতে তালুকদারকে আমি মৃদু গালমন্দও করেছি। এ ধরনের ঝুঁকি নেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে সাফল্যটাই বড় কথা এবং এই রক্তপাতহীন সাফল্যের দাবীদার তালুকদার সাহেব নিজেই। সুতরাং খুব বেশি বকাঝকা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। যাহোক, সাড়ে তিনশ রাইফেল এবং হাজার হাজার গুলীসহ রাজাকার আলবদররা সারেন্ডার করল। এদেরকে ব্যারাক থেকে বাইরে এনে বন্দী করা হলো। পুরো কাজটা করতে সময় লাগল প্রায় ঘন্টা

দেড়েক, যদিও মূল যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে মাত্র তিন মিনিটের মাথায়। ভোর হয়ে আসছে। গোলাগুলীর আওয়াজে তুষখালি এবং আশেপাশের গ্রামগুলোর অধিবাসীরা উঠে পড়েছে বিছানা ছেড়ে। তারা এক পর্যায়ে জয় বাংলা ধ্বনি দিতে দিতে তুষখালি বন্দরে এসে হাজির। তারা বুঝতে পেরেছিল যে আমরা তুষখালি গুদামের খাবার নেয়ার জন্য এই অভিযান পরিচালনা করেছি। স্থানীয় জনতা মুক্তিযোদ্ধাদের বলল, 'আপনাদের কিছুই করতে হবে না। আমরা সবকিছু করে দিচ্ছি।'

খাদ্য গুদামে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল গুদামের ওসিএলএসডি সেই গোলাগুলীর মধ্যে ভেগে পড়েছে। তাকে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেল না। চাবিটাবি নিয়ে সে পালিয়ে গেছে। উপায়ন্তর না পেয়ে জনতা সেই খাদ্য গুদামের দরজা ভেঙ্গে ফেলে ছয় হাজার মণ চাল ঘন্টা দুইয়ের মধ্যে নৌকা বোঝাই করে ফেলল। শহীদুল আলম বাদল যেখানে অ্যাম্বুশ করেছিল সেখানে আলবদর–রাজাকারদের একটা গ্রুপের সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হলো। আহত হয়েছিল দুজন। মঠবাড়িয়া থানায় মুক্তিবাহিনীর যে গ্রুপ আক্রমণ করেছিল তারাও সফল। এ কারণেই থানা থেকে শত্রুবাহিনী তুষখালিতে কাউকে পাঠাতে পারিনি।

সকাল হয়ে গেছে। তুষখালির উৎসাহী যুবকরা মুক্তিবাহিনীর মধ্যে আমাকে খুঁজছে। তাদের ধারণা ছিল যে আমি ছদ্মবেশে মুক্তিবাহিনীর মধ্যে অবস্থান করছি। এ জন্যই আমাকে দেখার জন্য তারা হন্যে হয়ে উঠেছিল। তুষখালির চায়ের দোকানগুলো এবং বন্দরের বিভিন্ন এলাকায় আমাকে খুঁজতে লাগল ওরা। এক পর্যায়ে আমাকে খুঁজে না পেয়ে তালুকদারকে তারা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ফেলল। সামসুল আলম তালুকদারের প্রতি তাদের বক্তব্য, 'ক্যাপ্টেন জিয়া সাহেব এসেছে, কিন্তু আপনি বলছেন না। আমরা শুনেছি এই বাহিনীর মধ্যে আছেন।' শেষ পর্যন্ত জনসভার মতো আয়োজন করে তালুকদারকে বলতে হলো যে, 'জিয়া সাহেব আসেননি। আমরা এসেছি। তিনি সুন্দরবনের ক্যাম্পে আছেন। আপনারা যারা সন্দেহ করছেন তিনি ছদ্মবেশে আমাদের সঙ্গেই আছেন তাদের ধরণা ঠিক নয়।' সেলা নদী এবং তুষখালির সম্মুখভাগে তেলিখালি ও চরখালিতে নিযুক্ত আমাদের অ্যাম্বুশ পার্টিও সফল হলো। এখান দিয়ে তুষখালির দিকে গানবোট এগোচ্ছিল। কিন্তু অ্যাম্বুশ পার্টির প্রতিরোধের মুখে গানবোট পিছু হঠতে বাধ্য হয়। ফলে কোনরকম বাধা ছাড়াই আমাদের মূল অপারেশনটা এগিয়ে গেছে। এদিকে আমি বগীর সম্মুখ ঘাঁটিতে অস্থির সময় কাটাচ্ছি। বিকেলবেলা দেখা গেল তিরিশ চল্লিশটা নৌকার একটা বহর আস্তে আস্তে সুন্দরবনের দিকে এগিয়ে আসছে। প্রায় ছয় কি সাত মাইল দূর থেকে আমি এই দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে বুঝলাম যে আমাদের অভিযান সফল হয়েছে। নিশ্চয়ই মুক্তিযোদ্ধারা সাফল্য নিয়ে ঘরে ফিরছে। ঠিক সন্ধ্যায় নৌকাগুলো এসে বগী অফিসের সামনে ভিড়ল। ছয় হাজার মণ চাল, সাড়ে তিনশ রাইফেল, গোলা–বারুদ এই হচ্ছে আমাদের এই যুদ্ধের উপার্জন। সমগ্র সুন্দরবনে আনন্দ–উচ্ছ্বাস শুরু হয়ে গেল। বগী, শরনখোলা–এ অঞ্চলের সমগ্র জনতা আমাদের আনন্দের অংশীদার।

সেদিন সন্ধ্যায় শরণখোলা ফরেস্ট অফিসে এসে হাজির হলেন সামসুল আলম তালুকদারের স্ত্রী তার নবজাতক সন্তানসহ। তার সঙ্গে আরো ছিলেন পটুয়াখালীর ছাত্রলীগ নেতা সরদার রশিদ এবং সরদার রশিদের দুই বোন। এরা যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত সুন্দরবনেই ছিলেন। এদেরকে কিছু প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। অবশ্য যুদ্ধের ময়দানে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ তাদেরকে করতে হয়নি। যদিও যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ ছিল প্রচন্ড।

আমরা চালের নৌকাগুলো আমাদের ঘাঁটি এলাকায় পাঠিয়ে দিলাম। অন্যান্য কাজকর্মও এগিয়ে চলছে। আমি কিছুটা আনমনা। সরকারী গুদাম থেকে ছয় হাজার মণ চাল নিয়ে আসা, সাড়ে তিনশ রাইলেফসহ অজস্র গোলাবারুদ দখল এবং পাকিস্তানী গানবোটের ওপর সফল আক্রমণ এ অঞ্চলের মুক্তিবাহিনীকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তারা যে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে সেটা অন্য অনেকের মতো পাকিস্তানীদেরও বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। তারা যে মুক্তিবাহিনীর ওপর ভয়াবহ একটি প্রতি আক্রমণ করবেই সে ব্যাপারে আমি ছিলাম নিশ্চিত। অবশ্য বাস্তবে সেই আক্রমণ যতোটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল তা আমিও কল্পনা করতে পারিনি। যাহোক এসব চিন্তায় মনটা ছিল বিক্ষিপ্ত। পাকিস্তানীদের সম্ভাব্য পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করা এবুং সাবধানে থাকার জন্য আমি সমগ্র এলাকায় সতর্কীকরণ নির্দেশ পাঠালাম। আমার আশংকা বাস্তবে পরিণত হলো ঠিক দুদিন পর। ভোররাতে পাকিস্তানীরা আমাদের ওপর হামলা চালাল। প্রায় একশত মোটর লঞ্চ রিকুইজিশন করে পশ্চিম পাকিস্তানী মিলিশিয়া বাহিনী বেলুচ রেজিমেন্টের দুটো কোম্পানী এবং আমাদের দেশের জামাত মুসলিম লীগের জারজ সন্তানরা, রাজাকার–আলবদর–আলশামসরা হামলা চালাল। সঙ্গে ছয়টি পাকিস্তানী গানবোটও রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। পাকিস্তানীরা মিরেজ ফাইটারের মাধ্যমে বিমান আক্রমণেরও সূচনা করল। এই ভয়াবহ আক্রমণের মুখে প্রথমটায় আমরা বেশ সংকটজনক অবস্থায় পড়ে গেলাম। পাকিস্তানীর প্রবল বিক্রমে যাকে বলে সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়েছে।

পটুয়াখালির বেলুচ রেজিমেন্টের কমান্ডারের মূল নেতৃত্বে মেজর নাদের পারভেজ প্রত্যক্ষভাবে এই আক্রমণ পরিচালনা করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। আমি যখন পাকিস্তানী মিলিটারী অ্যাকাডেমিতে একজন ক্যাডেট হিসেবে প্রশিক্ষণ লাভ করেছি তখন এই মেজর নাদের পারভেজ সেখানে একজন ইন্সট্রাকটর বা শিক্ষক হিসেবে কাজ করতেন। অর্থাৎ ৭১–এর সেই সুন্দরবন আক্রমণের বিষয়টা দাঁড়াল গিয়ে ওস্তাদ–শিষ্যের লড়াইয়ে।

মেজর নাদের পারভেজের অধীনে বাগরহাট, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরিশাল ও পটুয়াখালীতে অবস্থানরত পাকিস্তানী সৈনিক, দেশীয় আলবদর, আলশামস, রাজাকার, পাকিস্তানী নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী একত্রিত হয়ে সমগ্র সুন্দরবন ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আমাদের ঘাঁটিগুলোতে আক্রমণ করে বসল। বড় মাছুয়া, চরদোয়ানি, সুপতি তাফালবাড়ি, বগী, শরণখোলা, জিউধরা–এই অঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটিগুলি শত্রুর প্রচন্ড হামলার মুখে পড়ল। প্রথমদিকে হিমসিম খাওয়ার মতো অবস্থা আমাদের। যদি পাকিস্তানীরা বিমান ব্যবহার না করত তাহলে হয়ত আমাদের এতটা অসুবিধা হতো না। কিন্তু পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর ফরাসী নির্মিত মিরেজ যুদ্ধ বিমানগুলো আমাদেরকে বেশ বেকায়দায় ফেলেছিল।

চারিদিকে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। মুক্তিবাহিনীর কোন কোন অংশ বেশ বিভ্রান্ত অবস্থার মধ্যে। এমন অবস্থায় আমি উপস্থিত সিনিয়র কমান্ডারদের নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে আলোচনায় বসলাম–আমাদের করণীয় কি? কেউ কেউ আমাকে পরামর্শ দিলেন যে আমাদের পশ্চাদপসারণ করা উচিত। আমি এ ধারণা প্রত্যাখ্যান করলাম। সিদ্ধান্ত হলো যত অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব প্রত্যেকটি সম্মুখ ঘাঁটি আমাকে পরিদর্শনন করতে হবে। সে সমস্ত ঘাটিতে বেশি করে মুক্তিযোদ্ধা পাঠানো এবং আমাদের সমগ্র ঘাঁটি এলাকায় অপ্রতিরোধ্য একটা অবস্থান নিতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজে নেমে পড়লাম আমরা।

এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে আমি দৌড়ে বেড়াচ্ছি। ঘাঁটি এলাকাগুলোতে পৌঁছাচ্ছি। সেখানে কমান্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ করে, যুদ্ধের কৌশল বুঝিয়ে দিয়ে, অবস্থান সংহত করার কথা বলে এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে নতুন মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগ করার মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি

করে আমরা যুদ্ধ চালিয়ে গেলাম। যুদ্ধ চলছে। রাতের বেলা খুব ঝুঁকি নিয়ে ক্যাপ্টেন আলতাফ ও শহীদুল আলম বাদল ছোট্ট একটা ডিঙ্গিতে করে বলেশ্বর নদী অতিক্রম করে আমার কাছে এসে বড় মাছুয়া এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে যুদ্ধের অবস্থানটা জানিয়ে গেল। সেখানেও পাঞ্জাবী ও রাজাকার–আলবদররা মিলিয়ে সংখ্যায় প্রায় একহাজারের ওপরে বাহিনী অবতরণ করেছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের ওপর মর্টার হামলা চালাচ্ছে।
আমি একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, পাকিস্তানীদের এইসব হামলার জন্য অবশ্যই খেসারত দিতে হবে। মুক্তিবাহিনী বিনা চ্যালেঞ্জ কিছুই ছেড়ে দেবে না। পাল্টা আঘাত করার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে এবং পিছু হঠার জন্য আমরা যুদ্ধ করতে নামিনি। যতো খেসারতই আমাদের দিতে হউক না কেন আমরা তা দিতে প্রস্তুত। আমাদের প্রত্যেকটি সম্মুখবর্তী ঘাঁটি আমাকে পেয়ে এবং আমার কাছ থেকে যুদ্ধের কৌশলগুলি বুঝে নিয়ে প্রচন্ড সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেল। কোন অবস্থান থেকেই পাকিস্তানীরা আমাদের হটাতে পারেনি। তবে বলেশ্বরের পূর্বপ্রান্তে বড়মাছুয়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা প্রাথমিকভাবে পাকিস্তানীদের মর্টার আক্রমণের মুখে টিকতে পারেনি। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন গ্রামে অবস্থান নেয়।
সুন্দরবনের সমস্ত ঘাঁটি আমাদের আয়ত্বের মধ্যেই রইল। পাকিস্তানীরা বারবার লঞ্চ থেকে নামার চেষ্টা করেছে, গানবোটের কভারিং ফায়ার এবং বিমানের কভারিং ফায়ার থাকা সত্ত্বেও তাদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি একবারও। তারা আমাদের ঘাঁটি এলাকা থেকে প্রায় একমাইল দূরে নামতে সক্ষম হয়েছিল। সেখানে নেমে তারা গ্রাম জ্বালিয়েছে এবং নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর অত্যাচার চালিয়েছে, নারী ধর্ষণ করেছে।
দিনের পর দিন এই যুদ্ধটা এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের জন্য ব্যাপারটা ছিল বড় একটা চ্যালেঞ্জ। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্র। নিয়মিত সেনাবাহিনীর লোক, তৎকালীন ইপিআর, এয়ারফোর্স, নেভীর কিছু সৈনিকও আমাদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা অধিকংশই ছিল ছাত্র, কৃষকের সন্তান, শ্রমিক কিংবা নৌকার মাঝি এরকম শ্রেণীর। এরা সবচেয়ে বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিল পাকিস্তানীদের বিমান আক্রমণের মুখে। একটি ঘাটি এলাকায় আমাদের কমান্ডার ছিল খন্দকার শহীদ। তার সঙ্গে ছিল এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা। প্রথমে যখন পাকিস্তানী গানবোটের সঙ্গে তাদের সম্মুখ সমর হচ্ছে তখন তারা ভালই লড়ছিল। কিন্তু গানবোট থেকে কল দিয়ে যখন বিমান আক্রমণ করা হলো তখন সমগ্র প্লাটুনটি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তারা প্রচন্ড হতাশ হয়ে পড়ল। 'বিমানু হামলার মুখে আমরা যুদ্ধ করে টিকতেতো পারবই না' এমন একটা ভাবনার মধ্যে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। যখন দেখা গেল বিমান হামলা বার বার হচ্ছে কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি কিছুই হলোনা তখন তারা আবার সাহস ফিরে পেল। সমস্ত শক্তি জড়ো করে শত্রুর ওপর পুনরায় আঘাত হানতে শুরু করল। এই ঘটনাটা বললাম এজন্যেই যে, মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি ঘটনাতেই মুক্তিযোদ্ধারা যে সাহস আর প্রত্যয় নিয়ে প্রথমেই ঝাপিয়ে পড়েছে তা সত্য নয় এটা পাঠকদের জানানোর জন্য। শত্রুর আক্রমণের মুখে কখনো আমাদের দুর্বল অবস্থান ছিল এটা অস্বীকার করার বিষয় নয়। আসলে প্রতিটি যুদ্ধেই জয় পরাজয় থাকে। যে পক্ষ জয়ী হয় তারা যে একেবারে সর্বক্ষেত্রেই জয়লাভ করে, সর্বক্ষেত্রেই চরম বিক্রম প্রদর্শন করে এমন নয়। কোন কোন সময় সাহসের অভাব দেখা যায় এবং সেটাই স্বাভাবিক।
একইভাবে বড়মাছুয়া এবং বগীর সম্মুখবর্তী ঘাঁটিতে প্রচন্ড লড়াই হলো। বড়মাছুয়ার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিলেন সুবেদার গাফফার। সুবেদার গাফফার এর আগেই অনেকগুলো যুদ্ধে চমৎকার নেতৃত্ব প্রদর্শন করেছে। প্রচন্ড সাহসের পরিচয় সে দিয়েছে। বড়মাছুয়ায়

পাকিস্তানীদের একটি গ্রুপ কাঁচা রাস্তা ধরে এগোচ্ছিল যেখানে ১৪/১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে সুবেদার গাফফার অবস্থান করছিল। অবস্থাটা এমন যে, চারিদিকে ধানক্ষেত। বিরাট মাঠ। মাঝখানে নিঃসঙ্গ একটা বাড়ি। সেই বাড়িতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছে। যখন তারা দেখতে পেল যে প্রায় চার/পাঁচশ সৈনিক তাদের অবস্থানের দিকে এগিয়ে আসছে তখন তারা বেশ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। ঘাবড়ে গেল। তবুও সুবেদার গাফফারের সফল নেতৃত্বের কারণে এই ১৪/১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলো। বাড়ির ভেতরে একটা পুকুর ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা পুকুরের চারপাশে পজিশন নিয়ে নিলো। পাকিস্তানীরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। সুবেদার গাফফার মুক্তিযোদ্ধাদের বলল, 'পাকিস্তানীরা সংখ্যায় অনেক বেশি। এদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এখন পারা সম্ভব নয়। এদের মর্টার কভারিং রয়েছে। কাজেই তোমরা কেউ ভুলেও গুলী করো না। চুপচাপ বসে থাকো।' কিন্তু বিধি বাম। ঘটনা ঘটল অন্যরকম। অসতর্ক মুহূর্তে কোন এক মুক্তিযোদ্ধার আঙ্গুল চেপে বসল ট্রিগারে। গর্জে উঠল অস্ত্র। মিস ফায়ার। পাকিস্তানীরা বুঝতে পারল, মাঠের মাঝখানে ঐ বাড়িটিতে মুক্তিযোদ্ধারা আছে। ঐ বাড়ি থেকেই গুলীর শব্দটা এসেছে। পাকিস্তানীরা মাত্র তিন/চারশ গজ দূরবর্তী কাঁচা রাস্তায় অবস্থান করছে। অসতর্ক মুক্তিযোদ্ধার অস্ত্র গর্জে ওঠা মাত্র তারা লাফিয়ে লাফিয়ে রাস্তা থেকে বাড়ির বিপরীত দিকে নেমে অবস্থান নিলো। তার বুঝতে চাইল মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান কতোটা শক্তিশালী, সংখ্যায় কত ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশ্য বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও তারা কিছুই বুঝতে পারল না। শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত নিলো, বাড়িটার ওপর আক্রমণ চালাবে। মিনিট খানেক সময়ের মধ্যেই পাকিস্তানীরা ইয়া আলী বলে রাস্তা ছেড়ে ঝাপিয়ে পড়ল ধানক্ষেতের মধ্যে। উদ্দেশ্য, বাড়িটাকে তছনছ করা এবং সেখানে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করা। কিন্তু ওদের বিধি আরও বাম। ওরা দশ/বিশ গজ এগিয়ে আর এগোনোর শক্তি হারিয়ে ফেলল। ধানক্ষেতের এক হাটু কাদার মধ্যে তাদের বুটগুলো আটকে গেল। এই অবস্থার সুযোগ নিতে মুক্তিযোদ্ধারা ভুল করেনি। সুবেদার গাফফার তার হাতের এল,এম,জি দিয়ে পাকিস্তানীদের ওপর ফায়ার করতে শুরু করল। মুক্তিযোদ্ধারা শপথ নিলো, আজকে আমরা কেউ বাঁচতে পারব না। কাজেই এখন লড়ব কিংবা মরব। আর পাকিস্তানীরা এখন কাদায় আটকা পড়েছে। এখন আমাদের সুযোগ তাদেরকে আক্রমণ করার এবং হত্যা করার। প্রচন্ড গোলাগুলী বর্ষণ হলো। সুবেদার গাফফার তার এল,এম,জি এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা তাদের সেমি অটোমেটিকস দিয়ে কাদার মধ্যে আটকে যাওয়া পাকিস্তানীদের ওপর গুলীবর্ষণ করতে লাগল। এই আক্রমণের মুখে পাকিস্তানীরা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত, মুক্তিযোদ্ধারা অবশ্য বেশিক্ষণ আক্রমণ চালিয়ে যেতে পারল না। তিন চার মিনিটের মধ্যেই ঐ বাড়ির ওপর মর্টারের গোলা এসে আঘাত হানতে শুরু করল। তখন সুবেদার গাফফার বাহিনীর এবং বাড়ির অন্যান্য লোকজনসহ বাড়ির পেছনদিকের ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে গেল।

পরবর্তীতে আমরা যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি তাতে জেনেছি, এখানে কম করে হলেও পঁচিশ তিরিশজন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো অনেক বেশি। পরের দিন সুবেদার গাফফারের চিঠি নিয়ে লোক হাজির। অপারেশনের রিপোর্ট এবং তাদের অবস্থান জানানো হয়েছিল সেই চিঠিতে।

এর একদিন পরে পাকিস্তানীরা আবার প্রচন্ড আক্রমণ চালাল সুন্দরবনের ওপরে। সম্মুখ ঘাঁটি বগীর ওপর আক্রমণ চলছে প্রচন্ড। এসময় আমি বগী থেকে প্রায় দু'মাইল দূরের অন্য একটা ঘাঁটিতে অবস্থান করছি। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই ঘাঁটির ওপরেও পাকিস্তানীরা গানবোট ও বিমান হামলা চালাল। বগীর সম্মুখ ঘাঁটিতে কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন

হাবিলদার আলাউদ্দিন। হাবিলদার আলাউদ্দিন খুব কৃতিত্বের সঙ্গে শত্রুর মোকাবেলা করলেন এবং শত্রুর প্রচন্ড ক্ষয়ক্ষতি করলেন। পাকিস্তানীরা ছয়টা গানবোট নিয়ে এখানে আক্রমণ করেছিল। বলেশ্বর নদীর পাড়ে অবস্থিত বগীর সম্মুখ ঘাঁটিতে সমগ্র এলাকা জুড়ে বাংকার করে রাখা হয়েছিল এবং এক বাংকার থেকে আরেক বাংকারে যাওয়ার জন্য মাটির নীচ দিয়েই গর্ত করা রাখা হয়েছিল। হাবিলদার আলাউদ্দিন তার সমস্ত বাহিনী নিয়ে বাংকারগুলিতে অবস্থান নিলেন এবং সকলকে নির্দেশ দিলেন, 'কেউ কোন গোলাগুলী ছুঁড়বে না। পাকিস্তানীরা গুলী করছে। তারা মনে করুক, এখানে মুক্তিযোদ্ধা নেই।' সবাইকে খুব শাসিয়ে শাসিয়ে কমান্ড করতে হচ্ছে। 'কেউ গুলী ছুঁড়বে না। একটা গুলীও করবে না। প্রথমে আমি আক্রমণ করব আমার এলএমজি দিয়ে। তারপর তোমরা।' এইভাবে প্রতিটি বাংকারে গিয়ে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের কড়া নির্দেশ দিয়ে, সবকিছু গুছিয়ে, পজিশন নিয়ে বসে থাকলেন। মুক্তিযুদ্ধে কমান্ডারদের প্রশিক্ষণ দেয়ার সময় আমি তাদের শিখিয়েছিলাম যে, কৌশলগতভাবে শত্রুকে ধরাশায়ী করতে হলে তাকে যথাসম্ভব কাছে আসতে দাও। তারপর তাকে ধ্বংস করো। লেট দ্য এনিমি গেট ক্লোজার এন্ড ডেস্ট্রয় দেম। যদি দূরে থাকা অবস্থায় শত্রুর ওপর গোলা ছুঁড়তে শুরু করো তাহলে শত্রুকে ধ্বংস করা যাবে না। হাবিলদার আলাউদ্দিন প্রতিটি বাংকারে আমার এই কথাগুলি বলে শোনালেন মুক্তিযোদ্ধাদের। 'কমান্ডার সাহেব আমাদের এইভাবে যুদ্ধ করতে বলেছেন। কাজেই একজনও গুলী ছুঁড়বে না। পাকিস্তানীরা কাছে আসুক। তারপর দেখা যাবে।' গানবোটগুলো বগীর সম্মুখ ঘাঁটিতে বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ করছে। ফরেষ্ট অফিসের দরজা জানালাগুলি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। সেরিকালচার অফিসের সেই সুন্দর ঘরটাও প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্থ। পাকিস্তানীবাহিনী দেখল, মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে কোন পাল্টা গুলী বর্ষণ করা হয়নি। তখন তারা নিশ্চিত হলো, মুক্তিবাহিনী এই অঞ্চল থেকে পালিয়ে গেছে। গানবোটগুলি বগীর সম্মুখ ঘাঁটির দিকে এগোচ্ছে, আস্তে আস্তে। গুলী চলছে। পাল্টা কোন গুলীর শব্দ নেই। কোন পাল্টা জবাব নেই। শেষ পর্যন্ত ওরা যখন বলেশ্বর নদীর একেবারে পাড়ে পৌছল তখন চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত হলো যে এখানে মুক্তিবাহিনীর কোন অবস্থান নেই।

পাকিস্তানী সৈনিকরা প্রস্তুতি নিচ্ছে গানবোট থেকে নদীর পাড়ে নামবার। তারা ততক্ষণে নিশ্চিত যে, বগীর মুক্তিযোদ্ধারা পালিয়ে গেছে। পাড় যখন ত্রিশ পঁয়ত্রিশ গজ দূরে তখন পাকিস্তানীরা গান পজিশন ছেড়ে গানবোটের সামনের দিকে এসে জড়ো হলো। হৈহল্লা-চিৎকার চেচামেচি চলছে তাদের। চিৎকার করে বলছে, 'মুজিবের জারজ সন্তানেরা ভেগেছে। ভয় পেয়েছে' – ইত্যাদি ইত্যাদি। ওদের ভাবভঙ্গি হচ্ছে বিজয়ের পূর্বক্ষণের। যেন চূড়ান্ত পতন হয়ে গেছে বগীর মুক্তিযোদ্ধাদের। এমন সময় চারটা গানবোটের ওপরে হাবিলদার আলাউদ্দিনের নেতৃত্বে এলএমজিসহ অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলীবর্ষণ শুরু হলা। একেবারে ঝেড়ে দিল বলা যায়। পাকিস্তানীদের চিৎকারে চারপাশ একেবারে কম্পমান। আহত নিহতরা পড়ে গেল।

আলাউদ্দিন খুব বেশি হলে একমিনিটের মতো সময় পেয়েছিল পাকিস্তানীদের ওপরে এই নিধন যজ্ঞটার পরিচালনার। পাকিস্তানীরা পর্যুদস্ত। গানবোটের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে এমন একটা অবস্থা। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো গানবোট বিধ্বংসী কোন অস্ত্র হাবিলদার আলাউদ্দিনের কাছে ছিল না। অবশ্য গানবোট ধ্বংস করার মতো অস্ত্র আমাদের কাছে খুব বেশি ছিল না। ছিল শুধু অ্যানার্গা গ্রেনেড। তাও সীমিত সংখ্যক। হাবিলদার আলাউদ্দিনের কাছে অ্যানার্গা গ্রেনেড ছিল না। তাই এতো বড় একটা সুযোগ পেয়েও মুক্তিবাহিনী গানবোট ধ্বংস করতে পারল না। তবে প্রচন্ড ক্ষয়ক্ষতি হলো শত্রু সেনাদের। নিয়ন্ত্রণ হারানো গানবোটগুলো

গানবোটগুলো অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে সোজা পালিয়ে গেল প্রায় আধা মাইল পেছনে। পিছিয়ে গিয়ে তারা আবার গোলাবর্ষণ করতে শুরু করল। তবে ওদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ। কারণ আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সবাই আন্ডারগ্রাউন্ড বাংকারে অবস্থান করছিল। এ অবস্থায় প্রায় দু'ঘন্টার মতো গোলাগুলী চলল। কিন্তু এই গোলাগুলীর কোন সুফল পাঞ্জাবীরা পাচ্ছে না, আমরাও পাচ্ছি না। ক্ষতি যা করার সেটা হাবিলদার আলাউদ্দিন প্রথম আক্রমণেই করে ফেলেছে।

বলেশ্বর নদীতে পাকিস্তানীদের সুদৃঢ় অবস্থান। গানবোট ও অন্যান্য নৌযানে করে আসা পাকিস্তানীরা দূর থেকেই মুক্তিবাহিনীর আস্তানার ওপর ব্যর্থ গোলাগুলীর পর্ব চালিয়ে যাচ্ছে। ভোলা নদীর মধ্যেও পাকিস্তানী সৈন্য সংখ্যা কম নয়। ভোলা এবং বলেশ্বর–দুই নদীই পাকিস্তানীদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। ওরা আক্রমণ শুরু করল আমাদের সম্মুখবর্তী প্রায় আটটি ঘাঁটির ওপরে। রাতে বিমান হামলাও শুরু হলো। ভোর চারটা পর্যন্ত উপর্যুপরি এই হামলাগুলো মোকাবেলা করল আমাদের সম্মুখবর্তী ঘাঁটিগুলো। মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙে পাকিস্তানীরা একটি ঘাটিও দখল করতে পারল না। এই হামলা যখন চলছে তখন, বিকেলের দিকে আমাদের তাফালবাড়ি ঘাটিতে একটি ঘটনা ঘটে। সেখানে শহীদ টিপুর নেতৃত্বে আমাদের বাহিনী পাকিস্তানীদের প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল। পড়ন্ত বেলায় পাকিস্তানীদের আক্রমণের মাত্রা একটু কমে এলো। এমন সময় তাফালবাড়ি গ্রামের এক কৃষক এসে শহীদ টিপুকে জানালেন যে, পাকিস্তানী সৈনিকেরা তাদের ছাগল–খাসি ধরে ধরে গ্রামের এক প্রান্তে জমা করছে। এগুলো তারা নিয়ে যাবে নৈশভোজের জন্য। এই খবর পেয়ে শহীদ টিপু সুলতান দু'জন মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গী করে রওনা দিল গ্রামের দিকে। ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে লুকিয়ে গিয়ে হাজির হলো একেবারে পাকিস্তানী সৈনিকদের কাছাকাছি। ছয়/সাতজন পাঞ্জাবী সৈন্য তখন ছাগল ধরা অভিযান নিয়ে ব্যস্ত। তারা ইতিমধ্যে সংগৃহীত আটদশটি ছাগল বেধে রেখেছে এক জায়গায়। আবার নতুন ছাগল সংগ্রহ করে কয়েকজন সৈনিক এদিকে আসছে। টিপু সুলতান ধানক্ষেতের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে অবস্থান নিয়ে খুব নিকট থেকে পাকিস্তানী সৈনিকদের ওপর আক্রমণ করল। পাকিস্তানীদের পাঁচ ছয়জন সেখানে নিহত হলো। আক্রমণ করেই টিপু সুলতান পাকিস্তানীদের পাল্টা আক্রমণের সুযোগ না দিয়ে সেই অবস্থান ত্যাগ করল। পাকিস্তানী বাহিনীর অবশিষ্ট জীবিত সৈনিকরা পালিয়ে গেল। অবশ্য পরবর্তীতে ওরা এসে সেই গ্রামটি জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

বারো দিনের সেই ভয়াবহ হামলার সময়েও পাকিস্তানীরা কখনোই রাতের বেলা আমাদের ওপর আক্রমণ চালায়নি। কারণ রাত্রির অন্ধকারে আমাদের গেরিলা আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সাহস তাদের ছিল না। তাই রাতে সাধারণত পাকিস্তানীরা নদীর মাঝখানে গানবোটের সতর্ক প্রহরা নিয়ে অবস্থান করত। আবার সকাল হলে আমাদের ঘাঁটিগুলোর ওপর আক্রমণ চালাত। পাশাপাশি বিমান হামলা তো চলছেই। বারোদিন ব্যাপী পাকিস্তানীদের এই মরণ কামড়ের মতো আক্রমণ প্রতিহত করা আমাদের জন্য দূরূহ হয়ে পড়েছিল। বড় মাছুয়া, চরদুয়ানী, সুপতি, ভোলা নদীর পাড়ে জঙ্গলে, শরণখোলা, বগী, তাফালবাড়ি–এই জায়গাগুলোতে অবস্থিত আমাদের ঘাঁটি সমূহের ওপরে পাকবাহিনী মূল আক্রমণটা পরিচালনা করল। কিন্তু, আগেই বলেছি, তাদের আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

তাদের এই ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে বারো দিন অতিক্রান্ত হচ্ছে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা মরিয়া হয়ে পড়েছে। আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি এবং সহায় হচ্ছে, বিভিন্ন এলাকায় গ্রামগুলো থেকে আমরা নিয়মিত খাবার পাচ্ছি। গ্রামবাসী একজোট হয়ে বিভিন্ন বাড়িতে রান্না করে আমাদের প্রত্যেকটি ফ্রন্টে খাবার পাঠাচ্ছে। কাজেই আমাদের যোদ্ধারা সমস্ত ক্লান্তি এবং

দুর্দশার পরেও মোটামুটি সবল থেকে পাকিস্তানী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিল। এই বারোদিনে আমার মূল কাজ ছিল এক ঘাটি থেকে আরেক ঘাঁটিতে যাতায়াত। বাহিনীর প্রতিটি অংশকে যুদ্ধটা ভালমতো বুঝিয়ে দেয়া যেন তারা শুধু অস্ত্রের মাধ্যমে নয়, চিন্তাশক্তি ব্যবহার করে যুদ্ধটা মোকাবেলা করে–আমি নিরন্তর এই কথাটা বুঝিয়ে যাচ্ছিলাম মুক্তিযোদ্ধাদের। আমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি বলেই সেই প্রতিরোধ যুদ্ধে সুন্দরবনের মুক্তিযোদ্ধারা সফল হতে পেরেছিল। আমরা আমাদের ডিফেন্সিভ অবস্থানগুলো সম্পূর্ণ অক্ষত রাখতে সফল হলাম। এটা একটা বড় সাফল্য বলে আমি মনে করি।

পাকিস্তানীরা সুন্দরবনের মধ্যেও হামলা চালিয়েছে। কিন্তু আমাদের মূল ঘাঁটি এলাকায় কখনোই তারা আক্রমণ চালাতে পারেনি। এর প্রধান কারণ হলো, আমরা মূল ঘাঁটির আটদশ মাইল বাইরে যে নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলেছিলাম পাকিস্তানীরা সেগুলোকে প্রধান ঘাটি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। এবং তাদের আক্রমণগুলো বারবার এই বহির্বেষ্টনীতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। সেগুলো অতিক্রম করে মূল ঘাটির দিকে এগোনো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভাবলে এখনো আশ্চর্য লাগে, পাকিস্তানীরা যে বিমান হামলা চালিয়েছে সেগুলোর লক্ষ্যও ছিল বাইরের নিরাপত্তা পোস্টগুলো। আমাদের মূল ঘাঁটির এতো বড় অবস্থানের আশেপাশেও তারা একটি বোমাও ফেলতে পারেনি। তারা যে কেন আমাদের মূলঘাঁটি চিহ্নিত করতে পারেনি এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। তবে সেখানে আমরাও সচেষ্ট ছিলাম, বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম যাতে পাকিস্তানীরা মূল ঘাঁটির অবস্থান টের না পায়। আমাদের মূল ঘাটিগুলোর সবকয়টিই গভীর জঙ্গলের ভেতরে অবস্থিত ছিল। এ কারণেই হয়তো পাকিস্তানীরা বিমান থেকেও আমাদের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারেনি।

যাহোক, বারোদিন যুদ্ধের পর একদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি, পাকিস্তানীরা সদলবলে পালিয়ে গেছে। এবং যুদ্ধে তাদের লাভ হলো নিজস্ব ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। অপরদিকে আমাদের ক্ষয়ক্ষতি খুবই নগণ্য। পাকিস্তানীদের ক্ষয়ক্ষতি এক অর্থে প্রচন্ড। তবে আমরা তখন সেটা জানতাম না যে এই বারোদিনে পাকিস্তানীদের আসলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা কত। কিন্তু সে সময় ভারতীয় মিত্র বাহিনীর অয়ারলেস পাকিস্তানীদের অয়ারলেস মেসেজগুলো ইন্টারসেপ্ট করে ফেলেছিল। পরবর্তীতে আমি যখন দ্বিতীয়বার মুজিবনগরে গেলাম তখন একটি ঘটনার মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম সেই বারোদিনে পাকিস্তানীদের কিরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তারা যে কিরকম পর্যুদস্ত অবস্থায় আমাদের মোকাবেলা করেছিল তাও জেনেছিলাম।

বারোদিনের যুদ্ধ শেষে সমগ্র সুন্দরবন এবং তৎসংলগ্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেশ আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। প্রতিনিয়তই আনন্দ মিছিল। বিজয় মিছিল বের করছে জনতা। আমাদের সম্মুখ ঘাটিতে পতাকাগুলো স্বাধীন বাংলার অস্তিত্ব সগৌরবে ঘোষণা করে পতপত করে উড়ছে এবং এই পতাকা পাকিস্তানীরা কোনদিন নামাতে পারেনি। বাংলাদেশের মধ্যে এত ভেতরে মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস স্বাধীন বাংলার পতাকা অবিরাম উড়ছে এমন ঘটনা দ্বিতীয় কোথাও ঘটেছে কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু আমাদের সম্মুখ ঘাটির পতাকা পাকিস্তানীরা কোনদিন নামাতে পারেনি। মুহূর্তের জন্যেও তারা আমাদের এই স্বাধীনতার স্বাক্ষর ক্ষুণ্ন করতে, বিঘ্নিত করতে পারেনি। আমি বলবো, এটা আমাদের সুন্দরবনের মুক্তিযোদ্ধাদের একটা গৌরব।

বারোদিনের মুক্তিযুদ্ধের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলা যায়, এই লড়াই কেবল নয় নম্বর সেক্টরের জন্য নয়, বাংলাদেশের পুরো মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে একট গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আমাদের মুক্তিসেনারা পাকিস্তানী নিয়মিত বাহিনী, রাজাকার আলবদরসহ

প্রায় আট হাজার হানাদার যোদ্ধাকে মোকাবেলা করেছে। এই আট হাজার বাহিনী আমাদের তেমন কোন ক্ষতি করতে পারেনি। আমাদের ঘাটি দখল করতে পারেনি, আমাদের সম্মুখবর্তী ঘাটিরও পতন ঘটাতে পারেনি। এমনকি আমাদের ঘাটিগুলোতে উড্ডীয়মান পতাকারও বিন্দুমাত্র ক্ষতি তারা করতে পারেনি। সব মিলিয়ে বারো দিনের এই যুদ্ধ সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই গৌরবদীপ্ত ঔজ্জ্বল্য পেয়েছে। একই গৌরবের অধিকারী ১৬ই আগস্টে মংলা পোর্টে নৌকমান্ডোদের হামলা, যেখানে পাকিস্তানীদের তেরোটি সমুদ্র গামী জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল মাইন বিস্ফোরণের মাধ্যমে। বারোদিনের সেই যুদ্ধের গৌরব একা আমার নয়, ব্যক্তিগতভাবে কারোরই নয়। এই গৌরব সমগ্র মুক্তিবাহিনীর। এই গৌরব সুন্দরবনের মুক্তিযোদ্ধাদের যাদের অনেকেই বয়সে তরুণ। এমন অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছিল যাদের বয়স বারো, তেরো কি চৌদ্দ বছর। আবার এমন অনেকে ছিল যাদের বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর। আমাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা ছিল নৌকার মাঝি, মুক্তিযোদ্ধা ছিল ঘাটের শ্রমিক, আমাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা ছিল কৃষক, স্কুল–কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, যুবক পাকিস্তানের বিভিন্ন বাহিনীর নিয়মিত বাঙ্গালী সৈনিক, আমাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা ছিল মুসুল্লী, মসজিদের ইমাম। সকলকে মিলিয়েই এই গৌরবের অধিকারী বলা যায়। কারো একার গৌরব সেটা নয়।

আমাদের বেসামরিক যুদ্ধ পরিচালনায় যেসব সিনিয়র কমান্ডার ছিলেন তাদের মধ্যে সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন সামসুল আলম তালুকদার। তারপরে ছিলেন শহীদুল আলম বাদল, ক্যাপ্টেন আলতাফ, হাবিলদার আলাউদ্দিন, সুবেদার গাফফার, মুজিবুল হক মজনু, শহীদ আসাদ, শহীদ টিপু সুলতান, হেলালউদ্দিন আহমেদ, আমার ছোট ভাই কামাল উদ্দিন আহমেদ, মোরেলগঞ্জের আলী, আবু, হাবিলদার হাই, বগীর নুরু কমান্ডার, শরণ খোলার মোহাম্মদ লাল, মোহাম্মদ বাদশা মিয়া, শামসুদ্দিন আজাদ, একে এম আউয়াল, আবুল কালাম মহিউদ্দিন, ডাঃ জাহাঙ্গীর, শরণখোলার চেয়ারম্যান শমসের আলী, হাবিলদার আব্দুল লতিফসহ আরো অনেকে। বারো দিনের যুদ্ধের কৃতিত্বে এদেরও অংশ রয়েছে। সুন্দরবন সংলগ্ন অঞ্চলের সমগ্র জনতা–খেটে খাওয়া মানুষ, কৃষক সমাজ, নৌকার মাঝিসহ সমগ্র জনগোষ্ঠী যারা এই বারোটি দিন আমাদের পাশে ছিলেন খাবার নিয়ে, তাদের সহযোগিতা নিয়ে তারাও সমানভাবে একই কৃতিত্বের দাবীদার।

সেপ্টেম্বরের শেষ এবং অক্টোবরের শুরুতে নয় নম্বর সেক্টরের যুদ্ধে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঘটল। এই সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যেগাদান করলেন ক্যাপ্টেন শাজাহান ওমর। তিনি আরো একজন মুক্তিযোদ্ধা, ক্যাপ্টেন দেলোয়ারসহ সীমান্ত অতিক্রম করে মুজিব নগরে এসে হাজির হলেন। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ওসমানী সাহেব তাকে নির্দেশ দিলেন নয় নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য। ক্যাপ্টেন শাজাহান ওমর মেজর জলিলের নয় নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে যোগ দিলেন। শাজাহান

ওমর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেশ বড় একটা অংশ নিয়ে বরিশালে এসে হাজির হলেন। বরিশালের ঝালকাঠি, পিরোজপুরের বানরীপাড়া, স্বরূপকাঠি, আটঘর কুড়িয়ানা, পেয়ারা বাগান, গাবখান, নলছিটি, বাখেরগঞ্জ এবং পটুয়াখালীর একটি অংশে প্রচন্ড বেগে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করলেন তিনি অক্টোবরের শুরুতে। এটা আমাদের জন্য বেশ সহায়ক একটা অবস্থান সৃষ্টি করল। কারণ এর আগে পর্যন্ত পাকিস্তান আর্মি কেবল আমাদের ওপরই তাদের বন্দুক তাক করে রাখার সুযোগ পেয়েছিল। এখন পাকিস্তান আর্মির সামনে মুক্তিযোদ্ধাদের আরো একটি সক্রিয় অবস্থান এসে দাঁড়াল। তাই রণনৈতিক অংকের যোগফলে পাকিস্তান বাহিনী দুই শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে গিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল। বলাবাহুল্য পরিস্থিতি আমাদের বেশ অনুকূলে। আমাদের ওপর পাকিস্তানীদের সরাসরি আক্রমণের মাত্রাটাও কমে এসেছে।

ক্যাপ্টেন শাজাহান ওমর ,তার স্বল্পকালীন যুদ্ধে প্রচন্ড কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি সম্মুখ যুদ্ধে আহত হয়েছেন। তার নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধারা বরিশালের উল্লিখিত অঞ্চলে বেশ অল্প সময়ের মধ্যে ভাল প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সূচক জনগণের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি এবং মোটামুটি তাদের কৌশলগত ভ্রাম্যমাণ আক্রমণাত্মক অভিযানের মধ্য দিয়ে তারা পাকিস্তানীদের এই অঞ্চলের অবস্থানকে বেশ হুমকির সম্মুখীন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন শাজাহান ওমর পরবর্তীতে 'বীর উত্তম' জাতীয় খেতাব পেয়েছেন। তার এটা উপযুক্ত প্রাপ্তি বলেই আমি মনে করি। তার নেতৃত্বাধীন বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, বেশ গভীরে প্রবেশ করে ভ্রাম্যমাণ যুদ্ধের যে কৌশল অবলম্বন করেছিল সেটা অবশ্যই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যমূলক কৃতিত্বের দাবীদার। পাকিস্তান থেকে আগত কোন বাঙালী অফিসারের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের এরকম ভ্রাম্যমাণ আক্রমণাত্মক বাহিনী এতোটা সাফল্য আর কোথাও অর্জন করতে পেরেছে বলে আমার জানা নেই।

শাজাহান ওমরের নেতৃত্বাধীন বাহিনী এবং আমাদের বাহিনীর মধ্যে অল্প সময়ের ভেতরেই একটা সমঝোতা এবং পারস্পরিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। ক্যাপ্টেন শাজাহান ওমর একাত্তর সালের শেষাবধি বরিশাল আক্রমণ, পিরোজপুর আক্রমণ, ঝালকাঠি আক্রমণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে তার সাহসী ভূমিকার যথেষ্ঠ প্রমাণ এবং স্বাক্ষর রেখেছেন। তার বাহিনী গড়ে ওঠার ফলে আমরা আমাদের বাহিনীর অবস্থানকে আরো সুসংহত করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে যারা দেশের অভ্যন্তরে মুজিব নগর থেকে সহযোগিতা এবং স্বীকৃতি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে কর্নেল এটিএম হায়দার, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন কমান্ডো অফিসার হিসেবে ঢাকার গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। একইভাবে কৃতিত্বের দাবীদার ঢাকার মায়া গ্রুপের প্রধান মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম। কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান কাদের সিদ্দিকী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তা সবারই জানা। মুক্তিযুদ্ধে অনন্য কৃতিত্বের দাবীদার তিনি। হেমায়েত বাহিনীর প্রধান জনাব হেমায়েত উদ্দিনও মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী হিসেবে, কমান্ডার হিসেবে গৌরবদীপ্ত। একইভাবে বিভিন্ন জায়গায় সাহসী বাঙালী সন্তানেরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তাদের কৃতিত্বও কম নয়। তবে কর্নেল হায়দারের নেতৃত্বাধীন ঢাকার কমান্ডো অভিযানগুলো অবশ্যই বাঙালী জাতির মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকা উচিত। কর্নেল হায়দারের মতো একজন প্রথম সারির কমান্ডো অফিসার সেই আগরতলা থেকে সমগ্র কমান্ডো বাহিনী নিয়ে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ঢাকায় অবস্থান করে পাকিস্তান বাহিনীর মধ্যে

যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন, যে সফল অভিযানসমূহ পরিচালনা করেছিলেন তা নিশ্চয়ই মূল্যায়নের দাবী রাখে। একইভাবে মায়ার নেতৃত্বাধীন বাহিনীও ঢাকা শহরে প্রচন্ড সাফল্য অর্জন করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের একটা পর্যায়ে, আগস্টের শেষ দিকে কর্নেল তাহের, জেনারেল মঞ্জুর, কর্নেল জিয়াউদ্দিন এবং কর্নেল পাটোয়ারী পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে মুজিবনগরে এসে হাজির হলেন। জেনারেল মঞ্জুরকে তখন ৮ম সেক্টরের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কর্নেল তাহেরকে দেয়া হয় ১১ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব। কর্নেল তাহের ১১ নম্বর সেক্টরে দায়িত্ব নিয়ে আমাদের মতই ভেবেছিলেন যে সীমান্তে অবস্থান করে খুব বেশিদিন যুদ্ধ করাটা উচিত নয়। এটা যুক্তিসংগতও নয়। গ্রামের পর গ্রাম দখল করে বাংলাদেশের মধ্যে সুদৃঢ় অবস্থান গড়ে তুলে মুক্তিযুদ্ধ করতে হবে। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ এবং আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে। কমান্ডো এবং গেরিলা কায়দায় আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে। এইসব ধারণায় কর্নেল তাহের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ১১ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব নেয়ার পর নিজের বাহিনীকে দিয়ে সেরকম আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালনে সচেষ্ট ছিল। কর্নেল তাহেরের মুক্তিকামী ১১ নম্বর সেক্টর যে সাফল্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে সেটা অবশ্যই ইতিহাস হয়ে থাকবে, স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

কর্নেল তাহের, জেনারেল খালেদ মোশাররফ, জেনারেল শফিউল্লা–এই তিনজন সেক্টর কমান্ডার সরাসরি সম্মুখ সমর পরিচালনা করতে গিয়ে আহত হয়েছিলেন। শত্রুর অস্ত্র থেকে নিক্ষিপ্ত বুলেট জেনারেল শফিউল্লার কোমরে রাখা পিস্তল ভেদ করে তাকে আহত করেছিল। জেনারেল খালেদ মোশাররফের মাথার সামনের অংশে শত্রুর মর্টারের গোলা এসে আংশিক আঘাত হেনেছিল। কর্নেল তাহের কামালপুর যুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে শত্রুর গোলার আঘাতে হারিয়েছিলেন তাঁর একটি পা। তাঁর বাঁ পা'টি গোলার আঘাতে সম্পূর্ণ ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে পা'টা কেটে ফেলে তাকে সুস্থ করা সম্ভব হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য সফল সেনাপতির মধ্যে জেনারেল জিয়ার অধীনস্থ জেড ফোর্স, মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তমের নেতৃত্বাধীন এক নম্বর সেক্টরসহ অন্যান্য সেক্টরেও মুক্তিযোদ্ধারা অমিততেজে লড়াই চালিয়ে গেছে। আত্মত্যাগী, জীবন বাজী রেখে অল্প অস্ত্র নিয়ে শত্রুর বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করতে গিয়ে যে সাফল্য মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সেক্টরে দেখা গেছে তাতে করে কারো কৃতিত্বই খাটো করে দেখার উপায় নেই।

হেমায়েত বাহিনী আমাদের পাশাপাশিই অবস্থান করত। একই সময় বাগেরহাটের রফিকুল ইসলাম খোকনের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন তথা ভাসানী ন্যাপের একটি গ্রুপ চিতলমারী, বিষ্ণুপুর এলাকায় তাদের ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলেন। তাদের সাফল্য অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। হেমায়েত বাহিনী গোপালগঞ্জ অঞ্চল এবং রফিকুল ইসলাম খোকনের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধারা চিতলমারী, বিষ্ণুপুর, বাগেরহাট অঞ্চল, মেজর শাজাহান ওমরের বাহিনী স্বরূপকাঠি, বানরীপাড়া, আটঘরকুড়িয়ানা, নলছিটি, ঝালকাঠি, গাবখান, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল অঞ্চল, মেজর মেহেদী আলী ইমামের নেতৃত্বাধীন বাহিনী পটুয়াখালী, বরগুনা অঞ্চল এবং আমার নেতৃত্বাধীন বাহিনী পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনার একাংশ, বাগেরহাট জেলার একাংশ, মংলা পোর্ট এবং সুন্দরবন অঞ্চলে অবস্থান করে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে মুক্তির স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। সমগ্র জনতা আমাদের স্বপ্নে শরীক। তাদের সরবরাহ করা খাদ্য, তাদের সরবরাহ করা পোশাক, তাদের সরবরাহ করা ওষুধ, তাদের সার্বিক সহযোগিতায় এই বিরাট দক্ষিণ অঞ্চলের নয় নম্বর সেক্টরের মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিচালনা করতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম।

আমাদের মূল ঘাঁটির অবস্থান ছিল তেতুলবাড়িয়া নামক ছোট্ট একটি নদীর দুপাশ ঘিরে। এই মূল অবস্থানগুলো আমরা বেশ সুদৃঢ় করেছিলাম। তেতুলবাড়িয়া আসলে ছিল একটা মরা নদী যার সামনের অংশ মৃত। এটাকে গেরিলাদের মূল ঘাঁটি এলাকা হিসেবে নির্বাচিত করলাম সুন্দরবনের সমগ্র ম্যাপ দেখে এবং সূক্ষ্ম পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে। জনবসতি থেকে খুব একটা দূরে নয় আবার শত্রুর জন্য দুর্ভেদ্য–এমনই অবস্থান ছিল সেটার। শত্রুপক্ষ গানবোট বা অন্য কোন বড় ধরনের নৌযান নিয়ে সহজেই এই এলাকায় প্রবেশ করতে পারত না। অথচ আমরা শত্রুর ওপর আক্রমণের জন্য বিভিন্ন জায়গায় অপেক্ষাকৃত সহজেই পৌঁছাতে পারছি। এসমস্ত কারণ বিবেচনা করেই আমি গেরিলাদের মূল ঘাঁটি হিসেবে তেতুলবাড়িয়া নদীর দুপাশকে নির্বাচিত করেছিলাম। নদীর দুপাশে আমাদের ক্যাম্পগুলোর অবস্থান প্রায় বিশ মাইল ব্যাপী। ক্যাম্পগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার সহজ যোগাযোগের জন্য এই বিশ মাইল রাস্তা তৈরী করে নিয়েছিলাম আমরা। চারহাত, পাঁচহাত পর্যন্ত জঙ্গল পরিষ্কার করে মোটামুটি সোজা রাস্তা এক ক্যাম্পের সঙ্গে আরেক ক্যাম্পের যোগাযোগ রক্ষা করেছে। নদীর দু'পাশেই রাস্তা এবং রাস্তার পার্শ্বে বাংকার। আমার হেডকোয়ার্টার ছিল বিভাগীয় বন কর্মকর্তার প্রমোদ তরী যার বর্ণনা আগেই দিয়েছি। হেডকোয়ার্টার বলতে অফিসরুম যেটা আমার ছিল সেটার একপাশে ছিল বাংলাদেশের একটা বিশাল ম্যাপ, আরেক পাশে ছিল সুন্দরবনের একটা বড় সাইজের ম্যাপ। অন্য এক পাশে ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী, সুভাষ বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এবং সুকান্তের বাধানো ছবি। এই অফিসে বসে আমরা সুন্দরবন ঘাঁটি এলাকায় অনেক যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছি। আমার ব্যক্তিগত সহকারীদের মধ্যে মূলত মোহাম্মদ হেলাল, শামসুদ্দিন আজাদ, পরিতোষ কর্মকার, বিপুল হালদার, মৃণাল কান্তি হালদার, ডাক্তার জাহাঙ্গীর প্রমুখরাই বিভিন্ন সময় দায়িত্বে ছিলেন। এদের মধ্যে যারা বিভিন্ন যুদ্ধে সরাসরি জড়িত থাকতো তারা বাদ দিয়ে অন্য কোন একজন আমার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতো।

সুন্দরবনের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে কিছু অলৌকিক ঘটনার মুখোমুখি আমরা হয়েছিলাম। আমাদের ক্যাম্পগুলো ঘিরে বাঘের উপদ্রব ছিল খুব। অবশ্য উপদ্রব বলা যায় কিনা সেটাও বিবেচ্য। আমাদের ক্যাম্পগুলোর নীচে এবং চারপাশে প্রায় নিয়মিতই প্রত্যেক রাতে বাঘ হাঁটতো এবং গোঙানীর শব্দ করতো। এটা সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রথমে খুব ভীতির সঞ্চার করে। ব্যাপারটা আমাকেও একটু উদ্বিগ্ন করে তোলে। আমি ভাবছিলাম যদি কোন মুক্তিযোদ্ধাকে বাঘে খেয়ে ফেলে তাহলে স্বাভাবিক কারণেই সব মুক্তিযোদ্ধা ভয় পেয়ে যাবে। তারা ভাববে আমরা একটা বিপদ সঙ্কুল জঙ্গলের মধ্যে আছি এবং আমরা এখন দ্বিমুখী আক্রমণের মুখোমুখি; বাঘও আমাদের ক্ষতি করতে পারে। অধিকাংশ ক্যাম্প থেকেই রিপোর্ট আসতে শুরু করল যে তাদের ক্যাম্পে প্রত্যেক রাতেই বাঘ আসে। ক্যাম্পের নীচে আসে, ক্যাম্পের চারধারে ঘোরে। রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে মনে মনে ঠিক করলাম বাঘ আমি মেরে ফেলব। খবর নিলাম কোন ক্যাম্পগুলোর আশেপাশে বাঘের বেশি আনাগোনা। এরকম কয়েকটা ক্যাম্পে আমি রাত্রি যাপন করলাম যাতে করে বাঘ মেরে ফেলা যায়। কিন্তু আমি রাত্রি যাপন করতে গেলে বাঘ আর সেসব ক্যাম্পে আসত না। অদ্ভুত ব্যাপার, আমি যখনই ক্যাম্প ছেড়ে চলে আসি তার পরের রাত্রেই সেই ক্যাম্পের আশে পাশে বাঘের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। ভোরবেলা মুক্তিযোদ্ধারা ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেত ক্যাম্পের পাশে বাঘের

পায়ের তরতাজা চিহ্ন। এ ধরনের ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটল। শেষ পর্যন্ত একদিন আমি অনেকটা কৌতুক করেই বললাম যে, বাঘ আমাদের পাহারা দিচ্ছে। আমরা হাজার মায়ের সন্তান এখানে, এই জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছি সহায়, সম্বলহীন। কাজেই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আমাদের জন্য বাঘকে পাহারায় নিয়োজিত করা হয়েছে। বাঘ আমাদের কোন ক্ষতি করছেনা। ভবিষ্যতেও করবে না। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা কখনও কখনও জঙ্গলে রাত্রিযাপন করেছি। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা জঙ্গলের মধ্যে দিনে রাত্রে অবস্থান করেছে। যে কোন মুহূর্তে আমাদের কোন না কোন একজন বাঘের শিকার হতে পারত। কিন্তু কি আশ্চর্য, কী অলৌকিক সেই ঘটনা, কোনদিন আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধাকে বাঘ তাড়াও করেনি। সুন্দরবন শ্বাপদসংকুল একটি অরণ্য। সুন্দরবনে সাপের সংখ্যাধিক্যও প্রচন্ড। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সাপের অবস্থান এই জঙ্গলে। কিন্তু কোনদিন একটি সাপ আমাদের কোন মুক্তিযোদ্ধাকে তাড়া করেনি কিংবা ছোবল বসায়নি। এটাও একটা অলৌকিক ঘটনা। এছাড়া সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া খাল এবং নদীতেই আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা গোসল করত। প্রতিদিনই হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা নদীতে নেমে পড়ত গোসল করার জন্য। এইসব নদীতে সবসময়ই প্রচুর কুমীরের বসবাস। কিন্তু এক্ষেত্রেও পুনরাবৃত্তি। কোনদিন কোন কুমির কোন মুক্তিযোদ্ধার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করেনি। মুক্তিযুদ্ধের বাইশ বছর পড়ে এখন ভাবতে গেলে ঘটনাগুলো আরো বেশি অলৌকিক মনে হয়।

যা হোক, পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাই। বারোদিনের লড়াই শেষে প্রচন্ড ক্লান্তি পেয়ে বসল। আর পাকসেনাদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা আমাদের মনে সৃষ্টি করেছিল আনন্দের জোয়ার। পাশাপাশি তুষখালি, মঠবাড়িয়া অঞ্চলের বিজয় সবমিলিয়ে আমরা, সুন্দরবনের মুক্তিযোদ্ধারা আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যেই আছি বলা যায়। সিনিয়র কমান্ডারদের নিয়ে আলোচনায় বসলাম। মেজর জলিলের নয় নম্বর সেক্টর হেড কোয়ার্টার থেকে ইতিমধ্যেই আমরার কাছে দুবার চিঠি এসেছে। চিঠির মর্মার্থ এরকম যে হয়তো যুদ্ধটা অল্পদিনেই শেষ হয়ে যেতে পারে। কাজেই যুদ্ধের সর্বশেষ অবস্থান বোঝা এবং অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে আলাপ আলোচনা করবার জন্য সেক্টর হেড কোয়ার্টারে আমার যাওয়াটা জরুরী। এ পর্যায়ে সিনিয়র কমান্ডারদের সঙ্গে বসে মেজর জলিলের পাঠানো চিঠির প্রেক্ষিতে একবার মুজিব নগরে যাওয়া উচিত বলে আলোচনা করলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম। এই সিদ্ধান্তের পরে আমরা সমস্ত কমান্ডার, কোম্পানী কমান্ডার ও আঞ্চলিক কমান্ডারদের একটা সম্মেলনের মতো আয়োজন করলাম। প্রায় ১৮০ জনের মতো কমান্ডার নিয়ে আমাদের এই সম্মেলন। কমান্ডারদের মধ্যে প্রায় সবাই এরই মধ্যে ভাল যোদ্ধা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। এদের সঙ্গে আলোচনার মূল বিষয়বস্তুটা ছিল সিনিয়র কমান্ডারদের নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে মুজিবনগর যাওয়ার সিদ্ধান্তটা তাদেরকে জানানো এবং কঠোরভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করা যাতে পাকিস্তানীরা বুঝতে না পারে এই সময়টাতে আমি সুন্দরবনের ঘাটি এলাকায় নেই। এখবর শত্রুপক্ষ জানলে ওরা হয়তো আমাদের ঘাটি ধ্বংস করার দুঃসাহসিক একটা উদ্যোগ নিতে পারে। যখন কোন বাহিনীর কমান্ডার অনুপস্থিত থাকে তখন সেই বাহিনীকে পর্যুদস্ত করা খুব সহজ। কাজেই আমার কিছুদিনের জন্য মুজিবনগর যাওয়া আসার কারণে অনুপস্থিত থাকাটা যেন সাধারণভাবে সবার জানা হয়ে না যায় সেই গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য সবাইকে বলা হলো। যার যার অবস্থান, যার যার মিশন, যার যার কর্তব্য বুঝিয়ে দেয়া এবং বিভিন্ন পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে সেটাও বুঝানো হলো। যদি পাকিস্তানীরা নাপাম বোমা ব্যবহার করে তাহলে বিকল্প ঘাটি এলাকায় সমস্ত বাহিনী নিয়ে সরে যাওয়া –এইভাবে প্রশিক্ষণমূলক ও উপদেশমূলক লক্ষ্যেই সম্মেলনটার আয়োজন করা হয়েছিল

হয়েছিল দুপুরে। সম্মেলনে উপস্থিত কমান্ডারদের নিয়ে একসাথে ডাল ভাত মাছ খাওয়া হলো। সম্মেলনের তৃতীয় পর্বে, বিকেলবেলা আমি কমান্ডারদের সামনে একটা বিষয় উপস্থাপন করলাম। আমি কমান্ডারদের বললাম, 'আপনারা বিভিন্ন যুদ্ধে অনেকেই সোনা উদ্ধার করেছেন। অনেক ডাকাতকে আমরা মেরে ফেলেছি। তাদের কাছ থেকে আমরা লুণ্ঠিত স্বর্ণ গচ্ছিত অবস্থায় পেয়েছি। এইসব স্বর্ণ এখন কোথায়?' এইভাবে আমি তাদের সামনে একটা প্রশ্ন উথাপন করলাম। তারা সবাই হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে গেল। কারো মুখে কোন উত্তর নেই। তখন আমার ইঙ্গিত মোতাবেক দুজন মুক্তিযোদ্ধা এক বস্তা স্বর্ণ নিয়ে এসে আমাদের সামনে হাজির করল। আমি এবার কমান্ডারদের বললাম 'এই যে স্বর্ণ আপনারা যা উদ্ধার করেছেন তা এইভাবে চালের বস্তার মধ্যে রাখা হয়েছে। বেশ ভারি হয়ে গেছে। ছোট খাট কোন জায়গায় রাখাও যাচ্ছে না।'

আমার কথা শুনে কমান্ডাররা বেশ আত্মতৃপ্তি লাভ করল। যেন তারা আরো আত্মবিশ্বাসী হলো। আমি জানতে চাইলাম তাদের কাছে, এই স্বর্ণটা আমরা কি করবো? তখন একজন কমান্ডার দাঁড়িয়ে বললেন, 'স্যার আপনি যেটা ভাল মনে করবেন সেটাই করবেন।' আমি বললাম, 'তা হয় না। এটা মুক্তিযুদ্ধ। এটা কোন নিয়মিত বাহিনীর ব্যাপার নয়। কাজেই মুক্তিযুদ্ধে আপনারা যারা কমান্ডার হিসেবে আছেন সকলের সঙ্গে একটা মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নির্ধারণ করা উচিত। এটা কারো একার দায়িত্বের বিষয় নয়। এখানে যৌথ নেতৃত্ব এবং যৌথ একটা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই সবকিছু করা উচিত।'

তখন শহীদ আসাদ দাঁড়িয়ে কৌতুকের মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বললেন। তিনি বললেন, 'স্যার, এটা আপনার কাছে রেখে দেন। এভাবেই থাকুক। মুক্তিযুদ্ধের পরিণতি কি হবে আর আমাদের ভাগ্যের পরিণতি কি হবে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। কাজেই এটা এখন কাউকে না দিয়ে আপনার কাছেই রেখে দিন। গচ্ছিত থাকুক।'

এ পর্যায়ে আমি আমার মতামত দিলাম। বললাম, 'আমরা মুক্তিযোদ্ধা। আমাদের সরকার হচ্ছে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার এবং এটা মুজিব নগরে একটা প্রবাসী অবস্থানে গঠিত। আমরা যদি আমাদের সরকারের প্রতি অনুগত না হই, আমাদের লয়ালটি যদি ঠিকমত না দেখাই তাহলে আমরা কিন্তু আর মুক্তিযোদ্ধা থাকিনা। কাজেই আমাদের উচিত এই সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করা এবং যেসব বিষয়গুলো নিয়ম অনুযায়ী আমরা করতে পারি সেসব নিয়ম অনুযায়ীই করা। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয়, এই স্বর্ণগুলো এভাবে সুন্দরবনে রেখে দেওয়ার কোন যুক্তি নেই। নিরাপত্তা ও এক অর্থে নেই। কখন আমাদেরকে পুরো এলাকা ত্যাগ করে সরে যেতে হয় তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই আমি মনে করি, এই স্বর্ণ আমাদের মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার ইন ওসমানী সাহেবের কাছে হস্তান্তর করা উচিত। এটা আমাদের প্রবাসী সরকারের কোন না কোন কাজে লাগতে পারে।'

আমি এই কথা বলার পরে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাই একমত হয়ে গেল। তারা একবাক্যে মত দিল–সেটাই হোক। ওসমানী সাহেবের কাছে জমা দেয়ার জন্য এই গচ্ছিত স্বর্ণ সঙ্গে নেয়া হলো। আর প্রায় এক হাজার মণ চাল আমরা নয় নম্বর সেক্টর হেড কোয়ার্টারে পাঠালাম। কারণ মেজর জলিল আমার কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাতে উল্লেখ ছিল যে, সেক্টর হেড কোয়ার্টারের জনসংখ্যা সরকারীভাবে যা দেখানো হচ্ছে বাস্তবে তারচেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি। যে মুক্তিযুদ্ধের জন্য যাচ্ছে তাকে তো আর না করা যাচ্ছে না। ফলে জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু সরকারী অনুদান, খাদ্য এবং অন্যান্য সবকিছুই পাওয়া যাচ্ছে মাত্র তিন ভাগের একভাগ মুক্তিযোদ্ধার জন্য। কাজেই সেখানে খাদ্যের বেশ ঘাটতি ছিল। এদিকে তুষখালি অপারেশনের মাধ্যমে ছয় হাজার মণ চাল আমাদের কাছে চলে এসেছে। সেক্টর হেড

কোয়ার্টারের দূরাবস্থা জানার পর আমরা চারটা নৌকায় এক হাজার মণ চাল পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। দু'দিন পরে সুন্দরবনের গহীন অরণ্য এবং পশুর, শিবসা, আড় পাঙ্গাশিয়া ও হাড়িয়াভাঙ্গা–এইসব বিশাল নদীর সমুদ্র মোহনা অতিক্রম করে আমরা মুজিবনগরের পথে চললাম। যাওয়ার পথে আমরা দেখতে পেলাম পশুর নদীতে পাকিস্তানীরা গানবোট নিয়ে পাহারা বসিয়েছে। বেশ কড়া পাহারা। আমরা সমুদ্রের মুখে আরেকটু দক্ষিণের দিকে নেমে গিয়ে জায়গাটা অতিক্রম করলাম।

বাসন্তী নামক একটা জায়গায় (ভারতীয় সুন্দরবন অংশে) নতুন বসতি স্থাপন করা হয়েছে। বন উজাড় হওয়ার পর নতুন ভারতীয় থানার পত্তন করা হয়েছে সেখানে। সেই থানায় গিয়ে আমরা হাজির হলাম। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমাদের পরিচয় পাওয়ার পরে যথেষ্ঠ সহযোগিতা করলেন। যানবাহন জোগাড় করে দিলেন যাতে করে আমরা মুজিবনগরে পৌঁছাতে পারি। আমরা নৌকাগুলো রেখে সড়ক পথে গিয়ে মুজিবনগরে হাজির হলাম।

তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। মেজর জলিল দুপুরের খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন। আমি গিয়ে তাঁর শয়নকক্ষেই প্রবেশ করলাম। মেজর জলিল আমাকে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা। চিৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর মুখে বিষন্নতার ছায়া। তিনি বললেন, 'তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। ক'দিন আগে ওসমানী সাহেব আমাকে ডেকে বলেছেন তোমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। তোমাকে সুন্দরবন থেকে ডেকে পাঠানোর জন্য আমাকে বলেছেন এবং তাঁর সামনে তোমাকে আমার হাজির করতে হবে। সাবসেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করার অবকাশ হয়তো তোমার আর থাকবে না।' কথাগুলো আমার কাছে নীলাকাশে বজ্রাঘাতের মতো মনে হচ্ছিল। প্রচন্ড মানসিক আঘাতে বিপর্যস্ত অবস্থা। তবু প্রতিবাদী কণ্ঠে জানতে চাইলাম, 'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি?' উত্তরে জলিল সাহেব বললেন, 'তুমি নাকি বেশ কয়েকজন হিন্দু মেয়েকে জোর করে আটকে রেখেছ সুন্দরবনের মধ্যে। দশ বারো জন হিন্দু মেয়েকে তুমি সুন্দরবনে আটকে রেখেছ এবং এদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। রাতের বেলা সুন্দরবনে নাকি নাচ গান জলসার আয়োজন হয় নিয়মিত। তুমি নাকি সেই জলসা ঘরের নটবর।'

আমি হতাশ হয়ে মেজর জলিলের বিছানার পাশে রাখা সোফাসেটের ওপর বসে পড়লাম। প্রচন্ড হতাশা, ঘৃণা আর মানসিক বিপর্যয় আমার চারপাশটা অন্ধকার করে দিল। ভেবে পাচ্ছিলাম না এরা কারা যারা এই অভিযোগ তুলছে? কি এদের পরিচয়? মুক্তিযুদ্ধে কি এদের ভূমিকা? এইসব প্রশ্ন বারবার আমার মনে পাথরে আঘাত করার মতো আঘাত করে প্রত্যাঘাত পেয়ে ফিরে যাচ্ছিল। আমি নিশ্চুপ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। মেজর জলিল আরো বললেন যে, আওয়ামী লীগের তৎকালীন একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা লিখিতভাবে ওসমানী সাহেবের কাছে এই অভিযোগ তুলেছেন যে সুন্দরবন অঞ্চলে নয় নম্বর সেক্টরের সাবসেক্টর কোন যুদ্ধ করছে না। তারা হিন্দু মেয়েদের সেখানে আটকিয়ে রেখে জলসা ঘর বসিয়েছে। প্রতি রাতে সেখানে জলসার আসর বসছে। মদের আসর বসছে এবং তারা চুরি ডাকাতি করে প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েছে। এটা ছিল একজন নেতার লিখিত অভিযোগ, আমাদের কমান্ডার ইন চীফ জেনারেল ওসমানীর কাছে। ওসমানী সাহেব তার সমস্ত জীবনে একজন নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক হিসেবে, একজন সহজ সরল মানুষ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের একজন কমান্ডারের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি মানসিকভাবে অস্থির হয়ে কিছুটা ক্ষিপ্তই হয়েছিলেন এই ভেবে যে, কি করে একজন মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগের সৃষ্টি হয়? সেই জন্যই হয়তোবা আমার ওপর

তাঁর এতোটা ক্ষোভ এবং আক্ষেপ তৈরী হয়েছিল যেটা তিনি ঝেড়েছিলেন মেজর জলিলের ওপরে।

আমি চুপ করে জলিল সাহেবের সামনে বসে আছি। আমাদের চা-টা খাওয়ানো হল। জলিল সাহেব বেশ তাৎক্ষণিক বুদ্ধি নিয়ে ব্যাপারটা মোকাবেলা করলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ওয়ারলেস সেটের মাধ্যমে জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে কথা বললেন। জেনারেল ওসমানী আরো ক্ষিপ্রবেগে বললেন, 'জিয়াকে এক্ষুনি আমার সামনে নিয়ে এসো।'

জলিল সাহেব বেশ সাহসী ভূমিকাই পালন করেছেন। আমাকে বললেন,'সাহস হারাবার কোন কারণ নেই। আমরা মাঠে যুদ্ধ করছি। কারা কারা কেন আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে তা আমরা জানি। কাজেই, আমাদের মোকাবেলা করতে হবে। তুমি শুধু তোমার এই লুঙ্গি আর ছেঁড়া গেঞ্জিটা পাল্টিও না। এসব পরেই চলো।'আমি বললাম 'পাল্টাব কিভাবে? ভাল কাপড়-চোপড় নেই-ই তো। এই লুঙ্গি আর গেঞ্জিই আমার সম্বল।'

জলিল সাহেব আমাকে নিয়ে রওনা দিলেন। জীপের ড্রাইভিং সিটে তিনি। আমি পাশে বসা। খালি পা, লুঙ্গি, গেঞ্জি। আমার সঙ্গী চারজন মুক্তিযোদ্ধাকে বললাম, 'ঐ স্বর্ণের বস্তাটা জীপের পেছনে উঠিয়ে নাও।' কারণ বস্তটা কোথাও রেখে যাওয়া আমি নিরাপদ মনে করছি না। জীপ ছুটল। প্রায় আড়াই ঘন্টার রাস্তা। দুপুর গড়িয়ে গেছে। তিনটা-সাড়ে তিনটা নাগাদ আমরা ওসমানী সাহেবের অফিসে গিয়ে পৌঁছলাম।

বঙ্গবন্ধুর ছেলে শেখ কামালের সঙ্গে দেখা হলো অফিসে ঢুকেই। যুদ্ধকালীন বিশেষ ব্যবস্থা এবং ট্রেনিংয়ের মধ্য দিয়ে কমিশনপ্রাপ্ত হয়ে তিনি তখন ওসমানী সাহেবের এডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মেজর জলিল আমার সঙ্গে শেখ কামালের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং নিজে ওসমানী সাহেবের অফিস কক্ষে প্রবেশ করলেন আমার প্রবেশের অনুমতি ও অন্যান্য বিষয়ে আলাপ করার জন্য। আমি শেখ কামালের সামনে বসা। সদ্য পরিচিত হলেও তার সঙ্গে কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ হলো। তিনি প্রথমেই বললেন, 'স্যার, আজকে আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যে পাকিস্তানের বাঙালী সামরিক অফিসারদের মধ্যে আসলেই এমন কেউ কেউ আছে যারা ভেতরে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছে।'

আমি বললাম, 'যাই বলেন, ভেতরে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করা খুব কঠিন।'

'হ্যাঁ, সেটা আপনাকে দেখেই বোঝা যায়। আপনি খুব পরিশ্রান্ত এবং প্রচন্ড ঝুঁকি নিয়ে আপনাকে সব কাজ করতে হচ্ছে। আপনার চেহারা দেখেই এসব বোঝা যায়।'

আমি বললাম, 'শুধু তাই নয়। আমাদের বিরুদ্ধে চুরি, ডাকাতি এবং সুন্দরবনে জলসা ঘর বসানো, নর্তকী নাচানো, হিন্দু মেয়েদের জোর করে আটকে রাখা-এসব অভিযোগ লিখিতভাবে ওসমানী সাহেবের কাছে দেয়া হয়েছে।'

আমার কথা শুনে শেখ কামাল খুব ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'আমাদের দুর্ভাগ্য কোন কোন নেতৃবৃন্দ চান যেন ভারতীয় সেনাবাহিনী গিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করে তাদেরকে ক্ষমতার মসনদে বসিয়ে দিয়ে আসে। কোন মুক্তিযোদ্ধাই ভেতর থেকে এখানে এসে সামান্যতম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, নর্তকী নাচানো, জলসা ঘর বসানো-এই ধরনের অভিযোগ প্রত্যেকটি কমান্ডারের বিরুদ্ধে সাজানো অবস্থায় আছে।'

বলার ভঙ্গিতে স্পষ্টতই উষ্মা শুনে বুঝলাম এসব ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচারে শেখ কামাল খুবই বিক্ষুব্ধ। তিনি বললেন, 'স্যার, আপনার সঙ্গে পালিয়ে চলে যাব আমি সুন্দরবন। আমাকে নেবেন? আমি কয়েকটা অস্ত্র গোপন করে রেখেছি। বড় বড় অস্ত্র-থ্রি ইঞ্চি মর্টার, রিকয়েললেস রাইফেল, হেভি মেশিনগান- এগুলো আমি গোপনে রেখে দিয়েছি আমার

কাছে। আপনি আমাকে নিয়ে যান, আমি সুন্দরবন যাব যুদ্ধ করতে। এখানে আমার ভাল লাগে না।'

আমি তাকে নিবৃত্ত করলাম। বললাম, 'আপনি বঙ্গবন্ধুর ছেলে। আমি জানিনা বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে আসবেন কিনা। আমার মনে হয় আপনার বেঁচে থাকার দরকার আছে। আপনি যেভাবে আমার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে যেতে চাচ্ছেন এটাতো কেউ মেনে নেবেনা। নেয়া সম্ভবও নয়।'

কথা হচ্ছে, এর মধ্যে মেজর জলিল আবার শেখ কামালের রুমে প্রবেশ করলেন। আমাকে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি ওসমানী সাহেবের সঙ্গে দেখা করো। আসো আমার সঙ্গে।' আমি ওসমানী সাহেবের অফিস কক্ষে প্রবেশ করলাম। সঙ্গে মেজর জলিল। আমি যথারীতি সামরিক কায়দায় অ্যাটেনশন হয়ে কমান্ডার ইন চীফকে স্যালুট করলাম। ওসমানী সাহেব কিছুটা বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকালেন। খালি পা, লুঙ্গি পরা, ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে দেয়া লেফটেন্যান্ট জিয়াউদ্দিন দন্ডায়মান। তার চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি। এক যুদ্ধ বিধ্বস্ত সৈনিক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে যার বিরুদ্ধে রয়েছে অনেক অভিযোগ। আমি সালাম করবার পর ওসমানী সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাকেতো আমি আগেও দেখেছি।' উত্তরে বললাম, 'স্যার, আমি যখন প্রথম মুজিবনগরে এসেছিলাম তখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আপনার সাথে আমি একদিন লাঞ্চ এবং ডিনার খেয়েছিলাম।'

ওসমানী সাহেব স্মরণ করতে পারলেন। তারপর আমাকে বসার অনুমতি দিলেন। তাঁর টেবিলের পাশে এক প্রান্তে রাখা একটি চেয়ারে বসলাম। মেজর জলিলও বসলেন।

ওসমানী সাহেব আমার সঙ্গে সামরিক ভঙ্গিতে মূলত ইংরেজীতেই কথা বলছিলেন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'জিয়াউদ্দিন, তুমি কি করছো, আমাকে একটু সংক্ষেপে বলো।' আমি শংকিত মন নিয়ে একে একে প্রায় পঞ্চাশটি যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করলাম। ওসমানী সাহেব বুঝতে পারলেন আমাদের সক্রিয়তা কতটুকু এবং যুদ্ধের মাঠে আমাদের অবস্থান কতটুকু সুদৃঢ়। তিনি চুপচাপ শুনে নিয়ে শেষে বললেন, 'তুমি আমাকে দেখাতে পারো বাংলাদেশের ম্যাপের মধ্যে তোমরা কোথায় অবস্থান করছো?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই দেখাতে পারি স্যার।' এই বলে ওসমানী সাহেবের অফিস কক্ষের বিপরীতে সম্পূর্ণ দেয়াল ভরা বাংলাদেশের বিশাল একটি মানচিত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মানচিত্রের পাদদেশে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। আর বঙ্গোপসাগরের কিনারা ঘিরে রয়েছে সুন্দরবন এবং উপকূলীয় অঞ্চল। আমি ম্যাপের কাছে গিয়ে বসে পড়লাম। বসে ওসমানী সাহেবকে আমাদের মূল ঘাটি এলাকাগুলো চিহ্নিত করে দেখালাম। তারপর যেখানে আমরা শত্রুর ওপর হামলা করেছি এবং প্রতিনিয়ত হামলা হচ্ছে সেই জায়গাগুলো, বিশেষ করে ঢাকা-খুলনা-মংলা নৌপথ, যে পথে পাকিস্তানীদের যাতায়াত চলত আর চলত আমাদের অ্যাম্বুশ-আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ সেই অবস্থানগুলো ওসমানী সাহেবকে দেখালাম। তারপর বললাম, 'আমাদের মূল ঘাটি এলাকা অর্থাৎ সেই তেতুলবাড়িয়া নদী থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে সুন্দরবনের আরো গভীর অরণ্যে আমরা একটা বিকল্প ঘাটি এলাকা তৈরী করেছি।' ওসমানী সাহেব আমাকে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি ওঠে আসো।' আমি আবার চেয়ারে এসে বসলাম। ওসমানী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এত জনবল এবং শক্তি অপচয় করে কেন এই বিকল্প ঘাটি এলাকা গড়ে তুলছ?'

আমি তাকে বিনয়ের সঙ্গে বললাম 'স্যার, আমরা মনে করি যে সুন্দরবনে আমাদের মুক্তিবাহিনীর অবস্থান সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে পাকিস্তানীদের জন্য একটা বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে এবং সে কারণেই পাকিস্তানীরা হয়তো এক সময় আমাদের ওপর আকাশ থেকে

নাপাম বোমা নিক্ষেপ করতে পারে। আমাদের সমস্ত ঘাটি এলাকাটা জ্বালিয়ে দিতে পারে। তেমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হলে বারো চৌদ্দ হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আমাদের সমগ্র ঘাটি ত্যাগ করে হয়তো এই বিকল্প ঘাটিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে এবং পরবর্তী কার্যক্রম অর্থাৎ শত্রুর ওপর আক্রমণ, গেরিলা যুদ্ধ, জঙ্গল যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।'
ওসমানী সাহেব ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন 'ঠিক আছে, সেটা করতে পারো।' তারপরে আমি ওসমানী সাহেবকে তুষখালি গুদামের খাদ্য দখল এবং তার পরবর্তী বারো দিনের সেই যুদ্ধের বর্ণনা দিলাম। তিনি নিরবে শুনলেন। খুব একটা মন্তব্য করলেন না। এর মধ্যে তিনি তাঁর দপ্তরের কর্মচারীকে ডেকে আমাকে চা বিস্কুট দিতে বললেন। ব্যাপারটাতে জলিল সাহেব এবং আমার কাছে বেশ খটকাই লাগলো। কারণ কমান্ডার ইন চীফের অফিস কক্ষে একজন জুনিয়র অফিসারকে চা নাস্তার মাধ্যমে আপ্যায়ন করার সাধারণ রেওয়াজ নেই। তার উপর যার বিরুদ্ধে গুরুতর সব অভিযোগ তাকে আপ্যায়ন করারতো কথাই উঠে না। যাহোক চা খাচ্ছি এমন সময় ওসমানী সাহেব মেজর জলিলকে হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি জিয়াউদ্দিনকে ক'দিন কলকাতায় এবং মুজিবনগরে অবস্থান করাচ্ছ?' জলিল সাহেব বললেন, 'সপ্তাহ দুয়েক থাকতে পারে।' ওসমানী সাহেব তড়িৎ প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করলেন। বললেন, 'তা হয় না। খুব তাড়াতাড়ি জিয়াউদ্দিনকে সুন্দরবনে পাঠিয়ে দাও। তাকে এই অঞ্চলে রেখে নষ্ট কোরো না। ডোন্ট স্পয়েল দিস বয় কিপিং হিম ইন মুজিবনগর।'
জলিল সাহেব আরো আশ্চর্য হচ্ছেন, বিস্মিত হচ্ছেন। কারণ মাত্র ক'দিন আগে আমাদের কমান্ডার ইন চীফ জেনারেল ওসমানী আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শুনে যতোটা ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন আজকে যেন ঠিক তার উল্টো মূল্যায়ন করে আমাকে সুন্দরবনের গেরিলা ঘাটিতে তাড়াতাড়ি ফেরত পাঠানোর জন্য জলিল সাহেবকে তাড়া দিচ্ছেন। এ পর্যায়ে ওসমানী সাহেব আমাদেরকে বিদায় দেয়ার উদ্যোগ নিলেন। আমি বললাম, 'স্যার, আমি কিছু জিনিস নিয়ে এসেছি। যাবার আগে সেগুলো আমি আপনার কাছে হস্তান্তর করবো।' এই বলেই আমি অফিস কক্ষের দরজাটি খুললাম। এবং আমার সঙ্গে আগত মুক্তিযোদ্ধাদের বললাম সেই স্বর্ণভর্তি চালের বস্তাটা নিয়ে আসার জন্য। তারা বস্তাটা নিয়ে এসে ওসমানী সাহেবের টেবিলের ওপর রাখল। ওসমানী সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'এটার ভিতরে কি?' আমি বললাম, 'স্যার, এটার ভেতর স্বর্ণ।' এই বলেই আমি সেই চালের বস্তার আটকানো মুখটা খুলে দিলাম। গড় গড় করে কিছু স্বর্ণ টেবিলের ওপর গড়িয়ে পড়ল। ওসমানী সাহেব বিস্মিত হলেন। জানতে চাইলেন, 'স্বর্ণগুলো তুমি কোথায় পেলে?'
প্রশ্নটা আমার কাছে একটু অন্যরকম মনে হলো। আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সঙ্গে প্রশ্নটার একটা সংযোগ আছে বলে মনে হলো। আমি ওসমানী সাহেবকে যে উত্তর দিয়েছিলাম সেটা আমার জন্য খুব বেয়াদবী হয়েছিল। আজকে আমি মর্মে মর্মে কমান্ডার ইন চীফের কাছে আমার সেই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জন্য ব্যথা অনুভব করি। কিন্তু সেদিন আমার কোন উপায় ছিল না। তাই একটা ক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া সেখানে ব্যক্ত হয়েছিল। আমি বলেছিলাম 'স্যার স্বর্ণ নিজেই উত্তর দেবে আমি এই স্বর্ণগুলো কোথায় পেয়েছিলাম।' এই বলে আমি ওসমানী সাহেবের কাছে ব্যাখ্যা করলাম 'স্যার, আমরা যতগুলো থানা দখল করেছি সেই থানাগুলোর প্রত্যেকটিতে রাজাকার আলবদর–আল শামস, জামাত, মুসলিম লীগের সহযোগী যারা ছিল তাদের প্রত্যেকের কাছে লুণ্ঠিত স্বর্ণের ভাল একটা অংশ আমরা পেয়েছিলাম। এগুলো সংগ্রহ করে করে আমরা সুন্দরবনের ঘাটিতে রেখেছিলাম। আর সেই রাতের মুক্তিযোদ্ধা নামধারী ডাকাত যারা ডামী রাইফেল, বন্দুক নিয়ে রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন গ্রামে ডাকাতি করতো এবং পরিচয় দিতো, আমরা মুক্তিযোদ্ধা। আমাদের খাওয়া

পরার জন্য আপনারা সাহায্য করেন। এইসব বলে যারা ডাকাতি পরিচালনা করতো এবং গ্রামবাসীর ওপর অত্যাচার চালাত এরকম অনেক গ্রুপকেই আমরা পরাস্ত করেছি। এবং তাদের কাছে আমরা গচ্ছিত স্বর্ণ পেয়েছি। এইসব স্বর্ণ গচ্ছিত রেখে রেখে আমরা দেখলাম যে এটা এখন বিরাট পরিমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন সুন্দরবনের মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডারদের নিয়ে মিটিং করে আলোচনা করে তাদের সিদ্ধান্ত নিয়েই আমি এই স্বর্ণ আপনার কাছে জমা দিতে এসেছি। কারণ, আমি স্যার একজন মুক্তিযোদ্ধা যে সর্বক্ষণ যুদ্ধের সম্মুখ সারিতে থাকি। আমি জানি আমার জীবনের মূল্য একটি মাত্র বুলেট। কাজেই এই স্বর্ণের কোন মূল্য আমার কাছে নেই। দেশ মাতৃকার জন্য আমি লড়াই করছি। কার কাছে আমি এই স্বর্ণ গচ্ছিত রাখব, কার কাছে দিলে এর উপযুক্ত মূল্যায়ন হবে, মুক্তিযুদ্ধের কাজে লাগবে এটা চিন্তা করেই আমি আপনার কাছে এটা দেয়ার জন্য নিয়ে এসেছি।' ওসমানী সাহেব যেন আরো বিস্মিত হলেন এবং কিছুটা ব্যথিত হলেন। তিনি একটা ঐতিহাসিক কথা বললেন, 'কিন্তু জিয়াউদ্দিন, আর কেউতো স্বর্ণ জমা দিল না।'

আমিও নির্বাক। ওসমানী সাহেবও নির্বাক। অবশেষে নিরবতা ভেঙে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক আমাদেরকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর জলিল সাহেবকে তাড়া দিলেন আমাকে যেন খুব শিগগীরই জঙ্গলযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গেরিলা ঘাটিতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই বলে তিনি আমাকে দোয়া করে বিদায় দিলেন।

আমি ওসমানী সাহেবের কক্ষ থেকে বেরিয়ে শেখ কামালের কক্ষে বসে অপেক্ষা করছি। এমন সময় ভারতীয় মিত্রবাহিনীর একজন কর্নেল সেই রুমে ঢুকলেন। তিনি মেজর জলিলের সঙ্গে করমর্দন করে জিজ্ঞেস করলেন, 'জলিল, আমরা শুনতে পেয়েছি সুন্দরবনের ঘাটি থেকে জিয়াউদ্দিন ফিরে এসেছে। সে কোথায়?' জলিল সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, এই তো আপনার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ও।' এরপর কর্নেলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। কর্নেল তখন জলিল সাহেবকে বললেন, 'ইস্টার্ন কমান্ডের ডিরেক্টর জেনারেল সরকার ওকে দেখতে চেয়েছেন এবং আমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন সঙ্গে করে।'

জলিল সাহেব কিছুটা বিস্মিত হলেন। কারণ ইস্টার্ন কমান্ডের ডিরেক্টর একজন চার তারকা বিশিষ্ট জেনারেল এবং তিনি আমার মতো একজন সাধারণ লেফটেন্যান্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য লোক পাঠিয়েছেন, এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপারই বটে।

এদিকে ঝামেলা হলো, আমার কাছে ভদ্রস্থ হওয়ার মতো কোন কাপড় চোপড় নেই। পায়ে জুতো নেই। খালি পা। পরনে একটা লুঙ্গি এবং শতছিন্ন একটা গেঞ্জি। এমন পোশাকে মিত্র বাহিনীর একজন জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর জন্য কিছুটা অসমীচীন এবং অসম্মানজনক মনে হচ্ছিল। জলিল সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে পুরো ব্যাপারটাই তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করতে পারলেন। তিনি উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'জিয়াউদ্দিন যদি ঘন্টা দুয়েক পর যায় তাহলে কি অসুবিধা হবে?' কর্নেল তখন শেখ কামালের টেলিফোনের মাধ্যমে জেনারেল সরকারের এডিসির সঙ্গে কথা বললেন। বললেন, 'দু'ঘন্টা পরে জিয়াউদ্দিনকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।'

এরপর জলিল সাহেবের জীপে চড়ে তাড়াহুড়া করে আমরা চলে গেলাম একটা হোটেলে। সেখানে গোসল সেরে আবার ছুট লাগাতে হলো মার্কেটের দিকে। একটা রেডিমেড কাপড়ের দোকান থেকে জামা, প্যান্ট, জুতো কিনে, সেগুলো পরে কিছুটা ভদ্রস্থ হয়ে তারপর গিয়ে হাজির হলাম জেনারেল সরকারের হেড কোয়ার্টার্সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই জেনারেল সরকারের অফিসকক্ষে আমাকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলো।

রুমে ঢুকে সামরিক কায়দায় সালাম জানালাম জেনারেলকে। জেনারেল সরকার দাঁড়িয়ে উঠে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি করমর্দন করলাম। তিনি পরিষ্কার বাংলা ভাষায় আমাকে বললেন, 'তুই জিয়া?' পিতৃস্নেহ, বাঙালী মমত্ব আর ভালবাসা, স্নেহ নিয়ে তিনি আমাকে প্রশ্নটি করেছিলেন। আমি বললাম, 'ইয়েস স্যার।' তিনি বললেন, 'তুই যুদ্ধ করিস?' আমার জন্য অস্বস্তিকর একটা অবস্থা। কারণ লেফটেন্যান্ট হয়ে একজন জেনারেলের কাছে যুদ্ধের বর্ণনা কিংবা প্রশংসা কিংবা দাবী এর কিছুই করা যায়না। কোনরকমে বললাম, 'আমি চেষ্টা করছি স্যার।' তখন আমাকে তিনি বললেন, 'বোস, বোস, বাবা বোস।' আমি তাঁর টেবিলের সামনে রাখা একটা চেয়ারে বসলাম। জেনারেল তাঁর চেয়ারে বসে চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে একটু এলিয়ে নিয়ে তাঁর বাঁ পাশে রাখা রিভলবিং একটা র‍্যাক থেকে একটা ফাইল নিয়ে আমার সামনে ছুঁড়ে দিলেন। কিছু বললেন না। ইঙ্গিতটাই যথেষ্ঠ। এটাই সামরিক বাহিনীর একজন জেনারেল ও লেফটেন্যান্টের মধ্যে সম্পর্ক হয়ে থাকে। জেনারেল আমার সামনে যে ফাইল ছুঁড়ে দিলেন তার অর্থ হচ্ছে এটা দেখো। আমি সুবোধ বালকের মতো ফাইলটা খুলে কাগজগুলো উল্টাতে লাগলাম। ফাইলে রাখা হয়েছে অনেকগুলো ইন্টারসেপ্টেড ওয়ারলেস মেসেজ। এই মেসেজগুলো মূলত তুষখালি গুদাম আক্রমণের পর পাকিস্তানী পাল্টা আক্রমণের মুখে বারোদিনের সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাকিস্তানীদের ঢাকায় পাঠানো ওয়ারলেস মেসেজ, যেগুলো মিত্রবাহিনী তাদের শক্তিশালী ওয়ারলেস দিয়ে ইন্টারসেপ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। এরকম প্রায় তিরিশটি ইন্টারসেপ্টেড ওয়ারলেস মেসেজ সেই ফাইলের মধ্যে রয়েছে। আমি দেখছি আর বিস্মিত হচ্ছি। পাকিস্তানীরা সুন্দরবন অঞ্চলে আমাদের ওপর আক্রমণ করে পাল্টা মারের মুখে ঢাকায় সাহায্য চাইছে। বিমানবাহিনীর বিমান চাইছে। তারা আমাদের কাছে মার খাচ্ছে। তাদের সৈন্যরা মারা যাচ্ছে। তাদের সৈন্যরা পিছু হঠছে। বগী সুপতি, শরণখোলা, জিউধরা, তাফালবাড়ি, মাছুয়া, বড়মাছুয়া, চরদুয়ানী এই অঞ্চগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেইসব পাকিস্তানী ওয়ারলেস মেসেজগুলির মধ্যে।

সমস্ত ব্যাপারটা হঠাৎ করে আমাকে খুব বিস্মিত এবং হতভম্ব করে দিয়েছিল। পাকিস্তানীরা তাদের একটা ওয়ারলেস মেসেজে উল্লেখ করেছিল যে তাদের বাহিনী বিদ্রোহীদের প্রতিরোধের মুখে পিছু হঠছে। তবে বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে একজন সামরিক অফিসার রয়েছেন। আমার মনে হয়েছিল নিজেদের মর্যাদা যথাসম্ভব রক্ষা করার জন্য ব্যাপারটা তারা উল্লেখ করেছিল ওয়ারলেস মেসেজে–আমরা যে মার খাচ্ছি মুক্তিবাহিনীর কাছে সেটা মুক্তিবাহিনীর যেন তেন একটা কন্টিনজেন্ট নয়। এটা মুক্তিবাহিনীর এমন একটা ঘাটি, এমন একটা অংশ যার নেতৃত্বে রয়েছেন একজন সামরিক অফিসার। কাজেই আমাদের এই মার খাওয়া, আমাদের এই পিছু হঠা অস্বাভাবিক নয়। অফিসার নিয়ন্ত্রিত বাহিনীর কাছেই আমরা মার খাচ্ছি। এটা বোঝানোর জন্যই যেন পাকিস্তানীরা মেসেজ দিয়েছিল যে, রেবেলস লেড বাইঅ্যানঅফিসার।

এগুলো দেখার পরে আমি পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে বিস্মিত চোখে জেনারেল সরকারের দিকে তাকালাম। মাথা উঁচু করে আমি যখন জেনারেলের দিকে তাকালাম তখন একটু হাসি হেসে তিনি বললেন, 'বয়, ডোন্ট থিংক উই সিট আইডল ওভার হিয়ার।' বালক, ভেবোনা আমরা এখানে অলসভাবে বসে আছি। এটাই জেনারেলদের ভাষা, লেফটেন্যান্টদের জন্য। আমি তাৎক্ষণিকভাবে ইংরেজীতেই বললাম, 'না স্যার, আমি জানি আপনারা সবই জানেন।' জেনারেল সরকার বললেন, 'পাকিস্তানের ওয়ারলেস মেসেজগুলো ইন্টারসেপ্ট করার সময় আমরা খুব বিস্মিত হয়েছিলাম। ভাবছিলাম, বাংলাদেশের এতো গভীরে কারা এমন মরণপণ

যুদ্ধ করছে। তোমাদের কমান্ডার ইন চীফের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি বললেন তোমার কথা। বললেন, লেফটেন্যান্ট জিয়াউদ্দিন সুন্দরবন অঞ্চলে যুদ্ধ করছে। এরপর এই মেসেজগুলোর একটা করে কপি আমি কর্নেল ওসমানীকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

জেনারেল সরকারের এই কথা শুনে আমার কাছে জেনারেল ওসমানীর আচরণ রহস্য পরিষ্কার হলো। বুঝতে পারলাম ভয়াবহ অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি আমার সঙ্গে এতোটা সদয় আচরণ করেছেন। এবং ঐ অভিযোগগুলো সম্পর্কে তিনি আমার সামনে একটি প্রশ্নও উথাপন করেননি। আমার মনে হয়, এই ইন্টারসেপ্টেড মেসেজগুলো পাওয়ার মাধ্যমে আমাদের প্রতিরোধের তীব্রতা এবং পাকিস্তানীদের নাজেহাল হওয়ার চিত্র কমান্ডার ইন চীফকে এই ধারণাই দিয়েদিল যে হাজারো প্রতিকূলতার সঙ্গে যে কমান্ডার জঙ্গলযুদ্ধ পরিচালনা করছে তার বিরুদ্ধে ঐসব অভিযোগ সত্য হতে পারে না। হতে পারে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ভোগ আর ত্যাগ পাশাপাশি চলতে পারে না।

যাই হোক জেনারেল আমাকে চা-য়ে আপ্যায়িত করলেন এবং তিনি আস্তে আস্তে একটা ভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে চলে গেলেন।

জেনারেল সরকারের আদি নিবাস বরিশালে। বরিশাল ঝালকাঠির এক প্রতাপশালী জমিদার পরিবারের তিনি সন্তান। ১৯৪০ সালে তারা ভারতে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছিল এখনো এই বাংলার জন্য তাঁর মনে একটা বিরাট টান, একটা মায়া, একটা বিরাট আকর্ষণ রয়ে গেছে। জেনারেল তার গল্প বলার মধ্য দিয়ে বললেন যে তিনি আমার বাবাকেও জানেন। তিনি বললেন ১৯৪০ পরবর্তী এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আমার বাবা যে অসাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভূমিকা রেখেছিলেন সেটাও তিনি ভালভাবেই জানেন। আমার ভাই তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে তিনি চেনেন। তাঁর গল্পও তিনি করলেন। মনে হলো আমার সম্পূর্ণ পরিবারই যেন তাঁর পরিচিত। মনে হলো আমরা যেন এখনো সেই একই এলাকার অধিবাসী। আমরা যেন একই এলাকার খুব ঘনিষ্ঠ মানুষ। এসব কথাবার্তার পরে হঠাৎ করে তিনি আবার ফিরে গেলেন সামরিক প্রসঙ্গে। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি অস্ত্র চাও?' আমি বললাম, 'স্যার, আমাদের দুধরনের অস্ত্র দরকার বিশেষ করে। একটু বড় অস্ত্র এখন আমাদের প্রয়োজন।' তিনি প্রশ্ন করলেন, 'সেই অস্ত্রগুলো কি?' আমি বললাম 'আমরা চাচ্ছি রিকয়েললেস রাইফেল, থ্রি ইঞ্চ মর্টার।' জেনারেল একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার অঞ্চলে তো ট্যাঙ্ক নেই। কারণ তোমাদের এলাকাটা এত নদী বহুল যে পাকিস্তানীরা কোন ট্যাঙ্ক এখানে কাজে লাগাতে পারে না। তাহলে তুমি কেন রিকয়েললেস রাইফেল চাচ্ছ যা দিয়ে ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা হয়?' আমি খুব কৌশলে জেনারেলকে ছোট্ট করে উত্তর দিলাম, 'স্যার, পাকিস্তানী গানবোটস্ আর ট্যাঙ্ক ইন আওয়ার টেরেইন।' (পাকিস্তানী গানবোটগুলোই আমাদের অঞ্চলে ট্যাঙ্কের মতো) জেনারেল একটু হেসে মাথা নাড়লেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন 'থ্রিইঞ্চ মর্টারও তো দূর পাল্লার একটা অস্ত্র। এটা দিয়ে তুমি কি করবে?' আমি উত্তরে বললাম, 'এখন এমন একটা সময় উপস্থিত যখন আমরা মুক্তিযোদ্ধারা আগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, পারদর্শী এবং যুদ্ধে অভিজ্ঞ। আমরা এখন সাহসী সৈনিক। এখন আমরা ইচ্ছা করলে ছোট ছোট শহরগুলোকে আমাদের কব্জায় নিয়ে আসতে পারি। এবং শত্রুকে আরো সংকীর্ণ জায়গায় ঠেলে দিয়ে তাদেরকে দুর্বল করে ফেলতে পারি।' জেনারেল হাসলেন এবং মাথা নেড়ে আমার কথা সমর্থন জানালেন। তিনি তাঁর স্লিপ প্যাডে লিখলেন, ৩টি রিকয়েললেস রাইফেল এবং ৩টি থ্রি ইঞ্চ মর্টার। এই স্লিপ প্যাডের মাধ্যমেই এগুলো আমাকে দেয়া হলো।

জেনারেল সরকার বিদায়ের সময় আমার শুভাশীষ কামনা করলেন। আশীর্বাদ করলেন। ফিরে এলাম জলিল সাহেবের কাছে। সেখান থেকে ফিরে এলাম নয় নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে। অল্পদিনের মধ্যেই আবার সুন্দরবনে ফিরে যাব এটা মনস্থির করে ফেললাম। তাই বেশ তাড়াহুড়ো করে প্রস্তুতির এন্তেজাম করতে হলো। জলিল সাহেব ধারণা দিলেন, আমাদের মুক্তির যুদ্ধ হয়তো খুব একটা দীর্ঘ হবে না। হয়তো এই শীতেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কাজেই যা কিছু করবার তা খুব তাড়াতাড়িই আমাদের করে নিতে হবে। যত অঞ্চল মুক্ত করার সামর্থ আমাদের আছে সেগুলো এখনই করবার সময়। আমরা একমত হলাম–জলিল সাহেব, আমি এবং আমার সঙ্গে আগত মুক্তিযোদ্ধারা। ফিরে আসার সময় মুজিবনগরে ট্রেনিং প্রাপ্ত হাজার খানেক মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে করে আনার ব্যবস্থা আমি নিলাম।

সেক্টর হেডকোয়ার্টারে অবস্থানকালে দুই তিনদিনের মধ্যে একটা ঘটনা ঘটল। যে ভদ্রলোক আমার বিরুদ্ধে ওসমানী সাহেবের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ করেছিলেন তিনি হঠাৎ করে জলিল সাহেবের সেক্টর হেডকোর্টারে এসে হাজির। আমিও সেখানে হাজির। আমাকে দেখে খুব স্বাগত জানালেন তিনি। জলিল সাহেবকে বললেন, 'জিয়া এসেছে এতো যুদ্ধ করে, এতো গৌরব নিয়ে–আমরা তো ওকে একটা সম্বর্ধনা দিতে চাই।'

জলিল সাহেব আমার দিকে তাকালেন। অর্থবোধক সে চাহনী। আমি নিশ্চুপ। নেতৃস্থানীয় এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সেই ব্যক্তি বললেন, 'দু'দিন পরে আমাদের ওখানে একটি অনুষ্ঠান আছে। সেই অনুষ্ঠানে সেক্টর কমান্ডার হিসেবে আপনি এবং সুন্দরবন থেকে আগত জিয়াউদ্দিন উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানটি সেখানেই হবে এবং জিয়াউদ্দিনকে আমরা সম্বর্ধনা দেব।'

জলিল সাহেব আমার দিকে তাকালেন। আমি বললাম, 'স্যার, 'ঠিকই আছে।' বৃহত্তর স্বার্থে অনেক ছোটখাট ব্যাপার ভুলে যেতে হয়। এটা বুঝেই আমি বললাম, ঠিক আছে, আমরা ঐ অনুষ্ঠানে যাবো।'

দু'দিন পরে আমরা সেই অনুষ্ঠানে গিয়ে হাজির হলাম। একটি ইয়ুথ ক্যাম্প। বাংলাদেশ থেকে আগত হাজার হাজার যুবক সেখানে সশস্ত্র ট্রেনিং নিচ্ছে। গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিচ্ছে। প্রায় আট হাজার যুবক সেই ইয়ুথ ক্যাম্পে আছে। আমরা গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হলাম। ইয়ুথ ক্যাম্পে দেখা হল আমার বড় ভাই সালাউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে। তিনি চীফ মোটিভেটর হিসেব সেখানে কাজ করছেন। আমাকে পেয়ে আনন্দিত। জিজ্ঞেস করলেন এখন থেকে মুজিবনগরেই অবস্থান করব কিনা। আমি বললাম 'না সুন্দর বনে ফিরে যাব শিগগীরই।' তিনি বললেন, 'কি দরকার ভেতরে যাওয়ার? এখানে থেকেই তো মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেয়া যায়।' ভাই হিসেবে তিনি চাচ্ছিলেন আমি যেন বিপদের মধ্যে না গিয়ে মোটামুটি নিরাপদ অবস্থানে থেকে দেশের জন্য কাজ করি। আমি তার প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হলাম না। তিনিও এক সময় বুঝতে পারলেন আমাকে ধরে রাখতে পারবেন না। সবই অরণ্যে রোদন হবে। যাহোক, এদিকে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। উঠতে হলো অনুষ্ঠানের মঞ্চে। আমাকে বক্তব্য দিতে বলা হলো। আমি বললাম দু'চারটি কথা। তখন সমগ্র তারুণ্য, সমগ্র যুবসমাজ আমাদের মতো কমান্ডারদের প্রতি প্রচন্ড আকৃষ্ট। আমি দাঁড়িয়ে শুধু বললাম, 'আপনারা জানেন আমি সুন্দরবন থেকে এসেছি। আপনাদের জন্য আমার কেবল দু'টি কথা। দেশমাতৃকা রক্ত চায়। মাতৃভূমি রক্ত চায়। আমাদের সেই রক্ত দিতে হবে। ধন্যবাদ।'

এই কথা বলেই আমি বসে পড়লাম। এরপর জলিল সাহেবের জ্বালাময়ী বক্তৃতা। শেষ পর্যায়ে সেই বয়োবৃদ্ধ নেতা উঠে দাঁড়ালেন। তিনি গৌরচন্দ্রিকা শেষ করেই আমাকে নিয়ে বলতে শুরু করলেন। তিনি সামনে বসা প্রায় আট হাজার যুবকের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমরা জানো, বাংলাদেশের ভেতর থেকে, সুন্দরবন থেকে তোমাদের জিয়া ভাই এসেছেন। তোমরা তার

চোখ দেখেছ? তার চোখ শুধু রক্ত চায়। মাতৃভূমির জন্য রক্ত দরকার। আমি তোমাদেরকে শুধু বলব, যেদিন জিয়াউদ্দিনের মতো সাহসী, চরিত্রবান সৈনিক বাংলার মাটিতে সৃষ্টি হবে সেইদিন যেন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।' বেশ বড় বড় বক্তব্য তিনি দিলেন। আমরা নিশ্চুপ। এরপরে মিলাদ মাহফিল। তারপর একটু চা মিষ্টি খাওয়ার আয়োজন।

এই সমাবেশে যেন মূল আকর্ষণটা আমাকে ঘিরেই। সমাবেশে উপস্থিত হাজার হাজার যুবকের অধিকাংশই আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা জানতে চায় বাংলাদেশের ভেতরে অবস্থাটা কি। তারা জানতে চায় যুদ্ধ এখন কোন পর্যায়ে, জানতে চায় দেশের সাধারণ মানুষের মানসিক অবস্থা কেমন। তারা জানতে চায় পাকিস্তানীদের হামলা এবং নারকীয় অত্যাচারের মাত্রা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। জামাত–মুসলিম লীগ পরিচালিত রাজাকার–আলবদর–আলশামসের দৌরাত্ম্য এখন কতটা ভয়াবহ সেটা জানতেও তারা উৎসুক। আমি যখন তাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন অনেকেই দু'একটা বিস্কিট, দু' একটা মিষ্টি এনে আমার হাতে দিচ্ছিল। আবেগতাড়িত হয়ে দেশের একজন মুক্তিযোদ্ধাকে তারা ঐ একটি বিস্কিট, একটি মিষ্টি দিয়ে তাদের ভালবাসা জানাচ্ছে। এমন অবস্থায় কয়েকজন হঠাৎ করে কিছু বিরূপ কথা বলা শুরু করলেন। তাদের একজন বললেন, 'আজকে নেতার মুখে বক্তৃতা শুনেছেন। তিনি বললেন, আপনার মতো সাহসী এবং চরিত্রবান সৈনিক সৃষ্টি হলে যেন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু মাত্র ক'দিন আগে তিনিই আমাদের সামনে কুৎসা রটিয়ে বলেছিলেন যে, আপনি নাকি সুন্দরবনের মধ্যে হিন্দু মেয়েদের আটকিয়ে রেখে অত্যাচার করছেন এবং সুন্দরবন নাকি এখন মুক্তিযোদ্ধাদের জলসা ঘরে পরিণত হয়েছে।'

আমি উত্তরে বললাম, 'এই কথাগুলি নিয়ে আর বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। আমাদের ছোটখাট ব্যবধান ভুলে যেতে হবে। আমাদের দেশের জন্যে, মাতৃভূমির জন্যে, মানুষের জন্যে আমরা এ ধরনের বিতর্কে যেতে চাই না। এ ধরনের তিক্ততা আমরা সৃষ্টি করতে চাই না। যদি তিনি বলেও থাকেন তাহলে হয়তো পরে তার সেই ভুলের সংশোধন হয়েছে। তিনি হয়তো উপলব্ধি করতে পেরেছেন যার জন্য তিনি আজকে সঠিক বক্তব্যই রেখেছেন। কাজেই আপনারা অনুগ্রহ করে এ ব্যাপারে আর কোন আলোচনা বা সমালোচনা করবেন না। এটাই আমার অনুরোধ।'

আমরা এরপর সেখান থেকে ফিরে এলাম জলিল সাহেবের হেডকোয়ার্টারে। ক্যাপ্টেন হুদা ও ক্যাপ্টেন বেগের নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনী হিঙ্গলগঞ্জসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার পাকিস্তানীদের অবস্থানের ওপর প্রচন্ড আক্রমণ চালান। রাতের আক্রমণে পাকিস্তানীরা বেশ পর্যুদস্ত হয়েও ভোরবেলা আবার তারা নতুন সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে মুক্তিবাহিনীর ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়।

কোরবানী ঈদের দিন সেটা। সকাল বেলা আমরা প্রস্তুত হচ্ছি ঈদের নামাজ পড়ার জন্য। ঠিক সেই সময় অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে ওয়ারলেস মাধ্যমে খবর এলো যে জিয়াউদ্দিনের বাহিনী নিয়ে জিয়াউদ্দিন যেন এখনই যুদ্ধের ময়দানে হাজির হয়। আমরা বুঝতে পারছিলাম পাকিস্তানীদের পাল্টা আক্রমণের মুখে নবম সেক্টর হেডকোয়ার্টারে গঠিত কোম্পানী এবং ব্যাটেলিয়ান, ক্যাপ্টেন হুদার নেতৃত্বে গড়ে উঠা বাহিনী পাকিস্তানীদের প্রচন্ড আক্রমণের মুখে পড়ার কারণে আমাকে আজ সেখানে ডাকা হচ্ছে। আমি আমার সঙ্গের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সশস্ত্র প্রস্তুতি সম্পন্ন করলাম এবং নবম সেক্টর হেডকোয়ার্টারে রক্ষিত তিনটি জলযানে (যেগুলো গানবোটের মতো করে সজ্জিত) উঠে আমরা রণাঙ্গনের দিকে যাত্রা করলাম। গানবোটগুলোতে হেভী মেশিনগান সজ্জিত ছিল। যেতে যেতে আমি উপলব্ধি করছিলাম যে, যুদ্ধের ময়দানে একজন সৈনিকের বিশ্রাম নেয়ার কোন অবকাশ নেই। সেই সুদুর সুন্দরবন

থেকে এসেছি মুজিবনগরে, নয় নম্বর সেক্টরে–ভিন্ন কারণে। যুদ্ধ করবার জন্য নয়। যুদ্ধ বিষয়ে সেক্টর কমান্ডারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা করা–এইগুলিই ছিল আমার কাজ। কিন্তু আজকে ঈদের দিন হলেও মাতৃভূমির ডাকে আবার আমাকে সৈনিকের সাজে যুদ্ধের ময়দানে যাত্রা করতে হলো।

আমরা পাশাপাশি তিনটি গানবোট চালিয়ে হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চলে অবস্থিত পাকিস্তানী ঘাঁটিগুলোর দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম, যেখানে মুখোমুখি যুদ্ধ চলছে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তান বাহিনীর মধ্যে। আমরা প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার পরে মুক্তিবাহিনীর একটা কন্টিনজেন্ট আমাদেরকে থামাল। ক্যাপ্টেন হুদার কাছ থেকে নির্দেশ এসেছে যে, আমাদের আর যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। পাকিস্তানীরা আবার পিছু হঠে গেছে এবং মুক্তিবাহিনী পুরো অঞ্চলটা দখল করে ফেলেছে। এ খবরটি পাওয়ার পরে আমরা সেই গানবোটগুলি নিয়ে ফিরে এলাম।

ক্যাম্পে ফিরে দেখলাম ঈদের জামাত শেষ হয়ে গেছে। বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে এবং ইয়ুথ ক্যাম্পগুলোতে ফিরনি জর্দা ইত্যাদি খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। আমরাও দু' একটি ক্যাম্পে যোগদান করলাম। সবার সঙ্গে ঈদের কোলাকুলি, শুভেচ্ছা বিনিময়, কুশল বিনিময়–এসবের মধ্য দিয়ে ঈদের বিলম্বিত আনন্দ উৎসব শেষ হলো আমাদের। ফিরে এলাম জলিল সাহেবের নবম সেক্টর হেড কোয়ার্টারে।

জলিল সাহেব খুবই কর্মব্যস্ত থাকতেন তখন। সেক্টর কমান্ডার হিসেবে তিনি প্রথম সারির একজন সংগঠক ছিলেন। বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে তিনি নিজের অবস্থান সুদৃঢ় এবং সুসংহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি প্রায়শই ব্যস্ত থাকতেন মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সংগঠন, কোম্পানী এবং সেকশনকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ করানোর কাজে। নবম সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল ফরিদপুরের একাংশ, মাদারীপুরের একাংশ, যশোরের একাংশ, সমগ্র খুলনা, সমগ্র বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর এবং বাগেরহাট। এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল আরো প্রায় ২৬০০ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে বিস্তৃত সুন্দরবন। নবম সেক্টরকে বাংলাদেশের এগারোটি সেক্টরের মধ্যে বৃহত্তম বলা যায়। এই নবম সেক্টরের কমান্ডার মেজর জলিল একজন নিবেদিত প্রাণ সৈনিক হিসেবে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর প্রতি সমগ্র মুক্তিযোদ্ধাদের আনুগত্য ছিল প্রচন্ড, কিন্তু একই সময়ে জলিল সাহেব জেনারেল ওসমানী এবং মিত্রবাহিনীর সুনজর কাড়তে কিংবা বলা যায় ঘনিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। এর মূল কারণ ছিল একটি ব্যর্থতা। মুক্তিযুদ্ধের সময়, মে মাসে জলিল সাহেবের নেতৃত্বে মুজিবনগর থেকে একটি বড় অস্ত্রের চালানসহ মুক্তিযোদ্ধারা সুন্দরবন হয়ে বরিশাল, পিরোজপুর, মঠবাড়িয়া এবং পটুয়াখালী অঞ্চলে ঢুকবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সাতক্ষীরার কাছে তারা পাকিস্তানী গানবোটের আক্রমণে সমস্ত অস্ত্র হারায় এবং বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাৎ বরণ করে। অবশ্য দুঃসাহসিকভাবে মেজর জলিল অল্পের জন্য বেঁচে যান এবং মুজিবনগরে ফিরে যান। তার এই ব্যর্থতাকে জেনারেল ওসমানী সহজভাবে মেনে নেননি। কারণ তিনি মেজর জলিল সাহেবকে এতো বেশি দুঃসাহসিক অভিযানের ব্যাপারে অনুমতি দিতে চাচ্ছিলেন না। জলিল সাহেব এই অভিযানের পুরো দায়িত্ব নিজের ওপরই নিয়েছিলেন। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে তাকে ব্যর্থ হতে হয়েছিল। সে কারণেই তিনি ওসমানী সাহেবের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। একইভাবে মিত্রবাহিনীর অসন্তুষ্টিও এই ঘটনা থেকে শুরু হয়েছে।

নবম সেক্টরে আমাদের এই দ্বিতীয় এবং শেষ বারের মতো অবস্থানকালে দিল্লী থেকে একজন সাংবাদিক বিবিসি'র এক প্রতিনিধিকে নিয়ে আমাদের হেড কোয়ার্টারে এসেছিলেন।

তারা যখন শুনতে পেলেন সুন্দরবন সাব সেক্টরের কমান্ডার হেড কোয়ার্টারেই অবস্থান করছেন তখন আগ্রহভরে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন এবং একটা সাক্ষাৎকার নিলেন। সেই সাক্ষাৎকারের আংশিক উপপাদ্য বিবিসি থেকে সম্প্রচারিত হয়েছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু পত্রিকা, মুজিবনগরের বেশ কিছু পত্রিকা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পত্র–পত্রিকায় আমার সেই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। কোন কোন পত্রিকা আমার কাছে পৌঁছেও ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সময়ের সাক্ষী হিসেবে সেগুলো আমি সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছি। সেসব পত্রিকায় আমাদেরকে খুব উচ্চ মূল্যায়নে দেশপ্রেমিক বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে প্রতিভাত করে আমাদের অবস্থান এবং আমাদের সঙ্গে সমগ্র জনতার অবস্থান সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা হয়েছিল। যাহোক হেড কোয়ার্টারে অবস্থান করার সময় মেজর জলিলের সঙ্গে আমার বেশ কয়েক দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মেজর জলিল যুদ্ধের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্যই আমার সঙ্গে বসেছিলেন। তিনি আমাকে যে ধারণাটা দিলেন এবং ওসমানী সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করেও যে ধারণাটা আমি পেয়েছি তাতে মনে হচ্ছিল যে শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধটা হবে এবং সময়ের এই হিসাবটা মাথায় রেখেই আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। জলিল সাহেব আমাকে ধারণা দিয়েছিলেন শীত আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনীর যৌথ চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু হতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের একটা পরিসমাপ্তি এভাবেই ঘটতে পারে।

সে সময় ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থানে একটা পরিবর্তন এবং নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফর এবং মস্কোর সঙ্গে ভারতের প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর। সেই প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরের বলে ভারতের মূল ভূখন্ডে কোন বহিঃশক্তির আক্রমণ ঘটলে ভারত সরকার চাইলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারত সরকারকে প্রতিরক্ষা সাহায্য প্রদান করবে এবং এই চুক্তির বলেই ভারত সরকার মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে তাদের বাহিনীকে মিত্রবাহিনী হিসেবে যোগদান করিয়ে চূড়ান্ত আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ভরসা পেয়েছিল, শক্তি পেয়েছিল। পরবর্তীতে, ডিসেম্বরের শুরুতে সেটাই ঘটেছে। জলিল সাহেব আমাকে পুরো ব্যাপারটাই বুঝিয়ে বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ আরো অনেকদিন চলবে এ ধারণা করাটা ভুল হবে। এটা সঠিক নয়। কাজেই যত বেশি সম্ভব এলাকাকে যত অল্প সময়ে মুক্ত করা যায় সেটাই মুক্তিবাহিনীর জন্য এখন করণীয়।' তার সঙ্গে আমি একমত হয়েছিলাম সম্পূর্ণভাবেই।

নবম সেক্টরে কয়েকদিন থাকার সময় জলিল সাহেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আমি পেয়েছি। জলিল সাহেবের বিরাট, উদার মন এবং দেশ প্রেম–এ দুটোকেই আমার কাছে সে সময় অনুকরণীয় বিষয় বলে মনে হয়েছিল। তিনি সেক্টর পরিচালনার দায়িত্ব পালনের সময় প্রায়শই আমাকে ডাকতেন। কাছে রাখতেন।

নবম সেক্টর হেড কোয়ার্টারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে সার্জেন্ট ফজলুল হক অন্যতম। তিনি পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি গৌরবময় পরিচয়ের দাবিদার সার্জেন্ট জহরুল হকের একজন সঙ্গী হিসেবে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন আসামী হিসেবে। সার্জেন্ট জহরুল হক যে রাতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পাঞ্জাবী সৈনিকদের রাইফেলের গুলি বর্ষণে নিহত হন সে রাতে তার পাশের সেলেই অবস্থান ছিল সার্জেন্ট ফজলুল হকের। নামগুলোর সাদৃশ্য দেখে অনেকের মনে হতে পারে তারা দু'জন পরস্পরের ভাই। আসলে তা নয়। সার্জেন্ট জহরুল হকের বড় ভাই হলেন বর্তমান অ্যাটর্নী জেনারেল আমিনুল হক। সার্জেন্ট ফজলুল হক ও

সার্জেন্ট জহুরুল হক ছিলেন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দেশমাতৃকার ডাকে, এদেশের মানুষের ওপর শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন এবং পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বর ভূমিকার কারণে তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীতে কর্মরত কিছু বাঙালী সৈনিকের মন বিদ্রোহ করে উঠেছিল। সার্জেন্ট ফজলুল হক, সার্জেন্ট জহুরুল হক সেই সহযোদ্ধাদেরই অন্যতম।

সার্জেন্ট জহুরুল হক নিহত হলেন। সার্জেন্ট ফজলুল হক গুলিবিদ্ধ হলেন শরীরের দুই-তিন জায়গায়। তবু অলৌকিকভাবে রক্ষা পেলেন তিনি। পরবর্তীতে তাকে আমরা পেলাম মুজিবনগরে, নয় নম্বর সেক্টর হেড কোয়ার্টারে। মেজর জলিলের অ্যাডজুটেন্ট হিসেবে কাজ করতেন তিনি। প্রচণ্ড অমায়িক এক ব্যক্তিত্ব। দেশকে তিনি ভালবাসতেই শিখেছেন; বিনিময়ে কিছু চাইতে শেখেননি। তাকে নবম সেক্টরে দেখেছি খুবই সহজ সাধারণ একটি জীবন যাপন করতে।

নবম সেক্টরে তখন প্রচণ্ড ব্যস্ততা। প্রায় প্রতিদিনই এই সেক্টরের অধীনে মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে ঢুকছে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য, শত্রুর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য, পাকিস্তানীদের সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য, মুসলিম লীগ-জামাতে ইসলামীর জারজ সন্তানদের মোকাবেলা করার জন্য। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা দৃপ্ত শপথে দেশের মাটিতে অবস্থান নিচ্ছেন। সার্জেন্ট ফজলুল হক এই বিশাল কর্মকাণ্ডের পরিচালনায়, তাদের ভালমন্দের ব্যাপারে, তাদের অস্ত্র জোগানে, তাদরে প্রশিক্ষণে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। নবম সেক্টরে আরো ছিলেন ক্যাপ্টেন সুলতান। তিনিও আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি অনারারী ক্যাপ্টেনের ভূমিকা পালন করেছেন। নৌবাহিনীর সদস্য জনাব খুরশিদও নবম সেক্টরের হেড কোয়ার্টারেই ছিলেন। তিনিও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন আসামী ছিলেন। মেজর জলিলের সহযোগী হিসেবে এরা সবাই মুক্তিযুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

সুন্দরবনে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। অল্পদিনের মধ্যেই সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করে হাজির হব সুন্দরবনের ঘাঁটি এলাকায়। জেনারেল সরকারের সেই অনুদানকৃত অস্ত্র আমরা পেতে শুরু করলাম। প্রচুর অস্ত্র নবম সেক্টর হেড কোয়ার্টারে, আমার কাছে চলে এলো। আমরা শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে সুন্দরবন থেকে আগত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে একটা ভাড়া করা বাড়িতে আশ্রয় দেয়ার ব্যবস্থা করলাম। সেই বাড়িতেই আমরা সমস্ত অস্ত্রের যোগান পাচ্ছি। হেড কোয়ার্টার থেকে যেসব নৌকায় করে অস্ত্রগুলো আমরা সুন্দরবনে নিয়ে আসব সেসব নৌকায় অস্ত্রগুলো লোড করা হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত সতের দিন মুজিবনগরে অবস্থান করে আমরা আবার যাত্রা করলাম সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে। মুজিবনগরের প্রান্ত থেকে রওনা দিয়ে ক্যানিং এবং ভারতীয় পুলিশ চৌকি বাসন্তীর পাশ ঘেঁষে, ভারতীয় সুন্দরবনের একটা অংশ পেরিয়ে সমুদ্রের মোহনা দিয়ে আমরা সুন্দরবনে প্রবেশ করলাম। সুন্দরবনের পশুর নদীতে আসার পথে একটি ঘটনার মুখোমুখি হলাম আমরা। আমাদের মূল নৌকাবহরের এক মাইল সামনে ছিল পেট্রোলিং নৌকা। সেই নৌকা থেকে ওয়ারলেসের মাধ্যমে মেসেজ এলো যে, ছোট্ট একটা নদীর পাড়ে কিছু লোকজন দেখা যাচ্ছে। আমি বললাম, 'ওদেরকে ফলো করো।' আমাদের নৌকা জায়গামত পৌঁছানোর পর আমি লোক নামিয়ে দিলাম। ওরা জঙ্গলের মধ্যে একটি হিন্দু পরিবারকে আবিষ্কার করল। জানা গেল এই হিন্দু পরিবারটি নৌকা যোগে ভারত যাচ্ছিল। পশুর নদী অতিক্রম করার সময় পাকিস্তানী গানবোটের নজরে তারা পড়ে যায়। গানবোট থেকে নিক্ষিপ্ত গোলায় তাদের নৌকাটি ডুবে যায় এবং তারা কোনরকমে শুধু নিজেদের প্রাণটি সম্বল করে সুন্দরবনের জঙ্গলে আত্মগোপন করে। গত চারদিন যাবত এই পরিবারটি কিছুই খায়নি জঙ্গলের লতাপতা ছাড়া। আমরা ওদের খেতে দিলাম। চারদিনের অভুক্ত মানুষের খাওয়ার

দৃশ্যও ভয়াবহ। কোন দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে গোগ্রাসে গিলছে। যাহোক বাবা–মা–দুটি কিশোরী মেয়ে এবং ছোট ছেলের এই পরিবারটিকে আমরা শরণখোলায় নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলাম। তারা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। এখনও এই পরিবারটির সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে।

হিন্দু পরিবারটিকে উদ্ধার করার পরদিন রাতে আমরা পড়লাম ভয়াবহ বিপদের মুখে। পাকিস্তানী গানবোটগুলো সেসময় কিছুটা কৌশলের সঙ্গে পেট্রোলিং করতো। মাঝে মাঝে তারা গানবোটের ইঞ্জিন বন্ধ করে, সমস্ত আলো নিভিয়ে বসে থাকত অন্ধকারে। তারপর হঠাৎ করেই জ্বলে উঠত গানবোটের সার্চলাইট। আমরা যখন পশুর নদী পাড়ি দিচ্ছি তখন এরকম একটা গানবোট অন্ধকারে ঘাপটি মেরে ছিল। আমরা যখন নদীর মাঝামাঝি তখন হঠাৎ করেই গানবোটের সার্চলাইট জ্বলে উঠল এবং আলোটা সরাসরি আমাদের নৌকার ওপর পড়ল। একটু হতবাক হওয়ার মতো ব্যাপার হলেও তৎক্ষণাৎ আমি রিকয়েললেস রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত। অন্যান্য নৌকাতেও ওয়ারলেস মেসেজ দিয়ে দিলাম যে, পাকিস্তানীরা গুলী করলে আমিও ফায়ার ওপেন করব। ডুবিয়ে দেব ওদের গানবোট, আমাদের যাই হোক। তবে আমাদের সৌভাগ্য, পাকিস্তানী গানবোটটা যে কোন কারণেই হোক আমাদের ওপর আক্রমণ না চালিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেল। আমার মনে হয়, দূর থেকে তারা আমাদের দেখতে পায়নি। কারণ, গানবোটের সার্চলাইট আমাদের ওপর পড়ামাত্রই আমরা নৌকা থামিয়ে দিয়েছিলাম। দূর থেকে নিশ্চল কোন বস্তুকে দেখতে পাওয়া কষ্টসাধ্য। যাহোক, এরকম মারাত্মক একটি বিপদের সম্ভাবনা কেটে যাওয়ায় আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এরপর তিনদিন অবিরাম নৌকা চালনার পরে আমরা এসে হাজির হলাম তেতুলবাড়িয়ায় অবস্থিত আমাদের ঘাঁটিতে।

আমাদেরকে ফিরে পেয়ে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে আবার আনন্দের উত্তাল ঢেউ বয়ে গেল। সমগ্র সুন্দরবন যেন আনন্দে দিশেহারা। আমার সঙ্গে এবার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রায় একহাজার মুক্তিযোদ্ধা এসেছে মুজিবনগর থেকে। তাদেরকে বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী স্টুডেন্ট ক্যাম্প, লাঞ্চিং টুপস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য ক্যাম্প এবং হেড কোয়ার্টারে নিযুক্ত করা হলো।

মুক্তিযুদ্ধের এই পর্বে আমরা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ও সুসংহত অবস্থায় ছিলাম। আমাদের সম্মুখবর্তী ঘাঁটিগুলোকে আরো বেশি শক্তিশালী করা হয়েছে এবং আমরা এখন বাগেরহাট ও পিরোজপুর–এই দুটো সাবেক মহকুমা শহরের দখল নেয়ার জন্য হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে সেকশন, প্লাটুন ইত্যাদি ফরমেশনে প্রস্তুত করছি। বাগেরহাট, পিরোজপুরকে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করে মুক্তাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা দেয়ার প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। মুজিবনগরে থাকার সময় মেজর জলিলের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারে যে আলোচনা হয়েছিল তার প্রেক্ষাপটেই আমরা ত্বড়িৎগতিতে যতোটা সম্ভব এলাকা দখল করে নিতে চাইছিলাম। পিরোজপুর–বাগেরহাট দখলের পাশাপাশি মঠবাড়িয়া, পাথরঘাটা, বামনা–এই অঞ্চলগুলোকেও মুক্ত করে সুন্দরবনের সংলগ্ন অংশকে পুরোপুরি মুক্তাঞ্চলে পরিণত করার পরিকল্পনা করলাম।

বামনা, পাথরঘাটা, বরগুনার একটা অংশ এবং পটুয়াখালীর একটা অংশ জুড়ে অবস্থান করতেন মেজর মেহেদী আলী ইমাম বীরবিক্রম। তার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম। অবশ্য চূড়ান্ত সময়ে মেজর মেহেদী আলী ইমাম মুজিবনগরে অবস্থান করছিলেন এবং যুদ্ধের একেবারে শেষ দিকে তিনি ফিরে এসেছিলেন নিজস্ব এলাকায়। যা হোক, এভাবেই আমাদের প্রস্তুতি চলছিল। নভেম্বরের একটা পর্যায়ে আমরা পাকিস্তানীদের কিছু বৈচিত্র্যময় আচরণ লক্ষ্য করেছি। তাদের আক্রমণের মাত্রাটা আগের চেয়ে একটু বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আক্রমণ করে তারা আগের মতো টিকতো না। তারা হয়তো ওপরের নির্দেশে আক্রমণ করতে বাধ্য হতো। কিন্তু আগে যেরকম তারা একদিন দুইদিন আমাদের সঙ্গে একটানা যুদ্ধ করতো সে রকম আর করতো না নভেম্বরে এসে। তখন পাকিস্তানীদের আক্রমণের ধরণ দেখে মনে হতো যেন দু'এক ঘন্টার জন্য বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে। সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, পাকিস্তানীরা যুদ্ধ করার সাহস, আগ্রহ এবং মনোবল একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে।

সুন্দরবনের অভ্যন্তরে, মংলার কাছাকাছি অবস্থানগুলোতে, বাগেরহাটের নিম্নাঞ্চল, বরিশাল, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনার নিম্নাঞ্চলগুলোতে এই সময়টায় আমাদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংঘাত হয়েছে গানবোটের। পরবর্তীতে আমরা বুঝতে পেরেছি কেন গানবোটগুলো এ অঞ্চলে বেশি তৎপর ছিল। কারণ পাকিস্তানীরা তাদের মিত্রশক্তির কাছ থেকে যে সাহায্য, সৈন্যবল, অস্ত্রবলের আশা করছিল সেটা মূলত তারা সমুদ্রপথেই আশা করছিল। কারণ মিত্রবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের মুখে আকাশপথে চলাচলের ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলবে এটা পাকিস্তানীরা বুঝতে পেরেছিল। এই জন্যই তাদের একমাত্র উপায় ছিল সমুদ্রপথ। এই উদ্দেশ্যেই তারা উপরিউক্ত অঞ্চলের সমুদ্র এলাকায় দখল কায়েম করতে চাইছিল। এই এলাকাগুলোতে তারা ঘন ঘন আনাগোনা অব্যাহত রেখেছিল। আমাদের মুখোমুখিও পড়ে যেত প্রায়শই। সংঘর্ষ হতো। তবে বেশিক্ষণ তারা থাকতো না আমাদের সামনাসামনি। সরে পড়তো। এমনটা ঘটেছে সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী প্রায় সব এলাকায়।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছি আমরা। নবম সেক্টরে অবস্থানকালে দু' একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। তার একটি হলো–মিত্রবাহিনীর সি সেক্টর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সালে আমাকে একটি ওয়ালেস সেট দিয়েছিলেন। সেটটি দিয়ে তিনি আমাকে বলেছিলেন 'যুদ্ধের চূড়ান্ত কোন পর্যায়ে তুমি যদি কোন বিপদের মুখোমুখি হও এবং আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে তুমি এই রেডিও সেট দিয়ে যোগাযোগ করতে পারবে। এই সেটের রেঞ্জ প্রায় ষোলশ' মাইল। এমনকি, তুমি চাইলে মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মানেকশ'র সঙ্গেও কথা বলতে পারো।' ব্রিগেডিয়ার সাহেব আরো বলেছিলেন, 'তুমি চাইলে তোমাদের কমান্ডার ইন চীফ ওসমানী সাহেবের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারো। নবম সেক্টর হেড কোয়ার্টারের সঙ্গেও এর মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব। এটা খুব শক্তিশালী রেডিও সেট। এটা তোমাকে দেয়া হলো।' আমি তখন মনে মনে খুব একচোট হেসেছিলাম। মনে হয়েছিল এই ওয়ারলেস সেট দিয়ে আমার কোন কাজ নেই। কারণ আমি বিপদে পড়ে সাহায্য বা সহযোগিতা চাইলেও তিনশ' মাইল দূর থেকে আমাকে সাহায্য–সহযোগিতা করার ক্ষমতা কারো নেই। জেনারেল ওসমানী সাহেব কিংবা মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মানেকশ'র সঙ্গে যোগাযোগ করার যোগ্যতাও আমার নেই। একজন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট বা লেফটেন্যান্ট মুক্তিবাহিনীর বা মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়কের সঙ্গে কথা বলার প্রটোকল পায় না। যদিও যুদ্ধের ময়দানে অনেক সাধারণ নিয়মই পাল্টে যায়। তবু ব্যাপারটা আমার কাছে একেবারেই অসম্ভব এবং আশ্চর্যজনক মনে হয়েছিল। আসলে তখন

আমি এই সেটের রহস্য এবং গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে পারিনি যেটা আরো প্রায় এক মাস পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

নবম সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে ফিরে আসার পরে পিরোজপুর বাগেরহাট অঞ্চলে একটা ব্যাপক যুদ্ধের পরিকল্পনা করছিলাম। কারণ জলিল সাহেব বলে দিয়েছিলেন শীতের শুরুতেই যুদ্ধটা শেষ হয়ে যেতে পারে। মূল আক্রমণের জন্য মুক্তিবাহিনী ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হচ্ছে। এরই মধ্যে চলছে ছোটখাট যুদ্ধ, অ্যাম্বুশ, পাকিস্তানীদের গানবোট ও অন্যান্য যানবাহনের ওপর আক্রমণ। মুক্তিযুদ্ধ যে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেটার একটা আবছা ধারণা মনের মধ্যে ছিল। স্পষ্টভাবে সবকিছু বোঝার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না। তবু চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুতি আমরা নিলাম।

মুক্তিযুদ্ধের প্রায় নয়মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। এই নয় মাসের যে বৃত্তান্ত, যে খতিয়ান আমি তুলে ধরেছি আপনাদের সামনে এটা খুবই একটা আংশিক চিত্র বলা যায়। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সেই নয় মাসের প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত, প্রতিটি মুহূর্ত ছিল দুঃখময় দুর্যোগপূর্ণ রজনীর মতো যা প্রতিটি মুহূর্তে খুব ভারী হয়ে, বেদনাক্লিষ্ট হয়ে অচল একটা গতিতে মানুষের জীবনকে ভারাক্রান্ত করতে থাকে। সেই দুঃখ রজনী যেমন শেষ হবার নয়, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের সেই সময়টাও যেন একটা বিরাট কালো অধ্যায় হিসাবে আমাদের সমগ্র জাতির বুকে চেপে বসেছিল। প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কিভাবে কেটেছে এটা প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে বিশদভাবে জানতে না পারলে আমার মনে হয়না আত্মতৃপ্তি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে সে বর্ণনা করতে পারবে। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় অংশের দাবিদার সমগ্র জাতি। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় অংশীদার সমগ্র বুদ্ধিজীবী সমাজ। সমগ্র জাতির বিবেক, সমগ্র ছাত্র সমাজ, সমগ্র রাজনৈতিক পরিমন্ডল, সমগ্র কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ যে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় অধিকারী সেই মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্বে আমরা আছি, অনেকটা না জেনে কিছুটা জেনে। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেছে। এর সঙ্গে দেশপ্রেমিক বাম সংগঠনগুলো আওয়ামী লীগ তথা মুক্তিযুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সমগ্র জনগোষ্ঠীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ন্যাপ ভাসানী, ন্যাপ মোজাফ্‌ফর, কমিউনিষ্ট পার্টি ইত্যাদি সংগঠনগুলো মুক্তিযুদ্ধে একটা অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে– এটা সবারই মানতে হবে। আমাদের মানতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং তাঁর হাতে গড়া সংগঠন আওয়ামী লীগ। আমাদের মানতে হবে, মুক্তিযুদ্ধে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে প্রবাসী সরকার মুজিবনগরে যে ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন তা সমগ্র জাতিকে এবং প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাকে উদ্দীপিত করেছে। তাদেরকে স্মরণ করতে হবে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে। আমাদের স্মরণ করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের সময় ১১টি সেক্টরের সেক্টর কমান্ডারদের। পাকিস্তান সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর বাঙালী সিনিয়র অফিসারবৃন্দসহ হাজার হাজার বাঙ্গালী সৈনিক যারা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর পক্ষ ত্যাগ করে তাদের জাতির স্বাধীনতার জন্য মাতৃভূমির মুক্তির জন্য প্রচন্ড অনিশ্চয়তার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নিজের জীবন, পারিবারিক জীবন, সমগ্র জীবনের নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে। যারা এদেশের মানুষের মুক্তির সংগ্রামে নিজেকে শরীক করেছিলেন তাদের কথা আমাদের স্মরণ করা উচিত শ্রদ্ধাবনত চিত্তে। আমাদের স্মরণ করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের লাখো শহীদকে, যারা মুক্তিযুদ্ধের এই নয়মাস সময়ে বিভিন্ন রণাঙ্গণে, দেশের বিভিন্ন স্থানে অকাতরে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন, রক্তে ভিজিয়েছেন এদেশের মাটি একটি নতুন পতাকার জন্য, একটি

নতুন জাতীয় পরিচয়ের জন্য। আমাদের স্মরণ করতে হবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সমগ্র বুদ্ধিজীবী সমাজ, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিত্রপরিচালক, বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে যারা মুক্তিযুদ্ধে সমগ্র জাতির পক্ষে তাদের সুদৃঢ় অবস্থান স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। আমাদের স্মরণ করতে হবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং সেসব দেশের জনগণকে যারা অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েই শুধু ক্ষান্ত হননি, অর্থকড়ি জুগিয়ে, অস্ত্র জুগিয়েও আমাদের সহযোগিতা করেছিলেন। আমাদের স্মরণ করতে হবে মার্কিন জনগণের কথা। সে দেশের সরকার আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করলেও মার্কিন জনগণের একটা বিরাট অংশ আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিল। আমাদের স্মরণ করতে হবে সেই সমর্থনের কথা। সর্বোপরি আমাদের স্মরণ করতে হবে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরাগান্ধী এবং তার নেতৃত্বে পরিচালিত তৎকালীন ভারত সরকারকে যারা অকুণ্ঠ সমর্থন আমাদের জানিয়েছিলেন। আমাদের স্মরণ করতে হবে,ভারতীয় মিত্রবাহিনীর আঠারো হাজার সদস্যকে যারা আমাদের পাশে এসে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। এছাড়া জ্ঞাতে, অজ্ঞাতে স্বীকৃতি পেয়ে বা না পেয়ে যারা মুক্তিযুদ্ধে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছেন তাদের প্রত্যেককে স্মরণ করতে হবে। বাঙালী জাতির কয়েক শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়ার সংগ্রামে যারা যেখানে থেকে সমর্থন করেছিলেন আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করবো। মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী মিত্রবাহিনী হিসেবে আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, আমাদের সহযোগিতা করেছিলেন, আমাদের অস্ত্র, শস্ত্র, রসদ যুগিয়েছিলেন–এটাও আমাদের স্মরণ করা উচিত। অনেকে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মিত্রবাহিনী হিসেবে ভারতীয় বাহিনীর যোগদানকে একটি বিতর্কে নিয়ে যেতে চান। তাদেরকে কেবল স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৯৪৮–৪৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ লগ্নে যখন চীনের বিপ্লবী নেতা মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বে চীনা লালফৌজ চীনের ভূখন্ড দখল করে এগোচ্ছে তখন রাশিয়ান সামরিক বাহিনী চীনের মূল ভূখন্ড দখল করে নিয়েছিল এবং সেটাও মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী সামরিক বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেছিল আট বছর পরে। কাজেই যুদ্ধে মিত্র প্রয়োজন। সেই মিত্রতা আমরা পেয়েছিলাম ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে। সেই মিত্রতা আমরা পেয়েছিলাম ভারত সরকার থেকে আরম্ভ করে ইউরোপীয় বিভিন্ন সরকারের কাছ থেকে। জাপান এবং থাইল্যান্ডের কাছ থেকে। তারা বিভিন্ন ভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন। এক কোটি উদ্বাস্তু বাঙালী ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত সরকার দীর্ঘনয়মাস তাদেরকে লালন–পালন করেছেন, চিকিৎসার সরঞ্জাম দিয়েছেন, তাদের ভরণ–পোষণের ব্যবস্থা করেছেন–এটা আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। যদি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে এসব স্বীকার করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের জাতীয় গৌরব নিয়ে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি পেতে পারবো। আর যদি এসব সত্য অস্বীকার করি তাহলে বিশ্ব দরবারে আমরা মোনাফেকের জাতি হিসেবে পরিচিত হবো। কাজেই আমার মনে হয়, সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল জনতাকে, সমগ্র রাজনৈতিক শক্তিকে এবং সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাকে ভারত থেকে, বৃটেন থেকে ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে সামরিক–বেসামরিক যেসব সাহায্য পেয়েছিলাম সেসব সব সময়ই স্মরণ করতে হবে।

সুন্দরবনের অভ্যন্তরে আমাদের সমগ্র বাহিনী রণসাজে সজ্জিত। চূড়ান্ত পরিকল্পনা আমরা নিয়ে ফেললাম। আমি সিনিয়র কয়েকজন কমান্ডারসহ পিরোজপুর ও বাগেরহাট দখলের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করলাম। এই পরিকল্পনার অধীনে অ্যাডভোকেট সামসুল হকের নেতৃত্বে দুটো কোম্পানীকে পিরোজপুর পাঠানো হলো পিরোজপুর পাড়ের হাট সড়কটা বিচ্ছিন্ন করে

দেয়ার জন্য। হাবিলদার আবেদ এবং কমান্ডার হাবিব শিকদারের নেতৃত্বে আরো দু'টি কোম্পানী আমরা পাঠালাম হুলারহাট-পিরোজপুর সড়ক বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার জন্য এবং প্রয়োজনীয় সময় পলায়নের মুখে পাকিস্তানীদের ওপর হামলা ও অ্যাম্বুশ পরিচালনা করার জন্য। হাবিলদার নওশের এবং হাবিলদার হাই, শহীদ আসাদ, হেলাল, হাবিলদার আলাউদ্দিন, আবুল কালাম মহিউদ্দিন, আব্দুল আউয়াল-এদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী পিরোজপুর বাগেরহাট সড়কের মাঝামাঝি কোন জায়গায় অবস্থান নিয়ে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবে। সেখানে তারা মর্টার স্থাপন করে প্রথমে পিরোজপুর আক্রমণের সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করবে। পিরোজপুর আক্রমণের মূল সহযোগী শক্তি পিরোজপুর-বাগেরহাট সড়ক হয়ে এগিয়ে বলেশ্বর নদী অতিক্রম করে প্রত্যূষের আক্রমণ পরিচালনা করবে। পিরোজপুর গাজীপুর সড়ক ধরে মুক্তিবাহিনীর আরেকটি কলাম পিরোজপুর আক্রমণ করবে। পিরোজপুরে পাকিস্তানীদের মূল ঘাঁটি পিরোজপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে যে স্কুলের ছাত্র ছিলাম আমি এক সময়। সেই ঘাঁটি সাড়াশি আক্রমণের মুখে থাকবে। পাকিস্তানীরা পর্যুদস্ত হয়ে কিংবা আগাম সঙ্কেত পেয়ে পালাতে চাইলে অ্যাডভোকেট শামসুল হকের বাহিনী পিরোজপুর পাড়ের হাট সড়কের ওপর তাদেরকে আক্রমণ করবে। হুলারহাট সড়ক ধরে পাকিস্তানীরা পশ্চাদপসারণ করতে চাইলে হাবিলদার আবেদ এবং হাবিব শিকদারের নেতৃত্বাধীন বাহিনী তাদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করবে। এই চূড়ান্ত পরিকল্পনা আমরা তৈরি করলাম। আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমরা পিরোজপুর ও বাগেরহাটকে মুক্ত করে মুক্তাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করবো। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগোচ্ছে। আমাদের সব রকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই আমরা প্রস্তুত। বাড়তি রসদ জোগানোর ব্যবস্থা হলো এবং সুন্দরবনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যও ব্যবস্থা নেয়া হলো। ঠিক এই অবস্থায়, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঘটনাক্রম অন্যদিকে ঘুরে গেলো।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে, পাঁচ তারিখ রাতে ভারত সরকার বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিল।

পাঁচই ডিসেম্বর রাতে এক বেতার সম্প্রচারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করলেন এবং একই সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীকে মুক্তিবাহিনীর মিত্রবাহিনী হিসাবে যুদ্ধে যোগদানের ঘোষণা দেয়া হলো। অপ্রত্যাশিত না হলেও ব্যাপারটা কিছুই বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। কারণ, এত তাড়াতাড়ি স্বীকৃতি পেয়ে যাওয়া এবং যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছি, এটা ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল যে, শত্রুরা বাংলার মাটিতে থেকে যাচ্ছে। স্বল্পকালীন যুদ্ধে শত্রুকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং নির্মূল করার যথেষ্ঠ সময়-সুযোগ আমরা পেলাম না। এই আক্ষেপ আমার মনটাকে ভারাক্রান্ত করে ফেললো। আমি নিশ্চুপ হয়ে হেড কোয়ার্টার্স বোটে বসে রইলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রায় তিরিশ চল্লিশজন কমান্ডার এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইল। অনুমতি দেয়ার পর তারা এসে হাজির হলো আমার সামনে। তারা বলল,'স্যার এই আনন্দের খবরে আমরা একটু আনন্দ -উৎসব করতে চাই। আমরা কিছু গুলি ফুটিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই রাতটাকে পালন করব।

আমি বুঝতে পারলাম যুদ্ধের কৌশলগত এবং জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক অবস্থাগত যে চিন্তা আমাকে একটু ভাবিয়ে তুলছে ও আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেটা অন্যদেরকে সেভাবে ভাবায়নি। তাই ওদের আনন্দকে নিরানন্দে পরিণত করতে মন চাইল না। অল্প কিছু গুলি আকাশের দিকে ফুটিয়ে আনন্দ-উৎসব করার অনুমতি দিলাম। বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে গুলীর আওয়াজ ভেসে এলো। আমাদের ক্যাম্প থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল। মুক্তিযোদ্ধারা উৎসব করছে। আমাদের ক্যাম্প এলাকা জয়বাংলা ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। প্রায় সারা রাত জয়বাংলা ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হলো সুন্দরবনের গভীর অরণ্য।

আমি নিশ্চল-নির্বাক হয়ে বসেই রইলাম। বুঝতে পারছিলাম, মুক্তিযুদ্ধের মূল বিষয়টিই অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। যাই হোক, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রচন্ড উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা

গেল। আমরা আমাদের পরিকল্পনা মতো প্রস্তুত হচ্ছি। মাঝখানে বাদ সাধলেন আমাদের বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড জনাব সামসুল আলম তালুকদার। ৬ ডিসেম্বর সকাল বেলা তিনি এক অদ্ভুত আবেদন নিয়ে আমার কাছে এসে হাজির। তিনি বললেন, 'স্যার, আপনি এই থ্রি ইঞ্চ মর্টার, রিকয়েল লেস রাইফেল নিয়ে এসেছেন মুজিবনগর থেকে। এগুলো বড় অস্ত্র । এগুলো আগে আমার কখনো ব্যবহার করিনি। এখন আমরা এই অস্ত্র ব্যবহার করবার অনুমতি চাই। শরণখোলা থানার ওপর আক্রমণ করে এই অস্ত্রগুলো আমি পরখ করতে চাই।' তালুকদার সাহেবের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন আলতাফ বলে উঠলেন, 'স্যার শরণখোলা যখন আক্রমণ হচ্ছে তখন আর মঠবাড়িয়া বাকি থাকবে কেন? নদীর পূর্ব পাড়েই মঠবাড়িয়া। আমি আমার বাহিনী নিয়ে সেই থানা আক্রমণ করতে চাই।' আমি রাজি হলাম। ছয় তারিখ বিকালে শরণখোলা থানা আক্রমণ করা হলো। আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। সামসুল আলম তালুকদারের নেতৃত্বে হাবিলদার আলতাফউদ্দিন, হাবিলদার সোহরাব, শহীদ আসাদ, শহীদ টিপু এবং হেলাল ছিল আক্রমণের মূল ভাগে। শহীদ টিপুর ব্যাপারে এখানে একটা কথা বলতে হয়। সে এই আক্রমণে যোগ দিয়েছিল পালিয়ে এসে। কারণ এর আগে কয়েকটা যুদ্ধে তাকে অতিরিক্ত সাহস নিয়ে যুদ্ধ করতে দেখে আমার মনে একটা ধারণা হয়েছিল যে, ক্লাশ এইটে পড়া ছাত্রটির মধ্যে এখনো পরিপক্কতা আসেনি। কিন্তু মাতৃভূমির জন্য তার দরদ অনেক। সাহস অনেক। এই সাহসী যোদ্ধা এত অল্প বয়সে অতিরিক্ত সাহস দেখাতে গিয়ে শহীদ হয়ে যাক–এটা আমি চাইনি। তাই তাকে আমি যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে নিষেধ করেছিলাম এবং সিনিয়র কমান্ডারদের বলা ছিল যে, টিপুকে কেউ যুদ্ধে নিয়ে যাবে না। কিন্তু টিপু যখন জানতে পারল শরণখোলা থানায় আক্রমণ করা হচ্ছে তখন সে পালিয়ে গিয়ে সামসুল আলম তালুকদারের সঙ্গে যোগ দিল এবং শরণখোলা আক্রমণে অংশ নিল।

সন্ধ্যার একটু আগে শরণখোলা আক্রমণ শুরু হলো। আমি বেশ কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করায় ফিরে এলাম শরণখোলার সম্মুখ ঘাঁটিতে। শরণখোলা ফরেস্ট অফিসেই আমাদের সেই সম্মুখ ঘাঁটি। ঘাঁটিতে ফিরে আসার পর আমার প্রচন্ড জ্বর উঠলো। আমি যেখানে অবস্থান করছি সেখান থেকে প্রায় আট মাইল দূরবর্তী শরণখোলা থানার ওপর মুক্তিযোদ্ধারা চড়াও হয়েছে।

এদিকে ক্যাপ্টেন আলতাফের নেতৃত্বাধীন বাহিনী নৌকায় বলেশ্বর নদী অতিক্রম করে মঠবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল।

রাতের বেলায় প্রচন্ড জ্বর আমার গায়ে। ডাক্তার এলেন। তিনি জ্বরের প্রচন্ডতা দেখে বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন। তিনি আমাকে ঘুমের ঔষধ দিয়ে এবং সামান্য কিছু খাইয়ে দিয়ে চলে গেলেন। যাবার আগে অবশ্য ঘাঁটির অন্যান্যদের বলে গেলেন আমাকে যেন কোন অবস্থাতেই জাগানো না হয় ঘুমিয়ে গেলে। ঘুমের ঔষধের কারণে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার যখন ঘুম ভাঙল তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। রাত সাড়ে তিনটা কি চারটা হবে। কাদের পায়ের আওয়াজে যেন ঘুমটা ভেঙ্গে গেল হঠাৎ করেই। চোখ খুলে দেখি আমার সামনে বসে আছেন সামসুল আলম তালুকদার। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আরো কয়েকজন কমান্ডার। তাকে দেখেই আমি আঁতকে উঠলাম। তালুকদার সাহেবের চেহারায় দুঃসংবাদের ছাপ– না জানি কী দুর্ঘটনার খবর নিয়ে এরা এসে হাজির হয়েছে? আমি সোজা উঠে বিছানায় বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'খবর কি?' সামসুল আলম তালুকদারের মুখ নীচু। ভারী কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন, 'আসাদ, আলাউদ্দিন, টিপু আলতাফ এবং গৌরপদ শহীদ হয়ে গেছে।' আমি বললাম,'কি করে সম্ভব?' বললো,'যে কভারিং ফায়ার নিয়ে তারা এগোচ্ছিল সেই কভারিং ফায়ার হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা শত্রুর গুলি বর্ষণের মুখে শাহাদাৎ বরণ করে। তাদের লাশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর এখন আমাদের কি অবস্থা?' সামসুল আলম তালুকদার বললেন 'আমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে কিছুটা পিছু হঠে এসেছি।' শুনে আমার মাথার মধ্যে যেন রক্তের আগুন

বয়ে গেল। আমি 'শাটাপ' বলে চিৎকার করে উঠলাম, 'আমার যেখানে রক্ত দিয়েছি আজ পর্যন্ত সেখান থেকে যুদ্ধ জয় না করে পিছু হঠিনি।' তালুকদারকে খুব ভর্ৎসনা করলাম, বকাবকি করলাম এবং বললাম,'আপনি এখই ফিরে যান। আপনার মুখ আমি দেখতে চাই না। কাল সকাল নয়টার মধ্যে 'আমি দেখতে চাই শরণখোলা থানার পতন হয়েছে।' সামসুল আলম তালুকদার অ্যাটেনশন হয়ে যথারীতি সালাম জানিয়ে মাথা নিচু করে চলে গেলেন। আমি অনেকটা পাথরের মতো নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলাম। গত সাত–আট মাসের যুদ্ধে যারা আমার ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদের মধ্যে তিন–চারজন দক্ষ এবং সাহসী কমান্ডার প্রাণ বিসর্জন দিলেন শরণখোলা আক্রমণে। আমি আর ঘুমাতে পারলাম না। আবার ডাক্তার এলেন। আমার পরিচর্যায় মুক্তিযোদ্ধা যারা ছিলো সকলেই আমাকে নিয়ে একটু চিন্তিত। কিন্তু আমার করার কিছু নেই। মনটা প্রচন্ডভাবে ভারাক্রান্ত। মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েছে। এতবড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সেটা আমি দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। যাই হোক, সুন্দরবনের গভীর অরণ্যের পাশে, শরণখোলা ফরেস্ট অফিসে বসে আমরা শুনতে পাচ্ছি শেষ প্রহরের আহবান। হরিণের ডাক। বাঘের গর্জন। পাখির ডাক। সব মিলিয়ে সূর্যোদয়ের ঘোষণা। সূর্য উঠল।

আমি অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম। হেলালসহ আরো দু'জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে আমি স্পীডবোটে করে শরণখোলার দিকে রওনা দিলাম। আমার সঙ্গে পিস্তল এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে একটি লাইট মেশিনগান ও অন্যান্য ছোট অস্ত্র।

শরণখোলার প্রায় কাছাকাছি গিয়ে আমি স্পীডবোট ভিড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলাম। আমরা নেমে পড়লাম সেখানে। দেখা গেল শরণখোলা থানা এবং শরণখোলার আরেকটা প্রাইভেট বিল্ডিংয়ে রাজাকাররা সুরক্ষিত আস্তানা গেড়েছে। আমরা যখন বোট থেকে পাড়ে উঠে ওয়াপদার ফেরির ওপর দিয়ে শরণখোলার দিকে এগোচ্ছি তখন বুঝতে পারলাম যে ঐ দালানগুলোর ওপর থেকে রাজাকার–আলবদররা আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে। হেলাল আমাকে বলল, 'স্যার,আমাদের দিকে গুলি আসছে।' সো সো করে কানের পাশ দিয়ে দু'এটি গুলি চলে গেল। হেলাল বলল, 'স্যার, আমাদের পজিশন নিয়ে এগানো উচিত।' আমি খুব নির্ভয়ে হেলালকে জিজ্ঞেস করলাম 'আমাদের কাছ থেকে ঐ বিল্ডিংগুলোর দূরত্ব কতোটা হবে?' হেলাল বলল, 'স্যার, আটশ গজেরও বেশি।' আমি বললাম, 'তাহলে নির্ভয়ে হেঁটে চল।' কারণ সামরিক বিদ্যায় এটুকু অন্তত জানি যে, তিনশ'গজের পরে নিশানা ঠিক করে কাউকে গুলি করা যায় না। শত্রুকে হত্যা করতে চাইলে কিংবা আঘাত করতে চাইলে অন্তত তিনশ'গজের মধ্যে তাকে পেতে হবে। তাই হেলালকে বললাম, 'তুমি নির্ভয়ে এগোতে থাকো। ওরা যতোই গুলি করুক, এইম করে আমাদের গায়ে লাগাতে পারবে না। তুমি আমার সাথে আস। আমি যেভাবে হাঁটছি সেভাবে হাঁট।' আমরা প্রায় তিনশ' গজ অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী একটা গ্রামে ঢুকে পড়লাম। চলা অবশ্য থামাইনি। শরণখোলা থানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। গ্রামের প্রান্তে বিরাট একটা ধানের ক্ষেত এবং এই ক্ষেতের পরেই শরণখোলা থানা বিল্ডিংয়ের অবস্থান। বিল্ডিংটি দোতলা। আমরা যখন গ্রামের প্রান্তে এসে ধান ক্ষেতে নেমে পড়েছি সেই সময় প্রায় ছয়শ' মুক্তিযোদ্ধা জয়বাংলা ধ্বনিতে চারপাশ কাঁপিয়ে থানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং থানা দখল করে ফেলল। আমি ধান ক্ষেতের এক প্রান্তে আর পাঁচ–ছয়শ' গজ দূরে মুক্তিযোদ্ধারা। অবশ্য তারা তখনো জানে না যে আমি তাদের পেছনে এসে হাজির হয়ে গেছি। থানা দখল করার পর পরই তারা সমস্ত শত্রুদের গ্রেফতার করল। আহতদের সরিয়ে ফেলল। সমগ্র থানা বিল্ডিংয়ের ওপর স্থাপিত হল তাদের কর্তৃত্ব।

উত্তেজনার বশে জ্বরাক্রান্ত শরীর নিয়ে ঘাঁটি থেকে রওনা দিয়েছিলাম শরণখোলা থানার দিকে। স্পীডবোট থেকে নামার পর ছয়–সাতশ' গজ হাঁটতে গিয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই হেলাল এবং আরেকজন মুক্তিযোদ্ধার কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে।

শরণখোলা থানা বিল্ডিংয়ের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রায় দশ হাজারের মতো গ্রামবাসীও অংশ নিয়েছিল। এটা একটা আশ্চর্যের বিষয়। দশ হাজারেরও বেশি জনতা মুক্তিযোদ্ধাদের পেছনে পেছনে এগোচ্ছিল থানার দিকে। চূড়ান্ত আক্রমণে জয়বাংলা বলে যখন তারা থানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন তাদের পেছনে পেছনে জনতাও সেখানে গিয়ে চড়াও হয়ে গেল। হাজার হাজার মানুষ একাকার। তার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুদেরকে বিভিন্ন স্থানে গ্রেফতার করছে, আটক করছে। তাদেরকে হাতকড়া পরাচ্ছে। পা বেঁধে ফেলছে। এর মাঝে আমি প্রায় অর্ধেকটা মাঠ অতিক্রম করে এসেছি। ক্লান্তি যেন আমাকে আর এক পাও চলতে দেয় না। ঠিক এমন সময় জনতার ভেতর থেকে কয়েকজন এবং মুক্তিযোদ্ধারা কেউ কেউ আমাকে আবিষ্কার করে ফেলল। আমার জলপাই রংয়ের একটা জামা ছিল যেটা বানিয়েছিলাম জেনারেল সরকারের সঙ্গে দেখা করার পরে। এই জামাটা গায়ে দিয়ে আমি যখন ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছি তখন কিছু মুক্তিযোদ্ধা আমাকে চিনে ফেলেছিল। সাথে জনতাও। আমার চুলও তখন বেশ বড় হয়ে গেছে। চিনে ফেলে তারা জয়বাংলা ধ্বনি দিয়ে নেমে পড়ল ধানক্ষেতে এবং সমগ্র ধান ক্ষেতটাকে লোপাট করে দিয়ে আমার কাছে পৌছল। আমাকে কাঁধে তুলে একটা ঝটিকা মিছিলের মতো থানা বিল্ডিংয়ের কাছে পৌছে গেল। আমি জ্বরের কারণে গায়ে একটা কম্বলও জড়িয়ে রেখেছি। স্পীডবোটে চড়ে আসব, বাতাস লাগবে তাই এই সতর্কতা। যাহোক, আমি তখনও মুক্তিযোদ্ধাদের কাঁধে। ঠিক সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ রাখার পর অনুরোধ করায় তারা আমাকে নিচে নামাল। আমি নেমে দেখতে পাচ্ছি মুক্তিযোদ্ধারা শত্রু পক্ষের অস্ত্র-গোলাবারুদ আলাদা আলাদা করে রাখছে। আমার সামনে চারজন রাজাকার ও তিনজন আলবদরকে পেছনে হাত বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সামসুল আলম তালুকদার এরই মধ্যে চলে এসেছেন। আমাকে সালাম জানিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম যুদ্ধের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে। তিনি বললেন, 'মূল ঘাঁটির পতন হয়েছে। এখন প্রাইভেট একটা বিল্ডিংয়ে রাজাকার আলবদররা অবস্থান করছে। দু'চার মিনিটের মধ্যে সেটারও পতন ঘটবে।' এর মধ্যে আমি সামসুল আলম তালুকদারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই যে লোকগুলোকে পেছনে হাত বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে- এরা কারা?' বসিয়ে রাখা সাতজনের মধ্যে একটা লোককে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'এটা হচ্ছে আলবদর বাহিনীর জল্লাদ। এই জল্লাদ শত শত মানুষকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে গত আট-নয় মাস। গত রাতে আমরা যখন যুদ্ধে একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পড়েছিলাম, শহীদ আসাদ, টিপু এবং আলাউদ্দিন যখন আহত অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল তখন এদেরকে আলবদররা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছে এবং এই লোকটা হচ্ছে মূল জল্লাদ।' জল্লাদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। মাতৃভূমির কসম খাওয়া এক মানুষ আমি। আমার সমস্ত শিরা-উপশিরা যেন রক্তের হোলিখেলা দেখতে চাইল। জল্লাদের সামনে একজন মুক্তিযোদ্ধা একটা এস এল আর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আস্তে, ধীরগতিতে মুক্তিযোদ্ধার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাতের এস এল আর নিজের হাতে নিয়ে নিলাম। তারপর সেটা কক করে গুলি লোড করলাম। এরপর সেই জল্লাদকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সামসুল আলম তালুকদার যা বলেছে সেটা সত্য?' ও বলল, 'স্যার সত্য। কিন্তু জীবনে আমি আর এমন অপরাধ করব না। আমি যে অপরাধ করেছি জীবনে আর তা করব না।' তখন আমি বললাম, 'অপরাধের স্বীকার যখন করেছ তখন জীবনে আর সে অপরাধ করার সুযোগও তোমাকে দেয়া হবে না।' এই বলে আমি ওর বুকে একটা লাথি মারলাম। লোকটা ধড়াশ করে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। আমার পায়ে জাঙ্গল বুট। বুটটা ওর বুকের ওপরে চেপে ধরলাম। তারপরে এস এল আরের নলটা ওর বুকে লাগিয়ে একটা-

দুটা–তিনটা–চারটা–পাঁচটা–ছয়টা করে একে একে আঠারোটা গুলী ঢুকিয়ে দিলাম। আঠারোটা গুলি বেরিয়ে যাওয়ার পর যখন উনিশতম গুলীটা বেরোতে যাবে তখন ট্রিগারের নলটা বাড়ি খেল খালি চেম্বারে–ক্লিক। গুলী শেষ। তখন আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চারিদিকে তাকালাম। দেখলাম আমার পাশে কেউ নেই। সেই দশ সহস্রাধিক জনতার ঢেউ–সবাই গিয়ে দূরে একটা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দেখছে। তালুকদারসহ মুক্তিযোদ্ধারাও জড়ো হয়েছে থানার একটা কক্ষে এবং কক্ষের জানালা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দেখছে। তারা হয়তো ভেবেছিল এতো প্রিয় সহযোদ্ধা কমান্ডারদের হারানোর ব্যথায় আমাদের কমান্ডার সম্ভবত পাগল হয়ে গেছে। উন্মাদ হয়ে গেছে। আলবদরের জল্লাদকে তো গুলি করে মারল এখন কাকে মারে ঠিক নেই–এসব ভেবেই সম্ভবত তারা অনেকটা নিরাপদ দূরত্বে নিজেদের সরিয়ে দিয়েছে। এটা বুঝতে পেরে আমি হেসে ফেললাম। সবাইকে ডাকলাম। চিৎকার করে বললাম, 'কাছে আস। কি মনে করেছ? আমি কি পাগল হয়ে গেছি নাকি? আমি ঠিকই আছি। শত্রুর ওপর কিভাবে প্রতিশোধ নিতে হয় সেটা তোমাদের দেখালাম।' এটা বলার পরেই সবাই আমার কাছে এলো। আমি আমার হাতের রাইফেলটা ছুঁড়ে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দিয়ে দিলাম।

শরণখোলায় রাজাকারদের দ্বিতীয় অবস্থান একটা প্রাইভেট বিল্ডিংয়ে। সেটার তখনো পতন হয়নি। বিল্ডিংটা আওয়ামী লীগ নেতা নাসির সাহেবের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বছরখানেক আগে নিহত আওয়ামী ছাত্রলীগ নেতা মনিরুজ্জামান বাদলের বাবা এই নাসির সাহেব। রাজাকাররা তার বিল্ডিংটা দখলে নিয়ে যথেষ্ঠ ক্ষতি সাধন করেছিল এবং চূড়ান্ত আক্রমণের সময় আমরাও সেটার ক্ষতিই করেছিলাম, রাজাকারদের ঘায়েল করতে গিয়ে। নাসির সাহেব আমাদের তথা মুক্তিযোদ্ধাদের যথেষ্ঠ সাহায্য সহযোগিতা করেছেন সে সময়। তার এ ক্ষতি দুঃখজনক হলেও আমরা ছিলাম নিরুপায়।

থানা থেকে বিল্ডিংটার দূরত্ব প্রায় সাতশ গজ। বিল্ডিংয়ের ভেতর রাজাকাররা বাংকার তৈরী করেছিল এবং তৈরী করেছিল একটি সুড়ঙ্গ–যেটার মুখ পেছনের নদীতে গিয়ে মিশেছে। ওদের প্ল্যান ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের মুখে সুড়ঙ্গ দিয়ে পেছনের নদী পথে পালিয়ে যাওয়া। বাস্তবে হচ্ছেও তাই। আমি সামসুল আলম তালুকদারকে কিছুটা অসহিষ্ণু হয়েই প্রশ্ন করলাম, 'নাসির সাহেবের বিল্ডিংটার পতন হচ্ছে না কেন? আমারা দখল নিতে পারছি না কেন?' তালুকদার সাহেব বললেন, 'স্যার, ভেতরে বাংকার। আমাদের ছেলেরা এগোতে পারছে না।' আমি বললাম, 'থ্রি ইঞ্চ মর্টার চার্জ করেন। থ্রি ইঞ্চ মর্টারের গোলা বর্ষণ করেন।' থানার পাশেই একটা ছোট্ট বাগান বাড়ি। সেই বাড়িতে থ্রি ইঞ্চ মর্টার বসানো ছিল। আমার হুকুম পেয়ে মর্টারের গোলা নিক্ষেপ শুরু হল। তিন–চারটা গোলা নিক্ষেপ করা হলো। কিন্তু নিশানা ব্যর্থ। একটাও বিল্ডিংয়ে আঘাত করেনি। এটা জানতে পেরে আমি একটু ক্ষিপ্ত হয়ে গেলাম। ছুঁড়ে ফেললাম গায়ে জড়ানো কম্বলটা। তারপর তালুকদারসহ সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বাধা অগ্রাহ্য করে দৌঁড়ে গিয়ে লাফ দিয়ে মাটিতে শুয়ে ক্রলিং করে সেই মর্টারের কাছে হাজির হলাম। মর্টার কমান্ডার একজন হাবিলদার। তার নেতৃত্বাধীন মর্টার ডিটাচমেন্ট। আমি তাদের সঙ্গে একাত্ম হলাম। আমি দেখতে পেলাম মর্টারের অবস্থানের ওপর নাসির সাহেবের বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে রাজাকার বাহিনী গুলি চালাচ্ছে। আমি বললাম, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ওরা সাতশ গজ দূরে। ওখান থেকে আমাদের ওপর ওরা গুলি বর্ষণ করে কিছু করতে পারবে না। কিন্তু তোমাদের মর্টারের গুলি ওদের ওপর আঘাত করছে না কেন?' এই বলে আমি মর্টারের এলিভেশন ও ডিফ্লেকশন দেখতে চাইলাম। দেখলাম মর্টার কমান্ডার ভুল করেছে। মর্টারের এলিভেশন ডিফ্লেকশন ঠিক নয়। যেহেতু আমি গোলন্দাজ বাহিনীর একজন

একজন অফিসার সেহেতু এ ব্যাপারে আমার প্রশিক্ষণ, ধারণা সবই আছে। আমি নতুন ডিফ্লেকশনে মর্টারকে ঠিক করে গোলা নিক্ষেপ করতে বললাম। প্রথম গোলাটিই একেবারে নির্ভুল লক্ষ্যে বিল্ডিংয়ের ছাদের ওপর একেবারে মাঝখানে গিয়ে আঘাত করল এবং বিল্ডিংয়ের যথেষ্ঠ ক্ষতি সাধন করল। দ্বিতীয়, তৃতীয়–এভাবে প্রায় ছয়–সাতটা গোলা ঐ বিল্ডিংয়ের ওপরে গিয়ে পড়ল ছাদটা বিধ্বস্ত হয়ে গেল। নীচেও ক্ষয়ক্ষতি হলো। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা জয় বাংলা বলে দূরন্ত ঢেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিল্ডিংয়ের ওপর এবং সেটা দখল করে নিল।

ওদিকে জেলেরা আর নৌকার মাঝিরা সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া আলবদর রাজাকারদের ধরে ধরে আমাদের কাছে নিয়ে এলো। এভাবে শরণখোলা থানা দখল করা হল সাত তারিখ সকাল বেলা।

জনতার সে কি উচ্ছ্বাস! ভাবতে আশ্চর্য লাগে। সকাল থেকে যখন নতুন করে আবার প্রচন্ড গোলাগুলি হচ্ছে তখন জনতা খাবার–দাবার নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দিচ্ছে এবং চূড়ান্ত আক্রমণের সময় জনতা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করল। এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার! যা হোক শরণখোলা দখল হয়ে যাওয়ার পরে দুপুরবেলা আমি ফিরে এলাম ফরেস্ট অফিসে, আমাদের সম্মুখবর্তী ঘাঁটিতে। সন্ধ্যাবেলা ক্যাপ্টেন আলতাফ এসে হাজির। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি খবর?' আলতাফ খুব হেসে বলল, 'শরণখোলা থানা আক্রমণের খবর, মর্টার এবং রিকয়েললেস রাইফেলের গোলার আওয়াজ শুনে মঠবাড়িয়া থানার রাজাকার–আলবদররা বিনা যুদ্ধে, বীরের মতো আত্মসমর্পণ করেছে।' মঠবাড়িয়ায় আলতাফ অবশ্য মজার একটি কান্ড করেছে। সে থানা থেকে সাত আটশ' গজ দূরে একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেই জায়গায় ইঁট, বালু, সিমেন্ট দিয়ে কংক্রিটের একটা ভিত তৈরী করতে শুরু করল। এটা ছয় তারিখ বিকালের ঘটনা। শরণখোলা থানায় রাজাকাররা বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সাত তারিখ সকাল বেলা ক্যাপ্টেন আলতাফ মঠবাড়িয়ার রাজাকার–আলবদরদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে খবর পাঠাল এই বলে যে, শরণখোলা থানায় যেসব মর্টার ব্যবহার করা হয়েছে সেসব মর্টার মঠবাড়িয়ায় পাঠানো হচ্ছে এবং এই মর্টার বসানোর জন্যই কংক্রিটের ভিত বানানো হচ্ছে। এতবড় গোলা ছোঁড়া হবে যে, রাজাকার–আলবদররা কেউই বাঁচবে না। ক্যাপ্টেন আলতাফের কংক্রিটের ভিত তৈরি, শরণখোলার গোলাগুলির আওয়াজ শুনে এবং সেখানকার রাজাকারদের সমূলে ধ্বংস করার খবর কয়েক ঘন্টার মধ্যে পেয়ে গিয়ে তারা বিকালেই বিনা যুদ্ধে বীরের মতো সমস্ত অস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে এসে আলতাফের কাছে সারেন্ডার করেছে।

সাত–আট ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন জায়গায় পলায়নপর পাকিস্তানীদের ওপর অ্যাম্বুশ করল। পাকিস্তানীরা সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে যাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম যে, ওরা পালাবার চেষ্টা করছে। এ অবস্থায় চার পাঁচটি জায়গায় তাদের ওপর হামলা চালানো হল এবং তাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি এতে হয়েছে। আট তারিখে অ্যাডভোকেট শামসুল হক পিরোজপুর থেকে সুন্দরবনে চলে এলেন। সাত তারিখে শরণখোলা ও মঠবাড়িয়ার পতন পিরোজপুর এবং মঠবাড়িয়ার ওপর প্রচন্ড প্রভাব ফেলেছে এবং পাকিস্তানীরা পালিয়ে গেছে। এখানে দুঃখের বিষয় হল, পাকিস্তানীরা পিরোজপুর থেকে হুলারহাট সড়ক দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল ঠিক আমাদের অ্যাম্বুশের সামনে দিয়ে। কেউ দৌড়ে, কেউ হেঁটে বিধ্বস্ত পাকিস্তানীরা পালিয়ে যাচ্ছিল বরিশালের দিকে। হুলারহাট সড়কে অ্যাম্বুশের কমান্ডার হাবিলদার আবেদ আলী সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিশ্চুপ হয়ে থাকতে হুকুম দিলেন। তার অধীনস্থ কমান্ডার হাবিব শিকদার তখন হাবিলদার আবেদকে জিজ্ঞেস

করল, 'পাকিস্তানীরা এভাবে পালিয়ে যাচ্ছে, তারা বিধ্বস্ত, তারা জীবন নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে–তাহলে আমরা কেন তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি? আমাদেরকে তো অ্যাম্বুশ করতেই পাঠানো হয়েছে।' হাবিলদার আবেদ তখন যুদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়ার কাপুরুষোচিত মানসিকতা নিয়ে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। পরে হাবিব শিকদার ও অন্যান্য কমান্ডারকে বলল, 'ক্যাপ্টেন সাহেবের যুদ্ধ শুরু করার হুকুম নাই।' এটা সর্বৈব মিথ্যা। পরবর্তীতে আমি পিরোজপুর আসার পর এই ঘটনা যখন জানতে পারি তখন হাবিলদার আবেদকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। সে প্রায় কয়েক সপ্তাহ কারাগারে কাটিয়েছে। সে যা করেছে সেটা যুদ্ধের মাঠে একটা বিরাট অপরাধ। যুদ্ধের মাঠে অর্পিত দায়িত্ব পালন না করলে নিয়মানুযায়ী তাকে কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি হতে হয়। এতটা কঠিন ব্যবস্থা না নিলেও আমি তাকে সরাসরি পিরোজপুর জেল হাজতে পাঠিয়েছিলাম। যা–ই হোক, সুন্দরবনে এসে হাজির হলেন এ্যাডভোকেট শামসুল হকসহ দু'একজন মুক্তিযোদ্ধা। তাদের বক্তব্য পাকিস্তানীরা গত রাতে পালিয়ে গেছে এবং অনতিবিলম্বে আমার পিরোজপুরে হাজির হওয়া উচিত। বরিশালের কমান্ডার ক্যাপ্টেন ওমরের একটা কন্টিনজেন্ট ভান্ডারিয়া হয়ে এখন পিরোজপুরে অবস্থান করছে। এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। এ্যাডভোকেট শামসুল হক এসব সংবাদ দেয়ার পরে স্পীডবোট নিয়ে পিরোজপুরের দিকে রওনা হলাম। পিরোজপুরের পাড়ের হাট বন্দরে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সেসময় পাড়ের হাট বন্দরটি আমাদের কয়েকশত মুক্তিযোদ্ধার নিয়ন্ত্রণে। যেহেতু এটা অন্যতম মুখ্য নদীর বন্দর সেহেতু পাকিস্তানীদের যে কোন পাল্টা হামলা মোকাবেলার জন্য এখানে দৃঢ় একটি অবস্থান প্রয়োজন। মুক্তিবাহিনী উপযুক্ত ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছে সে অর্থে।

আমাদের স্পীডবোট বন্দরের কাছে এগিয়ে এলে মুক্তিযোদ্ধারা চ্যালেঞ্জ করল, 'কোত্থেকে স্পীডবোট এসেছে? কাদের স্পীডবোট?' আমার স্পীডবোট থেকে মুক্তিযোদ্ধারা উত্তর দিল, 'স্পীডবোট সুন্দরবন থেকে এসেছে।' পাড়ের হাটের মুক্তিযোদ্ধারা বুঝতে পারল স্পীডবোটে আমিই এসেছি। কারণ স্বাভাবিকভাবে স্পীডবোটে চলাচলের মতো সামর্থ আমাদের নেই। জ্বালানী তেল স্পেয়ার পার্টস এগুলো পাওয়া যায় না। মুক্তিযোদ্ধারা বুঝতে পারল যেহেতু সুন্দরবন থেকে স্পীডবোট এসেছে সুতরাং তাদের সাবসেক্টর কমান্ডার সেখানে রয়েছে। শুরু হল গগণবিদারী শ্লোগান। হাজার হাজার জনতার সমাগমে পাড়ের হাট বন্দরে একেবারে জমজমাট অবস্থা। স্পীডবোট বন্দরে এসে ভিড়ল। আমি বোট থেকে নামার পরে আবেগ আপ্লুত সর্বস্তরের মানুষ আমাকে জড়িয়ে ধরতে শুরু করল। আনন্দ ও দুঃখের অতিরিক্ত চেতনায় কান্নায় ভেঙে পড়ছে তারা। এরই মধ্যে এক বৃদ্ধ আবেগের অতিশয্যে আমার গালে একটা চুমু বসিয়ে দিল। এরপরে অন্যান্য যারা রয়েছে তাদের ধারণা হলো এখন আমাকে চুমু খাওয়াটা তাদের কর্তব্য। ব্যস, আর যায় কোথায়। দাড়ি গোঁফ অলা মুখের চুমু খেতে খেতে আমি হয়রান। আমার দুই গালের অবস্থা শোচনীয়। এইভাবে টানাহ্যাচড়ার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। নিয়ন্ত্রণটা এখন সামগ্রিকভাবে উদ্বেলিত জনতার হাতে। তারা আমাকে নিয়ে একটা রিকশার ওপর দাঁড় করাল এবং দু'পাশ থেকে দুটো হ্যাজাক লাইট আমার মুখের ওপর ধরে রাখল। হাজার হাজার মানুষ চারপাশে। তারা বলল, 'আপনি দাঁড়িয়ে থাকেন, আপনাকে আমরা একটু দেখি। জঙ্গলে কেমন ছিলেন, কিভাবে বেঁচে আছেন, এখন আপনার চেহারা স্বাস্থ্য কেমন–আমরা একটু দেখি।' এই বলে দুটো হ্যাজাক লাইট আমার মুখের সামনে ধরে তারা দাঁড়িয়ে থাকল। বেশ কিছুক্ষণ পর আমি অনুনয়ের সুরে বললাম, 'ভাই, আর তো এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব না। আপনারা দেখেছেন সবাই। আবার দেখা হবে। আমাদের কাজ আছে। দেশ এখনো সম্পূর্ণ মুক্ত হয়নি। কাজেই যুদ্ধ সামনে রয়ে গেছে। আপনারা দোয়া করবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় আছেন। আমরা অবশ্যই জিতব। আমাদের বিজয়ের যাত্রা শুরু হয়েছে। আপনারা সতর্ক থাকুন। আপনারা হুশিয়ার থাকুন। চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। আমাদের স্বাধীনতার সূর্য এখন উঠবে–সেই মুহূর্ত আমাদের

উঠবে–সেই মুহূর্ত আমাদের সামনে।' একথা বলে পাড়েরহাট থেকে আমরা রিকশায় করে পিরোজপুর শহরের দিকে রওনা হলাম। এদিকে আমরা রওনা দেয়ার আগে আমাদের একজন শুভানুধ্যায়ী পাড়েরহাট পোষ্ট অফিস থেকে ফোনে পিরোজপুর থানা এবং আমার বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দেন যে, আমরা পাড়েরহাট থেকে পিরোজপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছি। আমরা সবাইকে জড়ো করে, গুছিয়ে রওনা দিতে দিতে প্রায় দশপনের মিনিট ব্যয় হল। এরমধ্যে অন্যান্য যাত্রীরা রিকশায় করে রওনা হয়ে গেছেন। তারা যাওয়ার পথে সবাইকে বলে বলে যাচ্ছেন যে সাবসেক্টর কমান্ডার জিয়াউদ্দিন সাহেব পাড়েরহাট থেকে আসছেন। অদ্ভুত ব্যাপার, এই খবর পাওয়ার পর রাস্তায় রাস্তায় লোকজন বেরিয়ে পড়ল। কারো হাতে হ্যারিকেন, কারো হাতে কুপি, কারো হাতে টর্চ। জনতার ভিড়ে রিকশার চলাই মুশকিল। পাড়ের হাট থেকে পিরোজপুর পর্যন্ত পাঁচমাইল পথ পেরোতে আমাদের প্রায় পাঁচ ঘন্টা সময় লাগল। এর মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে মা–বোনেরা। তারা কেউ কেউ আবার চাল ভেজে এনেছে, কেউ মোয়া এনেছে, কেউ একটু ডাবের পানি এনেছে। খেতেই হবে–এমন একটা অবস্থা। এইসব করতে করতে যখন ঘন্টার পর ঘন্টা দেরী হচ্ছে, পিরোজপুরে পৌছতে পারছিনা তখন পিরোজপুরের মুক্তিযোদ্ধারা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। কারণ দেশ এখনো শত্রুমুক্ত নয়। রাজাকাররা সবাই সারেন্ডার করেনি। তারা কেই কেউ পালিয়ে গেছে। কেউ কেউ লুকিয়ে আছে। এ অবস্থায় মাত্র পাঁচ মাইল দূর থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যেও পিরোজপুর পৌছতে পারছিনা–এটা দুঃশ্চিন্তা করার মতোই একটা ব্যাপার। এ অবস্থায় পিরোজপুরের মুক্তিযোদ্ধারা হাবিব শিকদারের নেতৃত্বে একটা কোম্পানী পাঠাল পাড়ের হাটের দিকে। তারা মার্চ করতে করতে প্রায় অর্ধেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে এমন সময় আমাদের সঙ্গে দেখা। দুঃশ্চিন্তা করার মতো কিছু নেই শুনে তারা খুশি। যাই হোক সেখান থেকে আমরা চলে এলাম পিরোজপুরে।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, পাড়ের হাট–পিরোজপুর সড়কের শেষ প্রান্তে আমাদের বাড়ি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে আমার বাবা যখন আইন ব্যবসায় যুক্ত হন তখন এই বাড়িটি করেছিলেন। দীর্ঘদিন পর বাড়ি ফিরলাম। বাড়িতে ঢুকে বাবা–মাকে সালাম করলাম। রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা। বাবা–মা তো আমাকে পেয়ে একেবারে আত্মহারা–আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো অবস্থা। হাজার হাজার মানুষ আমাদের বাড়ির মধ্যে জমায়েত হয়েছে। গমগম করছে সারা বাড়ি। মুক্তির প্রত্যাশায়, দুঃস্বপ্নময় কালো রাত্রির অবসানে সমগ্র জনতা যেন গভীর স্বস্তির শ্বাস ফেলার সুযোগ পেয়েছে। সকলের সঙ্গে দেখা করা কিংবা কথা বলা সম্ভব নয়। যুদ্ধ শেষ হয়নি। নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি এখনই হয়তো নিতে হবে। বাবা–মার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপ সেরে অল্প সময়ের মধ্যে থানায় চলে এলাম। সেখানে ক্যাপ্টেন ওমর অপেক্ষা করছেন আমার জন্য।

ক্যাপ্টেন শাজাহান ওমর বীর উত্তম সম্পর্কে আগেই বলেছি। তার বাহিনীর চলমান ঝটিকা আক্রমণকে মুক্তিযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল এবং কার্যকর কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পিরোজপুর থানায় ক্যাপ্টেন ওমরের সঙ্গে পরিচয় হল। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল সেটারও অবসান ঘটল। এরপর ক্যাপ্টেন ওমরকে নিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। সে সময় আমাদের বাড়িতে বলতে গেলে কিছুই নেই। বাবা একজন প্রথম সারির আইনজীবী ছিলেন। তার প্রায় পঁয়ত্রিশ–চল্লিশ বছরের উপার্জিত সম্পত্তির সবটাই পাকিস্তানীরা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল। পোড়া টিন দিয়ে একটা বস্তির মতো ঘর বানিয়ে বাবা–মা সেখানে থাকতেন। সেই ঘরের মধ্যেই আমি এবং ক্যাপ্টেন ওমর মায়ের পরিবেশনায় রাতের খাবার খেলাম। মা রান্না করেছিলেন মুরগীর মাংস, মাছের ঝোল, আলু ভর্তা ইত্যাদি। আমাদের সঙ্গে সিনিয়র কয়েকজন কমান্ডারও সেখানে খেতে বসলেন। খাওয়া দাওয়ার পর ক্যাপ্টেন ওমরকে ডাকবাংলোয় পাঠিয়ে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান ঘাঁটি পিরোজপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে অবস্থান নিলাম।

পরদিন সকালে কোনরকম ঘোষণা ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে টাউন হল ময়দানে বিশাল এক জনসমাবেশ ঘটল। আমি এবং ক্যাপ্টেন ওমর সেখানে বক্তব্য রাখলাম। তারপর ক্যাপ্টেন ওমর তার বাহিনী নিয়ে পিরোজপুর থেকে বিদায় নিলেন। এরপরে আইনজীবী সমিতি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে আমাকে সেখানে সম্বর্ধনা দেয়ার উদ্যোগ নেয়। আইনজীবী সমিতির সভাপতি হচ্ছেন আমার বাবা। এই উদ্যোগটি অবশ্য আমার বাবার নয়। মূলত তরুণ আইনজীবীদেরই বলা চলে। শেষ পর্যন্ত সেই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানকে সর্বস্তরের জনগণের একটা সমাবেশ বললে ভুল হবে না। আইনজীবী সমিতিকে ঘিরে পাঁচ সাত হাজার মানুষের ভিড়। আইনজীবী সমিতির মধ্যে আইনজীবীরা আছেন, মহাকুমা প্রশাসক, অন্যান্য অফিসার, মুনসেফ এবং তৎকালীন মহকুমা প্রশাসনের যারা ছিলেন তাদের প্রায় সবাই আছেন। এর মধ্যে একটা দূর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কয়েকজন কমান্ডার তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক এসডিও সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন কোন একটা কাজে। এসডিও সাহেব এমনিতেই নিজেকে একটু অপরাধী মনে করতেন পাকিস্তানী প্রশাসনের একজন চাকুরে হিসেবে কাজ করার কারণে। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের কাজ অবশ্যই করে দিয়েছিলেন। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি দু' একটা ইংরেজী শব্দ বলে ফেলেছিলেন। ইংরেজী শব্দ উচ্চারণের অপরাধে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডাররা টাই ধরে তাকে প্রচন্ড অপমান করে। সকালের এই ঘটনার খবর লোক মারফত আমার কাছে পৌঁছে যায়। এরপর আইনজীবী সমিতির সম্বর্ধনা সভায় আমি ইচ্ছা করেই ইংরেজীতে বক্তৃতা করলাম। বক্তব্যের মধ্যে গুছিয়ে বললাম, বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা আন্দালন, ৫২ থেকে আজ পর্যন্ত যে সব আন্দোলান হয়েছে সেগুলো কোন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নয়। স্বাধীনতার আন্দোলন একটা প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এখানে অন্য ভাষার স্থান আছে। দ্বিতীয় ভাষার স্থান রয়ে গেছে। পরিভাষার স্থান আছে। অবশ্য সবকিছুর উর্ধ্বে অবশ্যই আমরা বাংলা ভাষাকেই স্থান দেব। কিন্তু সেটা যেন আমাদেরকে একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে নিয়ে গিয়ে সমগ্র বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন না করে। আমাদের আন্দোলনটা যেন এমন একটা সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে গিয়ে আটকা না পড়ে। এটা বোঝানোর জন্যই আমি আইনজীবী সমিতির সম্বর্ধনা সভায় প্রায় দুঘন্টা ইংরেজীতে বক্তৃতা করলাম। এবং কারণটা বুঝিয়ে বললাম–কেন আমি ইংরেজীতে বক্তব্য রাখছি।

যাহোক যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আগের দিনই আমরা খবর পেয়েছি বাগেরহাটে পাকিস্তানী বাহিনীর পতন হয়েছে। রফিকুল ইসলাম ও তাজুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনী বাগেরহাট শহরের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছে। বরিশাল শহরেও পাকিস্তানী বাহিনী ক্যাপ্টেন ওমরের বাহিনীর কাছে পরাজিত এবং সেখানে ক্যাপ্টেন ওমর এবং তার বাহিনী খুব শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করেছে। পটুয়াখালী শহরের পতন হয়েছে কোন যুদ্ধ ছাড়াই। সেখানকার পাকিস্তানী সৈন্যরা নির্দ্বিধায় অবস্থান ত্যাগ করে পালিয়ে গেছে। এই হচ্ছে সার্বিক অবস্থা।

আমি পরের দিন সুন্দরবনে ফিরে এলাম। এসে দেখতে পেলাম সেই ষোলশ মাইল রেঞ্জের রেডিও সেটটি জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। রেডিও সেটের মাধ্যমেই খবর এসেছে যে, মার্কিন সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোচ্ছে এবং আমরা যেন সেটাকে পর্যবেক্ষণে রাখি। এর দুদিন পরে আবার রেডিও মেসেজ পেলাম মিত্রবাহিনী ও জেনারেল ওসমানীর কাছ থেকে। খবরটি হল সপ্তম নৌবহরের এয়ার ক্রাফ্ট ক্যারিয়ার–এন্টারপ্রাইজ সুন্দরবনের দুবলার চর থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে অবস্থান নিয়েছে। পলায়নপর পাকিস্তানীরা সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। মেসেজে নির্দেশ এল আমরা যেন সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখি।

এর দুদিন পরে আবার রেডিও মেসেজ পেলাম–রাশান নেভীর একুশতম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসরমান। প্রয়োজনে যেন আমরা সমস্ত সাহায্য তাদেরকে প্রদান করি। দুটো পরাশক্তির দুটি পারমাণবিক ক্ষমতা সম্পন্ন নৌবহর বঙ্গোপসাগরে মুখোমুখি অবস্থান নিল।

জলিল সাহেবের নেতৃত্বে নবম সেক্টরের বাহিনী সাতক্ষীরা হয়ে খুলনার পথে এগোচ্ছে। পথে তারা কয়েক জায়গায় সম্মুখ সমরে পাকিস্তানীদের পরাস্ত করল। ১৪ই ডিসেম্বর আমি আবার পিরোজপুরে ফিরে এলাম। পিরোজপুরে এসে মিত্রবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারদের কাছ থেকে মেসেজ পেলাম, আমি যেন আমার নেতৃত্বাধীন বাহিনী নিয়ে খুলনায় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকি। খুলনা শহর এবং শহরের উপকণ্ঠে পাকিস্তানীরা বেশ দুর্ভেদ্য ঘাটি গড়ে তুলেছিল। তখনো পর্যন্ত সেই বাহিনীকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়নি। পনের তারিখ পেরিয়ে ষোল তারিখ ঢাকায় নিয়াজীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত হয়ে গেল। কিন্তু এখনো খুলনার পতন হচ্ছে না। সুন্দরবনের অধিকাংশ বাহিনী, পিরোজপুরে অবস্থানরত বাহিনী এবং বাগেরহাটে অবস্থানরত আমাদের বাহিনী প্রস্তুতি নিচ্ছি আক্রমণের।
১৯ শে ডিসেম্বর আমরা প্রস্তুত আক্রমণের জন্য। এমন সময় খবর এল খুলনার পতন হয়েছে। আমি খুলনা গিয়ে জলিল সাহেবকে পেলাম সার্কিট হাইজে। জলিল সাহেব আমাকে সার্বিক অবস্থাটা বুঝিয়ে বললেন, আমাদের করণীয় কি ইত্যাদি ইত্যাদি।

আট তারিখের পর থেকেই আমি আমার নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন অঞ্চলের কমান্ডারদের কাছে নির্দেশ পাঠালাম–নারী ধর্ষণ, হত্যা, লুন্ঠন, ডাকাতি এবং অগ্নিসংযোগের অপরাধের অপরাধী এমন সমস্ত রাজাকার আলবদর আলশামসকে ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠাতে হবে। ফায়ারিং স্কোয়াডের কাজ চলবে সুন্দরবনে।
মিসেস্ গান্ধী ঘোষিত স্বীকৃতির একদিন পর আমি সুন্দরবনে নতুন করে ফায়ারিং স্কোয়াডের একটা শক্ত কন্টিনজেন্ট গড়ে তুলেছিলাম–চব্বিশ ঘন্টাই কাজ চলবে এখানে। যারাই নারী ধর্ষণ, ডাকাতি, লুন্ঠন, গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগের অপরাধে অপরাধী সে ধরনের কাউকেই ক্ষমা করা চলবে না কিংবা গতানুগতিক ভাবে জেলে পুরে রাখাও চলবে না। তাদেরকে সরাসরি সুন্দরবনে,শরনখোলা পাঠাতে হবে। সেখানেই এই সমস্ত বিশ্বাসঘাতকের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। অবশ্য এই ক্ষেত্রটিতে আমরা বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের নির্দেশ লংঘন করেছি। প্রবাসী সরকারের নির্দেশ ছিল যে বিশ্বাসঘাতকদের যেন জেলে পুরে রাখা হয়। তারপরে তাদের বিচার হবে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের যে সারমর্ম আমি বুঝেছিলাম তাতে আমার মনে হয়েছে যে এই পর্যায়ে শত্রুকে বাঁচিয়ে রেখে, জেলে রেখে ভরণ পোষণ করিয়ে দয়াদাক্ষিণ্য দেখাবার কোন সুযোগ মুক্তিযুদ্ধের আওতায় পড়েনা। কাজেই সরকারী প্রচার মাধ্যম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যে নির্দেশগুলো প্রচারিত হচ্ছিল তার মধ্যে সেই নির্দেশটি আমি মানিনি।
এমনি ভাবে ১২,১৩,১৪,১৫,১৬ তারিখ–এ দিনগুলোতে আমরা পিরোজপুর থেকে লঞ্চ বোঝাই করে যুদ্ধাপরাধীদের সরাসরি সুন্দরবনে, ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠিয়েছি। একদিনের একটি ঘটনার কথা বলা যায়। খুব সম্ভব ডিসেম্বরের ১২ কি ১৩ তারিখ হবে। আমি পিরোজপুরে অবস্থান করছি। পিরোজপুর থেকে বরিশাল কিংবা ঝালকাঠি এমন কোথাও আমি যাব। হাজার মানুষের ভিড় বাড়ির মধ্যে। এমন অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা একজন কমান্ডার এসে আমাকে রিপোর্ট করল, 'দু লঞ্চ বোঝাই করে যুদ্ধাপরাধীদের সুন্দরবনে পাঠানো হচ্ছে। আমি সম্মতি জানালাম। এরপর আমার যাত্রার পালা। হাজারো মানুষের ভিড় ঠেলে এগোচ্ছি। মা হেঁটে হেঁটে আমার পিছু পিছু বাড়ির সামনের রাস্তা পর্যন্ত আসবেন আমাকে বিদায় জানানোর জন্য। মানুষের ভিড় ঠেলে উঠোন দিয়ে আমরা এগোচ্ছি। মুক্তিযোদ্ধারা কিছুটা নিরাপত্তা রক্ষা করছে। এমন সময় এক মহিলা তার শিশু বাচ্চাসহ হঠাৎ করে আমার দু'পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল।
সে আধো আধো বাংলায় বলতে শুরু করল ' আমার স্বামীকে বাঁচান', আমার স্বামীকে বাঁচান, আমার স্বামীকে মেরে ফেলবে–আমার স্বামীকে বাঁচান।' আমি তাকে একটু সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি অপরাধ আপনার স্বামীর?' তখন সেই ভদ্রমহিলা উত্তর দেয়ার আগেই পাশ থেকে জনতার একজন উত্তর দিল, 'তার স্বামী হচ্ছে সাবডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার

এবং সে একজন নন বেঙ্গলী। গত নয় মাস পিরোজপুর শহরে হাজারো মেয়ের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে এবং বহু মেয়েকে ধরে পাকিস্তানী সৈন্যদের ক্যাম্পে নিয়ে গেছে। অনেক মেয়েই আর ঘরে ফিরে আসেনি। অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করেছে।' এ ধরনের কথাগুলো জনগণের কাছ থেকে আমার কানে এল। তখন আমি বললাম, 'আপনার স্বামীকে তো আমি ছাড়তে পারবো না। কারণ সে এধরনের অপরাধ করেছে।' কোন উপায় না দেখে ভদ্রমহিলা গিয়ে আমার মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল। মাকে খুব অনুনয় করে সে বলতে শুরু করল, 'আমি আম্মি— আমার স্বামীকে বাঁচান... আপনার ছেলেকে বলেন, .. আমার স্বামীকে বাঁচান।' মায়ের মন একটু বিগলিত। মা আমার কাছে এলেন। বললেন, 'বাবা,যুদ্ধ প্রায় শেষ। দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। এখন এই লোকটাকে না মারলে হয় না? এই মেয়েটা বিধবা হয়ে যাবে।'

মা'র অনুরোধ শুনে আমি খুব দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেলাম। ভাবলাম এখন মায়ের অনুরোধ তো প্রত্যাখান করতে পারছিনা। অন্যদিকে একজন যুদ্ধাপরাধীকে তো ক্ষমাও করতে পারছিনা। তখন আমি মাকে বললাম, 'তা হলে আপনি শোনেন, আমি জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করছি। দেখি তারা কি বলে। তারা যা বলে তাই হবে।' মা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ঘরের সামনের বাঁধানো সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ছোট একটা বক্তৃতা দিলাম। সামনে দাড়ানো দুই তিন হাজার মানুষ। উঠোন ভরা।তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাইসব আজকে আমি একটা বিরাট প্রশ্নের সম্মুখীন। একদিকে মায়ের অনুরোধ অপরদিকে একজন যুদ্ধাপরাধী। একজন সাবডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার যে অপরাধ করেছে তাকে কি ক্ষমা করা যায়?' তখন জনতার যে মানসিক অবস্থা সেই অবস্থার প্রতিফলন ঘটল তাদের সম্মিলিত উত্তরে। তারা বলল, 'না, না ক্ষমা করা যাবে না গুলী চাই গুলী চাই'। তখন আমি হেসে উঠে সেই মহিলার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'বোন, আপনার স্বামী এই দেশের বহু মেয়ের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে। বহু মেয়ের জীবনের সর্বনাশ করেছে। সুতরাং আপনার জীবনের সর্বনাশও আমি রোধ করতে পারছিনা।' এই বলে আমি চলে গেলাম। দুই লঞ্চ বোঝাই করে যুদ্ধাপরাধীদের নেয়া হল সুন্দরবনে।

এর কিছুদিন পরে মিসেস গান্ধীর সচিবালয় থেকে একটি টেলিগ্রাম এল। এর পেছনে ঘটনা হচ্ছে–সেই ভদ্রমহিলার আসল বাড়ি ভারতের উত্তর প্রদেশে এবং এই মহিলার এক চাচা উত্তর প্রদেশের রাজ্য সরকারের একজন মন্ত্রী। এই ভদ্রমহিলা যখন বুঝল যে আমার কাছে অনুরোধ করাতেও কাজ হবে না তখন সে সরাসরি সীমান্ত অতিক্রম করে কলকাতা হয়ে উত্তর প্রদেশে গিয়ে তার চাচাকে ধরে মিসেস গান্ধীর দরবারে হাজির। সে কারণেই মিসেস গান্ধীর কাছ থেকে টেলিগ্রাম। সেই ইঞ্জিনিয়ার কোথায়, সে বেঁচে আছে কিনা, থাকলে কোথায়–এসব জানতে চাওয়া হয়েছে তারবার্তায়। বরিশালের ডিসির কাছে, পিরোজপুরের মহকুমা প্রশাসকের কাছে আর আমার কাছে এক কপি করে টেলিগ্রাম এসে পৌছল। আমি প্রথমে টেলিগ্রামটি পাইনি। কারণ বরিশাল, খুলনা এইসব জায়গায় ব্যস্ত ছিলাম। বাড়ি ফিরে আসার পর টেলিগ্রামটি পেলাম। আমার মধ্যে তেমন প্রতিক্রিয়া হয়নি। কিন্তু দেখা গেল এসডিও সাহেব আমাকে খুব খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এসডিও সাহেব এসে বাড়িতে হাজির। তিনি বেশ কিছুটা বিচলিত। মিসেস গান্ধীর কাছ থেকে টেলিগ্রাম... এটাতো আর হেলাফেলা করা যায়না, জবাবদিহি করতে হবে। আমি এসডিও সাহেবকে বললাম, 'আপনি শান্ত হন। এনিয়ে জবাবদিহি করবার তো কিছু নেই। আর যা করতে হয় তা আমি করব।' তখন এসডিও সাহেব বললেন, 'ডিসি সাহেবও টেলিগ্রাম পেয়েছেন এবং ডিসি সাহেব আপনাকে অনুরোধ করেছেন যাতে করে এই টেলিগ্রামের সদুত্তর দেয়া হয়।' তিন কি চারদিন পরে ডিসি সাহেব এসে হাজির। ডিসি, আমি এবং এসডিও সাহেব একত্রে বসলাম। ডিসি সাহেব, এসডিও সাহেব একেবারে নির্বাক। তারা ভেবেই পাচ্ছেন না, এই টেলিগ্রামের উত্তর কি হবে। আমি বললাম, 'উত্তর তেমন কিছু হবে না। উত্তর খুব সহজ। উত্তর হবে, যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হি ইজ মিসিং।'

ডিসি আর এসডিও সাহেব তখন বললেন, 'তাহলে এটা আপনার নামে লিখে পাঠান।' আমি হেসে বললাম, 'ঠিক আছে, আমার নামেই পাঠাব।' সেভাবেই টেলিগ্রামটা গেল। এরপরে আর আমরা মিসেস গান্ধীর কাছ থেকে পরবর্তী কোন অনুসন্ধান বা খোঁজ খবর করা টেলিগ্রাম পাইনি।

দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। সমগ্র জনতা বিরাট আনন্দ উচ্ছ্বাস এবং বুক ভরা আশা নিয়ে মাতৃভূমির নতুন অবস্থানের স্বাদ বুকে উপলব্ধি করেছি। চারদিকেই সাড়া পড়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে মুক্তিবাহিনীর মিলিশিয়া ক্যাম্প গঠন করা হল এবং মুক্তিবাহিনীকে ২৬ তারিখ এক ঘোষণায় অস্ত্র সংবরণ করতে বলা হলো। অস্ত্র জমা দিতে বলা হলো। মানসিক ভাবে আমি এই নির্দেশ মানতে পারিনি। অবশ্য অস্ত্র আমরা জমা দিয়েছি। সরকারের নির্দেশ তো অমান্য করা যায় না। সদ্য স্বাধীন দেশ। এ দেশে বৃথা হানাহানি কিংবা এ জাতীয় কোন পথ অবলম্বন করাকে আমি সঠিক মনে করিনি। কিন্তু একই সময়ে যতটুকু রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি তাতে জানি, পৃথিবীর কোন দেশেই মুক্তিযোদ্ধাকে অস্ত্র জমা দিতে বলা হয় না। বরং মুক্তিযোদ্ধাকে স্বাধীনতার উষালগ্নে বলা হয় শত্রুকে নিধন করতে, শত্রুর শেষ চিহ্ন ধ্বংস করে ফেলতে। কিন্তু আমাদের দেশে হলো উল্টো। মুক্তিযোদ্ধাদের বলা হলো অস্ত্র সংবরণ করতে, অস্ত্র জমা দিতে। পিরোজপুরসহ বাগেরহাট, বরিশাল এই অঞ্চলগুলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের মিলিশিয়া ক্যাম্প গঠন করা হলো। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা মিলিশিয়া ক্যাম্পগুলোতে আছে। এখানে খাবারের অসুবিধাসহ আরো বিভিন্ন অসুবিধা হতো। কিন্তু সেগুলোকে আমরা বড় করে দেখিনি। কারণ, একটা সদ্য স্বাধীন দেশে এধরনের প্রতিকূলতা মানতেই হয়। কিন্তু বারবার পীড়া দিচ্ছিল একটা চিন্তা–মুক্তিযোদ্ধারা নিরস্ত্র হয়ে যাবে। এটা কেমন নির্দেশ। এবং এই নির্দেশের ফলে মুক্তিযুদ্ধের পুরো ব্যাপারটি একটি অন্তসার শূন্য পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে–এটা বয়সে তখন তরুণ হলেও আমি অনুধাবন করতে পেরেছিলাম। প্রচন্ড মানসিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলাম তখন। কিন্তু করবার কিছু নেই। যে সরকারের অধীনে আমরা মুক্তিবাহিনী গঠন করেছি, যে সরকারের অধীনে মুক্তিযোদ্ধাদের সেক্টর, সাবসেক্টরে ভাগ করে আমাদেরকে কমান্ডার নিয়োগ করা হয়েছে সে সরকারের নির্দেশ অমান্য করবার প্রশ্ন আসে না ঠিকই। কিন্তু সেই নির্দেশ কতটুকু উপযুক্ত ছিল আমরা তার প্রমাণ আজকের বাংলাদেশের পথে ঘাটে সব জায়গাতেই পাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার কর্মসূচী আমরা পেলাম। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারগার থেকে মুক্তি পেয়ে সরাসরি লন্ডনের পথে– এটা আমাদের জন্য অবশ্যই একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা। আনন্দের খবর। বঙ্গবন্ধু ফিরে আসছেন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের কেন্দ্রীয় কমান্ড থেকে শুরু করে সব জায়গাতেই সমন্বয়ের প্রচন্ড অভাব আমরা দেখতে পেলাম। বঙ্গবন্ধুর আগমন, তাঁর ঢাকায় অবতরণ ইত্যাদি ঘটনাগুলো সারাদিন রেডিও খুলে মিলিশিয়া ক্যাম্পে বসে আমরা শুনলাম। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনলাম। নিরাশা–আশার দ্বন্দ্বের মাঝে আমরা নিশ্চুপ, নির্বাক হয়ে আছি।

আমরা জানিনা বঙ্গবন্ধু দেশে আসার পরে সঠিক অবস্থানটা সহকর্মীদের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে পদক্ষেপগুলো নিতে পারবেন কিনা।

বঙ্গবন্ধু আসার কর্মসূচী সেক্টর কমান্ডারদের দেয়া হলো। কিন্তু সাবসেক্টর কমান্ডাদের এই কর্মসূচীতে দাওয়াতটুকু পর্যন্ত করা হয়নি। যা-ই হোক, জলিল সাহেব আমাকে খবর পাঠালেন যে তিনি সড়ক পথে যশোর হয়ে ঢাকা পৌছাবেন এবং বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানানোর যে আয়োজন করা হয়েছে সেখানে তিনি উপস্থিত থাকবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা পরের দিন খবর পেলাম যে জলিল সাহেবকে যশোরে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের এই পর্বে আমার মনে হয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সামরিক নেতৃত্বের উভয় অংশই মারাত্মক অনেকগুলো ভুল করেছেন। একটা সশস্ত্র যুদ্ধের পরিসমাপ্তিকে এর সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দূরদৃষ্টি, কর্মসুচী, উদ্যোগ এবং সমন্বয়-এর কোনটাই আমরা পেলাম না। অবশ্য আমরা তখন জুনিয়র অফিসার। সার্বিক অবস্থাটা আমরা ততোটা বুঝিনি আর বুঝতে পারলেও যারা সমন্বয়ের দায়িত্বে এবং নেতৃত্বে তাদেরকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। এই পর্বের মধ্য দিয়েই মুক্তিযুদ্ধের অবস্থানটা শেষ আমাদের কাছে নির্দেশ আসে যেন আমরা মিলিশিয়া ক্যাম্পগুলো গুটিয়ে দিয়ে নিয়মিত বাহিনীতে যোগদান করি। মিলিশিয়া ক্যাম্পগুলো গুটিয়ে নিতে আমাদের প্রায় দেড় মাস সময় লেগে যায়। এই দেড় মাসের মধ্যে বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরিশাল-এই অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক হতাশা থেকে মুক্ত করে বুঝিয়ে বাড়িতে ফেরত পাঠানো ছাড়া আমাদের কোন উপায় ছিল না। এ অবস্থায় মধ্যে জলিল সাহেব গ্রেফতার হওয়ার পরে মেজর জয়নাল আবেদীন নবম সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি প্রচন্ড একজন মুজিব ভক্ত, আওয়ামী লীগ ভক্ত হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেন। তিনি আমাদেরকে তার কমান্ডের অধীনে নিয়ে খুব একটা স্বস্তি পাচ্ছিলেন বলে আমার মনে হয় না। কারণ জয়নাল আবেদীন সাহেব মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে, নভেম্বর মাসের শেষ দিকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। কাজেই মাঠের মুক্তিযোদ্ধা, যারা গত নয়মাস পাকিস্তানীদের সঙ্গে এবং পাকিস্তানীদের এদেশীয় মিত্র জামাত-শিবির-রাজাকার, এদেশের জারজ সন্তানদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অংশ গ্রহণ করেছে, আহত হয়েছে, শহীদ হয়েছে তারা খুব সহজে মেজর জয়নাল আবেদীনকে তাদের কমান্ডার হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। সেখানে একটা সংঘাতময় অবস্থান ছিল। অবশ্য আমরা সেটাও মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছি এবং চূড়ান্তভাবে সফলও হয়েছি।

মুক্তিযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই একটা গুজব সারা বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়া হলো। বলা হলো যে, কোন দেশেই মুক্তিযুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচিয়ে রাখা হয় না। তাদেরকে হত্যা করা হয়। তাদেরকে গুলী করে হত্যা করা হয়-এটাই সমস্ত দেশের নিয়ম। এই গুজবটা, আমি মনে করি কোন একটা স্বার্থান্বেষী মহল ছড়াচ্ছিল। মুক্তিযদ্ধের শেষে পিরোজপুরের অবস্থানে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, যাদের অধিকাংশই যুদ্ধের সময় মুজিবনগরে অবস্থান করেছেন তারা দেশে ফিরে এলেন। তাদের সঙ্গেও আমরা একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করেছি। তারাও চেষ্টা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছি, অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ।

মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র অবস্থান এবং সশস্ত্র একটি বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করা, তাদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ও সচেতন করে তোলার কোন ব্যবস্থা মুজিবনগর সরকার বা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ নিতে পারেননি। আজকে আমরা যখন দেখি মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন উপদলীয় কোন্দলে জড়িয়ে আছেন তখন বুঝতে পারি এটা আজকের ফসল নয়। এর বীজ রোপিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই। তারই ফসল আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করলে আজকে এ অবস্থার সৃষ্টি হতো না। মুক্তিযোদ্ধারা যার যার অবস্থানে ফিরে যাবে-এটাই তখনকার সরকারী নির্দেশ ছিল। কিন্তু সেই নির্দেশটাও প্রচন্ড একটা ভুল নির্দেশ বলে আমি তখনও মনে করতাম, এখনো মনে

করি। কারণ, পৃথিবীর যেসব দেশে সশস্ত্র বিপ্লব, সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলন হয়েছে সেসব দেশে বিজয়ের পরে সেদেশকে গড়ে তোলবার দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং মুক্তিযোদ্ধারা সমভাবে ভাগ করে নিয়েছে। এর বহু উদহরণ আমরা এশিয়া সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেখতে পাই। মুক্তিযুদ্ধের সিনিয়র কমান্ডার, বিশেষ করে কমান্ডার ইন চীফ, সেক্টর কমান্ডার, সাবসেক্টর কমান্ডার–এদের মধ্যে সমন্বয়ের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এদের সমঝোতা এবং সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের একক চিন্তার বিকাশ ঘটুক–এটা করতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন এবং সেই ব্যর্থতার বোঝাই আজকে আমাদের বইতে হচ্ছে। অবশ্য এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণও রয়েছে। এক অর্থে বলা যায় মুক্তিযুদ্ধ খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। চূড়ান্ত যুদ্ধের স্থায়িত্ব ছিল ডিসেম্বরের পাঁচ–ছয় তারিখ থেকে ষোল তারিখ পর্যন্ত–এই দশ এগারো দিন। কাজেই একদিকে সময়ের স্বল্পতাও একটা কারণ। কিন্তু কর্মসূচী নিলে সময়ের স্বল্পতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারতো না, যেহেতু ব্যাপারটা বিজয়ের পরেও করা যেতো। মুক্তিযুদ্ধের সিনিয়র কমান্ডার, সেক্টর কমান্ডার, সাবসেক্টর কমান্ডারসহ বিভিন্ন এলাকায় ছাত্র, কৃষকের সন্তান, সাধারণ পেশাজীবী, সেনাবাহিনী কিংবা অন্য কোন বাহিনীর একজন সৈনিক কিংবা একজন নন কমিশন্ড অফিসার–সে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে নিজের সাহসী ভূমিকার কারণে একজন দক্ষ কমান্ডার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে এধরনের কমান্ডারদের সংখ্য বড়জোর তিন থেকে চার হাজারের মধ্যে। এই তিনচার হাজার কমান্ডারকে নিয়ে একটা সমঝোতা, একটা সমন্বয়, একটা দিক নির্দেশনা–এটা যুদ্ধের পরেও করা যেতো। এবং বঙ্গবন্ধুই এটা করতো পারতেন কিন্তু আমরা দেখেছি এটা করাতো হয়ইনি, বরং বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে তেজস্বী মুক্তিযোদ্ধাদের, তেজস্বী কমান্ডারদেরকে কিভাবে দূরে সরিয়ে রাখা যায় এই ষড়যন্ত্র তখন একটা বিশেষ কোটারী সবসময়ই চালাত। সে কারণেই মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধের পরে অনেকটা এতিমের মতো হয়ে পড়েছিল এবং তারা কখনোই সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি পায়নি। তাদের যে গৌরব গাঁথা এটা সরকার স্বীকার করেনি। চূড়ান্তভাবে স্বীকার করেনি। বস্তুনিষ্ঠভাবে স্বীকার করেনি। এটা সরকার ব্যবহারিক ভাবে স্বীকার করেনি এবং বঙ্গবন্ধু সরকারও স্বীকৃতি দিতে পারেননি। এর ফলেই এই বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে এবং মুক্তিযোদ্ধারা যার যার অবস্থায় নিজস্ব চিন্তাভাবনায় বিক্ষিপ্ত এবং বিভিন্ন উপদলীয় কোন্দলে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সরকার এই চার হাজার কমান্ডারকে ডেকে সমন্বয় করতে পারতেন। বঙ্গবন্ধুর সরকার এদেরকে একটা দিক নির্দেশনা দিতে পারতেন। দেশ গড়ার আন্দোলনে মুক্তিযোদ্ধাদের এই কমান্ডারদের সম্পৃক্ত করতে পারলে সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে অবস্থান নিতে পারতো। কিন্তু এটা করা হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ অংশে আমরা বেশ সংকটের মধ্যেই ছিলাম। সকলের স্মরণ আছে কিনা জানিনা, ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ, খুলনা–এরকম বেশ কয়েকটি অঞ্চলে পাকিস্তানীরা ষোলই ডিসেম্বরেও সারেন্ডার করতে চায়নি। করেনি। তারা আশা করছিল যে মার্কিন সপ্তম নৌবহর তাদের সাহায্যে আসবে কিংবা চীনের কাছ থেকে তারা সাহায্য সহযোগিতা পাবে। সরাসরি সহযোগিতা না করলেও নিরাপত্তা পরিষদে চীন ঠিকই বাংলাদেশের স্বাধীন অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে ভেটো দিয়েছিল। তখন মিসেসগান্ধী ও ভারত সরকারের একনিষ্ঠ উদ্যোগে সোভিয়েত রাশিয়ার পাল্টা ভেটোর বলে আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে অবস্থান নিতে পেরেছিলাম।

এটা ছোট কথা নয়। এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা এবং এটা আমাদের অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। তবে ভারতের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমাদের সম্পর্ক অবশ্যই দ্বিপাক্ষিক হতে হবে। বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে। ভারতের কাছ থেকে বড় ভাই সুলভ কিংবা আধিপত্যমূলক কোন সম্পর্কের প্রত্যাশা মুক্তিযোদ্ধারা তখনও করেনি কিংবা আজকেও তারা সেটা মেনে নেবে

না। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে আমাদের একজন মিত্র হিসেবে তাদের সহযোগিতাকে স্বীকৃতি না জানালে আমরা জাতীয়ভাবে হীনমন্যতার পরিচয় দেব বলে আমি বিশ্বাস করি।

মুক্তিযুদ্ধের পরে আজকে আমরা প্রায় বাইশটি বছর পেরিয়ে এসেছি। মুক্তিযুদ্ধ স্বল্পকালীন ছিল সেকথা মেনে নিয়েও বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের পরে আমাদের যে কর্তব্য এবং করণীয় ছিল তা সম্পন্ন করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। এই ব্যর্থতার দায়িত্ব মূলত মুক্তিযুদ্ধের পরের সরকার গুলোকেই নিতে হবে। কারণ, সরকারী উদ্যোগ ছাড়া যথার্থ এবং ফলপ্রসূ কোন কিছু করা সম্ভব নয়। আজকে অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধাই বিভিন্ন অবস্থানে প্রচন্ড প্রতিকূলতার মধ্যে আছে। অনেক মুক্তিযোদ্ধা বেকার, অনেক শহীদ পরিবার আজও মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকুও পায়নি। আহত মুক্তিযোদ্ধারা আজও সম্মানজনকভাবে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে যাবার উপায় খুঁজে পায়নি। এ ব্যর্থতা আংশিকভাবে সামরিক নেতৃত্বের, তবে মূল ব্যর্থতা রাজনৈতিক নেতৃত্বের এবং সরকারের। মুক্তিযুদ্ধের পরে যে সরকারগুলো ক্ষমতায় এসেছে তারা কেউই এই সমগ্র মুক্তিবাহিনীকে সঠিক নির্দেশনায় জাতি গঠনের কাজে লাগাতে পারেনি। বেকার মুক্তিযোদ্ধাকে কর্মসংস্থান কিংবা ভাতা দেবার একটা মর্যাদাসম্পন্ন ব্যবস্থা নিতেও সবাই ব্যর্থ। তাই আমাদের সার্বিক ব্যর্থতার মধ্যে আজকে আমরা দেখতে পাই সাম্প্রদায়িক শক্তির নবজাগরণ। সাম্প্রদায়িক শক্তি আজকে মাথাচারা দিচ্ছে বাংলাদেশের শহরে–নগরে–গ্রামে–গঞ্জে।

আমার মনে হয় ইতিহাস তার পদক্ষেপ নেবে। মুক্তিযুদ্ধের যে অংশ আমরা সম্পন্ন করতে পারিনি ইতিহাসের রায়ে সে অংশ সম্পন্ন হতে বাধ্য। ১৯৫২ সাল থেকে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ, শ্রমিক, কর্মচারী, সৈনিক, কৃষক, মজুর তাদের জাতীয় স্বাধিকারের জন্য যে আন্দোলন করেছিলো সে আন্দোলনের একটা চূড়ান্ত পরিণতি এসেছিল ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব কিংবা এজন্য কাউকে বিশেষভাবে দোষী করবার অভিপ্রায় আমার মোটেই নেই। আমাদের সকলকেই আজকে অনুধাবন করতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে যে এর পেছনে অবশ্যই আমাদের ব্যর্থতা আছে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ প্রহরে, চূড়ান্ত অবস্থায় আমরা ব্যর্থ হয়েছি জাতীয় শত্রুকে এদেশের মাটি থেকে চিরতরে উৎখাত করতে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আমরা ব্যর্থ হয়েছি মুক্তিবাহিনীকে সুসংগঠিত করে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত করতে। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা ব্যর্থ হয়েছি রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সামরিক নেতৃত্বের সমন্বয় সাধনে। আমাদের এ ব্যর্থতার দায়–দায়িত্ব যার কাঁধে যেটুকু বর্তায় সেটুকু আমাদের স্বীকার করা উচিত। সেটুকু আমাদের আত্ম সমালোচনায় মেনে নেয়া উচিত এবং সেখান থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করেই এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে। ১৯৫২ সাল থেকে এদেশের মানুষ তার জাতিগত অবস্থান, তার ভাষাগত অবস্থান, তার স্বাধীন জাতির অবস্থান, তার নিজস্ব মানচিত্রের অবস্থান, নিজস্ব পতাকার অবস্থান নিয়ে যে লড়াই করেছিলো সে লড়াই আজও চলছে। সে লড়াইয়ের সফল সমাপ্তি ঘটাতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। তবু এ লড়াই চলবে। কারণ ইতিহাসের রায় সব সময় মানুষেরই পক্ষে।